বাংলাদেশ
এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা

ISSN 1609-4409

একচল্লিশতম খণ্ড	গ্রীষ্ম সংখ্যা	জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০/জুন ২০২৩

সম্পাদক
এস এম মাহফুজুর রহমান

সহযোগী সম্পাদক
সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ
৫ পুরাতন সচিবালয় রোড (নিমতলী)
রমনা, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

সম্পাদকীয় পর্ষৎ

সভাপতি	:	অধ্যাপক জেড এন তাহমিদা বেগম
সম্পাদক	:	অধ্যাপক এস এম মাহফুজুর রহমান
সহযোগী সম্পাদক	:	অধ্যাপক সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ
সদস্য	:	অধ্যাপক ফাতেমা কাওসার
		অধ্যাপক স্বরোচিষ সরকার
		অধ্যাপক আরিফা সুলতানা

মূল্য	:	২০০.০০ টাকা
Price	:	Tk. 200.00
		US$ 10.00

প্রকাশক	:	সাধারণ সম্পাদক
		এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

Bangladesh Asiatic Society Patrika (Bengali Journal of the Asiatic Society of Bangladesh) edited by Professor S M Mahfuzur Rahman, published by Professor M. Siddiqur Rahman Khan, General Secretary, The Asiatic Society of Bangladesh, 5, Old Secretariat Road, Nimtali, Ramna, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 02-9513783, E-mail: asbpublication@gmail.com

সূচিপত্র

মুনীর চৌধুরীর *রক্তাক্ত-প্রান্তর*: ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিকতার দর্পণে
সাদ্দাম হুসাইন ১

বাংলাদেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থা এবং তাঁদের সুরক্ষায় বিদ্যমান আইনী কাঠামো
নাহিদ ফেরদৌসী ২৫

বাংলাদেশের 'নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্রে' 'নৃগোষ্ঠী' উপস্থাপন কৌশল বিশ্লেষণ: পরিপ্রেক্ষিত *মর ঠেংগাড়ি* ও "*Kalpona*"… *Not Imagination*
মো. অমিত হাসান সোহাগ ৪৭

১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন ও নারী সমাজ
আনোয়ারা আক্তার ৭৭

দেশভাগভিত্তিক কথাসাহিত্যে বিহারিদের আত্মপরিচয় সংকট
মিনু আক্তার ১০১

উর্দু সাংবাদিকতার ইতিহাস
জাফর আহমদ ভূঁইয়া ১১৭

সামাজিক দায়িত্ব পালনে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা: একটি নীতি-দার্শনিক পর্যালোচনা
মোহাম্মদ দাউদ খাঁন ১৪৫

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকায় এশিয়ার সমাজ, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে রচিত মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধকারদের জ্ঞাতার্থে পত্রিকায় প্রবন্ধ জমা দেওয়ার নিয়মাবলি নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য এক কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে জমা দিতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজ করার নিয়ম নিম্নরূপ :
   - বাংলা বিজয় সফটওয়্যারের সুতন্বি এমজে ফন্টে প্রবন্ধটি কম্পোজ করতে হবে।
   - কাগজের সাইজ হবে A4। প্রতি পৃষ্ঠায় মার্জিন থাকবে উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১ ইঞ্চি এবং বামে ১.৬ ইঞ্চি।

২. প্রবন্ধের সাথে প্রবন্ধকারের পেশাগত পরিচয় ও ঠিকানা জানিয়ে এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে :
   - জমাকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি;
   - এটি একটি মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ;
   - প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোনো পত্রিকা বা গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেওয়া হয়নি;
   - এই প্রবন্ধে প্রকাশিত মতের সকল দায়িত্ব লেখক বহন করবেন।

৩. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে প্রবন্ধকার পত্রিকার একটি কপি ও প্রকাশিত প্রবন্ধের দশ কপি অফপ্রিন্ট বিনা মূল্যে পাবেন।

৪. বাংলা একাডেমির *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* অনুসরণে অথবা *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, *চলন্তিকা* প্রভৃতি অভিধানের বানান অনুযায়ী প্রবন্ধটি রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোনো ভুক্তিতে (entry) একাধিক শীর্ষশব্দ (headword) থাকলে প্রথমটির বানান গ্রহণ করতে হবে। তবে গবেষক কোনো বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তাও অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।

৫. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।

৬. প্রবন্ধের শেষে টীকা ও তথ্যনির্দেশ সংখ্যানুক্রমে উপস্থাপন করতে হবে। মূল পাঠের মধ্যে টীকা ও তথ্যনির্দেশ সংখ্যা সুপারস্ক্রিপ্টে (যেমন বাংলাদেশ[১]) ব্যবহার করাই নিয়ম।

৭. মূলপাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি তিন লাইনের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস রক্ষা করতে হবে।

৮. তথ্যনির্দেশের ক্ষেত্রে লেখকের পূর্ণ নাম, বইয়ের নাম, প্রকাশস্থান, প্রকাশক, প্রকাশকাল এবং পৃষ্ঠা নম্বরের উল্লেখ করতে হবে।

৯. বই ও পত্রিকার নাম বাঁকা (italics) অক্ষরে হবে (যেমন, বই : *বৃহৎ বঙ্গ;* পত্রিকা : *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*)।

১০. প্রবন্ধের সূচনায় একটি সারসংক্ষেপ অবশ্যই দিতে হবে। আনুমানিক ২০০ শব্দের সারসংক্ষেপ এবং চাবি শব্দ (Key word) (৩-৭টি) থাকতে হবে।

১১. একাধিক লেখকের নামযুক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য গ্রহণ করা হয় না।

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

কাউন্সিল : ২০২২ ও ২০২৩

সভাপতি	:	অধ্যাপক এমিরিটাস খন্দকার বজলুল হক
সহ-সভাপতি	:	অধ্যাপক হাফিজা খাতুন অধ্যাপক এ কে এম গোলাম রব্বানী অধ্যাপক সাজাহান মিয়া
কোষাধ্যক্ষ	:	অধ্যাপক এস এম মাহফুজুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক	:	অধ্যাপক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান
সম্পাদক	:	অধ্যাপক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির
সদস্য	:	অধ্যাপক আবদুল মমিন চৌধুরী (ফেলো) ব্যরিস্টার শফিক আহমেদ (ফেলো) অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ অধ্যাপক আহমেদ এ. জামাল অধ্যাপক মাহবুবা নাসরীন অধ্যাপক মো: লুৎফর রহমান অধ্যাপক ইয়ারুল কবীর অধ্যাপক মো. আবদুর রহিম অধ্যাপক আরিফা সুলতানা অধ্যাপক শুচিতা শরমিন অধ্যাপক ঈশানী চক্রবর্তী অধ্যাপক সুরাইয়া আক্তার

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একচল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০/জুন ২০২৩

মুনীর চৌধুরীর *রক্তাক্ত-প্রান্তর* : ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিকতার দর্পণে

সাদ্দাম হুসাইন*

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের একজন প্রতিনিধিত্বশীল নাট্যকার মুনীর চৌধুরী। *রক্তাক্ত-প্রান্তর* তাঁর অন্যতম প্রধান নাটক। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১) এবং কায়কোবাদের *মহাশ্মশান* (পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কাহিনি অবলম্বনে রচিত) মহাকাব্যের কিঞ্চিৎ কাহিনিসারাংশ *রক্তাক্ত প্রান্তর* নাটকের পটভূমি। নাট্যকার মূলত যুদ্ধবিগ্রহে পরিপূর্ণ ঐতিহাসিক পটভূমিকে কালজ-প্রেক্ষাপটে প্রতিস্থাপন করে স্বার্থ-ষড়যন্ত্র-ক্ষমতাদ্বন্দ্ব-জাতিদ্বন্দ্ব-জাতীয়তাবাদকে চিত্রিত করেছেন। যেখানে যুদ্ধবিরোধী, অসাম্প্রদায়িক এবং মানবিক চেতনায় হৃদয়াবেগের দ্বন্দ্ব– বিশেষত 'রক্তাক্ত-অন্তর'-ই হয়েছে মুখ্যবিষয়। এই 'রক্তাক্ত-অন্তর' অঙ্কন করতেই নাট্যকার ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে যুক্ত করেছেন কিছু পার্শ্বচরিত্র, শাখাকাহিনি এবং অনৈতিহাসিক ঘটনা। ফলে তৈরি হয়েছে ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিকতা– যা এ প্রবন্ধে সমালোচনা-দৃষ্টিতে তুলে ধরা হয়েছে।

চাবি শব্দ: *রক্তাক্ত-প্রান্তর*, পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ, ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিকতা, ক্ষমতাদ্বন্দ্ব, জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িকতা, মানবিক চেতনা।

অতীতকে অনুধাবন, বর্তমানকে ব্যাখ্যা এবং ভবিষ্যতের পথানুসন্ধানের জন্য সাধারণত লেখা হয় ঐতিহাসিক নাটক। নাট্যকার ঐতিহাসিক নাটক রচনার সময় সচেতনভাবে ঐতিহাসিক ঘটনা, চরিত্র এবং তথ্যের শরণাপন্ন হন কেবল 'অতীতকে অনুধাবনে'র জন্যই এবং 'বর্তমানকে ব্যাখ্যা'র প্রয়োজনে ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে যুক্ত করেন কিছু পার্শ্বচরিত্র, শাখাকাহিনি এবং কিছু অনৈতিহাসিক ঘটনাও। ফলে তা বর্তমানের প্রতিচ্ছবি হয়েও হয়ে ওঠে ভবিষ্যতের সত্যানুসন্ধানের পথ। এভাবে ত্রিকালের সংযোগসাধনেই 'ইতিহাস' হয়ে ওঠে 'নাটক' তথা– 'শিল্প'। এই শিল্পমাধ্যম তথা 'ঐতিহাসিক নাটক' বাংলা নাট্যসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭), শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২-১৯৬১), মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮) প্রমুখ এই ধারার প্রসিদ্ধ নাট্যকার। যাঁরা তুর্কি-মোঘল-পাঠান-আফগান চরিত্রকে আধেয় (content) করে কালজ-প্রেক্ষাপটে স্বার্থ-ষড়যন্ত্র-ক্ষমতাদ্বন্দ্ব সর্বোপরি জাতিদ্বন্দ্ব ও জাতীয়তাবাদ শিল্পিত করেছেন। পূর্ববঙ্গেও (বাংলাদেশ) এই ধারাটি অব্যাহত থাকে– যাঁদের মধ্যে প্রতিনিধিত্বশীল নাট্যকার মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১)। তিনি মোঘল-মারাঠা-আফগান আধেয়ে রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত নাটক *রক্তাক্ত-প্রান্তর* (১৯৬১)– পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১) যার পটভূমি। উল্লেখ্য যে, নবপ্রতিষ্ঠিত মারাঠা রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংঘটিত আফগান ও মোঘল রাজশক্তির সংঘাতের

* পিএইচ.ডি. গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস যেমন শোকাবহ তেমনি ভয়াবহ। এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ পরিণাম– মারাঠাদের পরাজয় ও পতন এবং আফগান-মোঘল রাজশক্তির জয়– পুনঃপ্রতিষ্ঠা। জয়পরাজয়ের এই প্রত্যক্ষ-পরিণামের পরোক্ষে রয়েছে উভয়পক্ষের অপরিমেয় ক্ষতির 'রক্তাক্ত-স্বাক্ষর'। কেননা, যুদ্ধাবসানে পানিপথ-প্রান্তরে অবশিষ্ট প্রাণস্পন্দন রণাঙ্গনের চেয়েও 'রক্তাক্ত'! এই 'রক্তাক্ত-অন্তর'ই শিল্পিত করেছেন নাট্যকার বক্ষ্যমাণ নাটকে। প্রসঙ্গত, আপাতদৃষ্টিতে নাটকটিতে 'মুসলিম জাতীয়তাবাদে'র প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ হলেও গভীরদৃষ্টি নিবদ্ধ করলে বোধগম্য হয়, নাট্যকার সেটা 'শ্রদ্ধার সাথে শ্রাদ্ধ' করেছেন; সর্বোপরি 'আধুনিক' বোধ এবং বোধিতে চিত্রিত করেছেন যুদ্ধবিরোধী, অসাম্প্রদায়িক এবং মানবিক চেতনা।

২.

রক্তাক্ত-প্রান্তর নাটকটি মুনীর চৌধুরী যখন রচনা করেন তখন এ-ভূখণ্ডে 'অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক' শাসনব্যবস্থা বিরাজমান। এই অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদী সর্বগ্রাসীনীতিতে এ-দেশের জনগণ পিষ্ট, অত্যাচারিত ও শোষিত হয়েছে। তারা চালিয়েছে এ-দেশের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে পরিকল্পিতভাবে বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা। এ-সময় এক শ্রেণির নাট্যকার এই দখলদার-শক্তির 'সংস্কৃতিকে' আত্মস্থ করে অনেকটা 'রক্ষণশীল' (conservative) ভাবধারায় নাটক রচনার চেষ্টা করেন। অপরদিকে প্রগতিশীল নাট্যকাররা এ-পথ প্রত্যাখ্যান করে নাটক রচনা করেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বলবৎ করার নিমিত্তে– যেখানে ব্যষ্টির চেয়ে সমষ্টি বড়ো হয়ে উঠেছে, সর্বোপরি শৈল্পিকভাবে যা হয়েছে 'আধুনিক'। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী 'জাতীয় সংহতি' রক্ষার নামে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কায়েমের প্রয়োজনে নানা ধরনের মতলব আঁটতে থাকে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সালের ৩রা ডিসেম্বর 'ব্যুরো অফ ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন' (BNR) গঠন করা হয়। ১৯৫৯ সালের ১২ই আগস্টের সভায় পাকিস্তানি আদর্শভিত্তিক জাতীয় বীরদের কেন্দ্র করে ২১টি নাটক রচনার একটি প্রকল্প গৃহীত হয়। পাকিস্তানি সংস্কৃতিতে ভারতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ যাতে না-ঘটতে পারে সেজন্য পাকিস্তানের নিজস্ব সংস্কৃতি সৃষ্টির দিকে লক্ষ রেখে একদিকে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসংগীত বর্জন, অপরদিকে মুসলিম বীর ও বীরত্বের কাহিনির অনুসন্ধান শুরু হয়ে যায়।[১] প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়:

> At present we have very few dramas on the National Heroes and as such most of the dramas staged in our educational institutions and by other cultural organisations are written by non-Muslim writers of West Bengal and do not at all reflect our culture and our heritage. Some of these dramas even propagate in a subtle manner ideas which are contrary to our ideology... Production of sufficient number of suitable dramas bearing on our cultural heritage and national heroes will go a long way towards fostering nationalism and a sense of pride in our heritage.[২]

এই উদ্দেশ্যে ২১ জন জাতীয় বীর ও উদ্দীপক-ঘটনা ইতিহাস ঘেঁটে একটি তালিকা তৈরি করা হয় এবং পূর্ববাংলার এক শ্রেণির নাট্যকার তালিকানুযায়ী নাটকও রচনা করেন। উল্লেখ্য যে, সাহিত্য-সংস্কৃতির নামে বিএনআর সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা সৃষ্টির অভিপ্রায়ে এবং সাহিত্যপদবাচ্য নয়

এমন অনেক লেখকের পুস্তক প্রকাশের নামে অযাচিত অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে, যা দেখে মুনীর চৌধুরী বলেন: 'আমি জানি এমন অখ্যাত অজ্ঞাত লেখক আছেন যাদের রচনা বাজারে বিক্রি হয় না অথচ বি.এন.আর. সেসব পুস্তকের মধ্যে হঠাৎ করে ইসলামের আলো দেখতে পেয়ে বহু অর্থের বিনিময়ে পুনঃপ্রকাশে লেখককে সম্মানিত করেছে। তাই এর পরিকল্পিত গণ-বিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ।'[৩] প্রসঙ্গত, মুনীর চৌধুরী বিএনআর-এর 'পরিকল্পিত গণ-বিরোধী' কর্মকাণ্ড সম্পর্কে 'নিঃসন্দেহ' হলেও তার পক্ষে এর সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ করা মোটেও সহজ ব্যাপার ছিল না। বরং তাঁর অবস্থা ছিল শাখের করাতের মতো– 'না' বললে সরকার তাঁকে 'কমিউনিস্ট', 'দেশের শত্রু' বলবে, জেলে ভরবে; আর 'হ্যাঁ' বললে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা বলবে 'সরকারের তল্পীবাহক'! কারণ, তিনি পূর্বেই প্রত্যক্ষ রাজনীতি (কমিউনিস্ট পার্টি) পরিহার করে পরোক্ষ রাজনীতিতে (সাংস্কৃতিক আন্দোলনে) নিজেকে নিবিষ্ট করেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি বলেন: 'প্রকৃতপক্ষে তখন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক ছিল না। ১৯৪৮-এর পর থেকেই আমার আত্মোপলব্ধি হয়েছিল যে, প্রত্যক্ষ রাজনীতি আমার ক্ষেত্র নয়।'[৪] ফলে ১৯৫৯ সালে গৃহীত পদক্ষেপ তথা সরকারের নির্ধারিত পরিকল্পনায় *রক্তাক্ত-প্রান্তর* নাটক লিখলেন তিনি। কাহিনিসারাংশ হিসেবে বেছে নিলেন কায়কোবাদের (১৮৫৭-১৯৫১) *মহাশ্মশান* (১৯০৪) মহাকাব্য। এ-প্রসঙ্গে নাট্যকারের মন্তব্য: 'কাহিনীর সারাংশ আমি কায়কোবাদের *মহাশ্মশান* কাব্য থেকে সংগ্রহ করি।'[৫] উল্লেখ্য যে, নাটকটির প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে *মহাশ্মশান* মহাকাব্যের কাহিনির সাথে ঈষৎ সাদৃশ্য থাকলেও পুরো নাটকজুড়েই রয়েছে বিপুল বৈসাদৃশ্য। তাহলে নাট্যকার কেন *মহাশ্মশান* মহাকাব্যের কথা স্মরণ করলেন?– এমন জিজ্ঞাসার জবাবে আমরা বলতে পারি:

১. *মহাশ্মশান* যেহেতু বাঙালি মুসলিম বিদ্বৎসমাজে 'পবিত্র গ্রন্থে'র মতো সমাদৃত হয়েছে, সেহেতু কেবল 'নাম'টি স্মরণ করাতে পাকিস্তানি মুতসুদ্দিগণ ভেবেই নিয়েছিল যে, তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণ হয়েছে।

২. কাবুলেশ্বর আহ্‌মদ শাহ্ আব্‌দালী বাঙালি মুসলিম সমাজে ছিলেন 'জাতীয় বীর'। কারণ, তার বিজয়েই মুসলিম জাতির ইতিহাস পালটে গেছে। স্বয়ং কায়কোবাদও তেমনটাই মনে করতেন: 'পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কিছুকাল পূর্বে মহারাষ্ট্রগণ অত্যন্ত প্রবল ও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের শক্তির সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে ভারতে এমন কেহই ছিলেন না। তাহাদের এক একটি হুঙ্কারে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র ভারতভূমি কম্পিত হইয়া উঠিত; যদি কাবুলের অধিপতি মহাবীর আহম্মদ সাহ্ আব্দালী সসৈন্যে ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ না করিতেন তবে ইতিহাসের পৃষ্ঠা ও ভারতের মানচিত্র অন্য বর্ণে রঞ্জিত হইয়া যাইত।'[৬] আহ্‌মদ শাহ্ আব্‌দালীর বিজয় দেখিয়ে নাট্যকারও মুসলিম-মানচিত্র 'অন্য বর্ণে রঞ্জিত' হওয়া থেকে রক্ষা করলেন, রক্ষা হলো পাকিস্তানি শাসকদের অভিসন্ধি (আপাতদৃষ্টিতে)।

৩. কায়কোবাদকে রবীন্দ্রনাথের বিপরীতে শক্তিশালী সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রবণতা মুসলিম-সমাজে শুরু থেকেই ছিল। *মহাশ্মশানে*র 'প্রকাশিকার নিবেদন' অংশে তেমনটাই

পাওয়া যায় : 'হিন্দুসমাজ রবীন্দ্রনাথকে বাড়াইবার জন্য তাঁহাদের সমাজের ছোট বড় সকলেই প্রপাগণ্ডা করিতেছেন– ক্যানভাস করিতেছেন, আর আমাদের সমাজের এতবড় একটা মহাকাব্যের কবিকে (কায়কোবাদ) কিরূপে ছোট ও খাটো করা যায় সেজন্য আমাদের সমাজের অনেকেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। হায়রে মুসলমান জাতির স্বজাতি বাৎসল্য।'[৭] স্মর্তব্য, বিএনআর-এর উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসংগীত বর্জন এবং মুসলিম লেখকদের বড়ো করা। মুনীর চৌধুরী 'মহাশ্মশান' শব্দটি ব্যবহার করে 'হায়রে মুসলমান জাতির স্বজাতি বাৎসল্য'– খেদকে সযত্নে সরিয়ে দিলেন (আপাতদৃষ্টিতে)।

অতএব এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মুনীর চৌধুরী স্বেচ্ছায় *রক্তাক্ত-প্রান্তর* লেখেননি, বরং তাকে দিয়ে লেখানো হয়েছিল। লিখলেও তিনি 'মহাশ্মশান' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন স্রেফ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর 'জাতীয় সংহতি' রক্ষাকারীদের সান্ত্বনাস্বরূপ। ফলে সরকার যেমনটি চেয়েছিল নাটকটি তেমন হলো না।[৮] কেননা, তিনি মুসলমান তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদের জয় দেখালেন ঠিকই, কিন্তু তারচেয়েও বড়ো বিজয় দেখালেন 'কর্তব্যের', 'ব্যক্তিত্বের', 'কৃতজ্ঞতাবোধের' সর্বোপরি 'অসাম্প্রদায়িকতার' এবং 'যুদ্ধবিরোধী চেতনার'।

৩.

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ইতিহাস *রক্তাক্ত-প্রান্তর* নাটকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সেই হিসেবে আমরা প্রাথমিক অবস্থায় নাটকটিকে ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে গণ্য করতে পারি। কেননা, গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় নিরেট ইতিহাসের সত্যও নাটকটির অস্থিমজ্জায় নিমজ্জিত। ফলে চরিত্রগুলো এমনভাবে কথা বলে– যাতে একইসঙ্গে স্পষ্ট হয় সংলাপ ও ইতিহাস। অর্থাৎ শিল্পের সঙ্গে ইতিহাসের সংযোগে নির্মিত হয় সংলাপ। ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, ১৭৫৭ সালে আফগান-রাজ আহ্‌মদ শাহ্ আব্‌দালী লাহোর আক্রমণ করেন এবং বিনা যুদ্ধে মোঘল সম্রাট আহ্‌মদ শাহ্‌র নিকট হতে লাহোর দখল করে তার পুত্র তিমুর শাহ্‌কে শাসনভার অর্পণ করেন। এরপর তিনি দিল্লি আক্রমণ করেন ২৮শে জানুয়ারি ১৭৫৭ সালে। এ-সময় মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর ছিলেন দিল্লির শাসনকর্তা। দ্বিতীয় আলমগীরের উজির ইমাদ-উল-মুল্‌কের কর্মচারী নজীবদ্দৌলা রোহিলা প্রধানদের নিয়ে আহ্‌মদ শাহ্ আব্‌দালীকে সাহায্য করেন। ফলে আব্‌দালী দ্বিতীয় আলমগীর এবং ইমাদ-উল-মুল্‌ককে বন্দি করে নজীবদ্দৌলাকে 'মির বকশি' উপাধি দিয়ে দিল্লির সিংহাসনে বসান। উল্লেখ্য যে, আব্‌দালী দ্বিতীয় আলমগীরকে বন্দি রাখলেও ইমাদ-উল-মুল্‌ককে ক্ষমা করে পুনরায় তাকে উজির পদে নিয়োগ দেন এবং এপ্রিল মাসে আফগানিস্তানে ফিরে যান।[৯] এই সুযোগে ইমাদ-উল-মুল্‌ক নজীবদ্দৌলার কাছ থেকে দিল্লি মুক্ত করার জন্য পেশোয়ার (বালাজি বাজিরাও) কূটনৈতিক প্রতিনিধি (Diplomatic Agent) মহাদেব হিঙ্গানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। পেশোয়ার কাছে এ-সংবাদ পৌঁছালে তিনি তার ভাই রঘুনাথ রাও এবং উপসেনাপতি (Deputy Commander) মালহার রাও হল্কারকে দিল্লি দখল করতে প্রেরণ করেন। তারা নজীবদ্দৌলাকে আক্রমণ করেন ১৭৫৭ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে। ৩রা সেপ্টেম্বর নজীবদ্দৌলা রঘুনাথ রাও-এর

কাছে বন্দি হন। এ-সময় রঘুনাথ রাও নজীবদ্দৌলাকে 'মির বকশি' উপাধি পরিত্যাগ-পূর্বক ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে দিল্লি ছেড়ে যেতে বলেন, কিন্তু নজীবদ্দৌলা রঘুনাথের সমস্ত শর্ত ত্যাগ করে কেবল পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হন। ফলে তাকে স্থায়ীভাবে বন্দি রাখতে চেয়েছিলেন রঘুনাথ রাও। নজীবদ্দৌলা মালহার রাও হল্কারকে উৎকোচ (bribe) দিয়ে তাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। মালহার রাও-এর অনুরোধে রঘুনাথ রাও নজীবদ্দৌলাকে মুক্তি দেন ৩রা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় এবং ৩ দিন পর– অর্থাৎ ৬ই সেপ্টেম্বর নজীবদ্দৌলা সমস্ত সম্পদ, সৈন্য এবং যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে সপরিবারে দিল্লি ত্যাগ করে দোয়াবে আশ্রয় নেন। দোয়াবও মারাঠাদের দখলে চলে গেলে তিনি গঙ্গা পার হয়ে নাজিবাবাদে চলে যান ১৭৫৭ সালের ডিসেম্বরে।[১০] ১৭৫৮ সালে রঘুনাথ রাও পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর আক্রমণ করেন। তার প্রবল প্রতাপে লাহোরের আব্‌দালী শাসনকর্তা তিমুর শাহ্ এবং তার রাজপ্রতিনিধি (Viceroy) জাহান খান ২০শে এপ্রিল ১৭৫৮ সালে বাধ্য হয়ে কাবুলে পলায়ন করেন। রঘুনাথ রাও পাঞ্জাব শাসন করেন মাত্র তিন মাস। এরপর পেশোয়া তাকে দাক্ষিণাত্যে (Deccan) ডেকে পাঠান এবং দত্তজি সিন্ধিয়াকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন।[১১] ১৭৫৯ সালের মে মাসে দোয়াবে প্রবেশ করেন দত্তজি সিন্ধিয়া। ফলে ভয় পেয়ে নজীবদ্দৌলা সেখান থেকে পালিয়ে মুজাফ্‌ফরনগর থেকে ২৫ কিলোমিটার পূর্বে সুকারতালের দিকে যান এবং গঙ্গা নদীর পশ্চিমতীরে আশ্রয় গ্রহণ করে ঘাঁটি স্থাপন করেন। দোয়াবে নজীবদ্দৌলার ১,৩০০ গ্রাম দখল করে নেন দত্তজি সিন্ধিয়া। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৭৫৯ সালে দত্তজি সিন্ধিয়া নজীবদ্দৌলার ঘাঁটিতে আক্রমণ চালালে তিনি তা প্রতিহত করেন। এই যুদ্ধ চলে কয়েক মাস। ইতোমধ্যে (নভেম্বর ১৭৫৯) দত্তজি সিন্ধিয়া জানতে পারেন আব্‌দালীর ভারত আক্রমণের সংবাদ। ফলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তিনি দিল্লি রক্ষার জন্য যাত্রা করেন এবং ৪ঠা জানুয়ারি ১৭৬০ সালে দিল্লির নিকটে যমুনার তীরে বারারি ঘাটে তার ঘাঁটি স্থাপন করেন। নজীবদ্দৌলা রোহিলা প্রধানদের সাথে নিয়ে সেখানে আক্রমণ করে দত্তজি সিন্ধিয়াকে হত্যা করেন। এই যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে অবগত করে এবং ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে আব্‌দালীকে চিঠি লেখেন তিনি। চিঠিতে তিনি আব্‌দালীর সৈন্যবাহিনীর অতিরিক্ত ব্যয় (Extra Charge) বহন করার কথাও উল্লেখ করেন। আব্‌দালীও উদ্‌গ্রীব ছিলেন তার পুত্রের হৃত সিংহাসন উদ্ধারের জন্য। ফলে তিনি দ্রুত চলে আসেন হিন্দুস্তানে। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী এবং সুজাউদ্দৌলার সেক্রেটারি কাশীরাজ পণ্ডিতও (Casi Raja Pundit) এমনটাই উল্লেখ করেন:

> Ahmed Shah Durrany, after the defeat of Dattea Jee Putul Sindia, cantoned his army in the district of Anufshair, upon the banks of the Ganges; and Dattea Jee Putul himself having been killed in an action with Nujeib-ul-Dowlah, the latter was apprehensive of the consequences of the resentment of the Mahrattas and therefore united himself closely with the Durrany Shah, who was himself excited to invade Hindostan by a wish to revenge the defeat of his General Jehan Khan (adviser to the young prince Timur Shah, Abdali had made Viceroy of the Panjab after his conquest in 1758) the preceding year, but still by the solicitations of Nujeib-ul-Dowlah, who agreed to bear the extra charges of the Shah's army, and, being himself a man of great military reputation, as well as an able politician, had persuaded all the Rohilla chiefs and the Patans of Ferokhabad to join the Durrany Shah.[১২]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতিভাস হয় যে, পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব নয়, বরং 'স্বার্থ'। কেননা, কাবুল থেকে আহ্‌মদ শাহ্ আব্‌দালী ভারতে প্রবেশ করেন ইসলামের চন্দ্রতারকা খচিত পতাকা ঊর্ধ্বে উড্ডীনের জন্য নয়, বরং এসেছিলেন কেবল পুত্রের হৃত সিংহাসন উদ্ধারের জন্য এবং নজীবদ্দৌলাও তাকে আমন্ত্রণ জানান দিল্লির সিংহাসনে পুনরায় উপবিষ্ট হওয়ার প্রয়োজনে। ইতিহাসের এই নিরেট সত্য উদ্‌ঘাটিত হয় বক্ষ্যমাণ নাটকের একটি ছোট্ট চরিত্র জরিনা বেগমের সংলাপে:

জরিনা : আপনারা সব, স-ব আত্ম সুখকাতর, সব আত্ম-বঞ্চনাকারী। কে আত্ম-স্বার্থ না খুঁজছে? কাবুল থেকে আব্‌দালী ভারতে ছুটে এসেছে কেন? আপনার (নজীবদ্দৌলা) হৃত সিংহাসন উদ্ধার করে দেবার জন্য, হিন্দুস্থানে [হিন্দুস্তানে] চন্দ্রতারকা খচিত পতাকা তুলে ধরবার জন্য? সে এসেছে তাঁর পিতৃ হৃদয়ের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে। তাঁর সন্তান লাহোর অধিপতি তিমুর শাহ্‌কে যে মারাঠারা বিতাড়িত করেছে তাদের রক্ত শোষণ করতে চায় আব্‌দালী। আব্‌দালীর সৈন্যবাহিনীর স্বার্থ লুঠতরাজ, উৎসব উল্লাস। ভারত উদ্ধার, ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয় চিন্তায় উদ্ভাসিত পোশাকী জৌলুস মাত্র। সুজাউদ্দৌলা উদ্বেগহীন, কারণ কোনো বিষধর সর্প তাকে এখনও পর্যন্ত ছোবল দেয়নি। দিলে সেও পাগল হয়ে উঠতো।[১৩]

লক্ষণীয়, জরিনার সংলাপে আহম্‌দ শাহ্ আব্‌দালী ও নজীবদ্দৌলার স্বার্থের কথা স্পষ্ট হওয়ার পাশাপাশি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার উদ্বেগহীনতার কথাও স্পষ্ট হয়েছে– এটিও ইতিহাসসম্মত। সুজাউদ্দৌলা ছিলেন ভারতের অন্যতম শক্তিশালী নৃপতি। ফলে সদাশিব রাও ভাও সেরোঙ্গাতে পৌঁছে উন্নত বস্ত্র এবং স্বর্ণালংকার (fine cloths and jewels) উপহারস্বরূপ দিয়ে তার প্রতিনিধিকে (Vakeel) সুজাউদ্দৌলার কাছে প্রেরণ করেন। প্রতিনিধি তাকে মারাঠাদের পক্ষে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু: 'Shuja-ul-Dowla answered him in the language of profession, but determined in his own mind to keep himself disengaged from both parties, and to be a spectator of the expected contest till his future conduct should be determined by the event, when he designed to join the victors.'[১৪] কাবুলের অধিপতি আহ্‌মদ শাহ্ আব্‌দালী সসৈন্যে ভারতে আসার সংবাদ পেলে তিনি নজীবদ্দৌলার অনুরোধে আব্‌দালীর পক্ষালম্বন করেন। কারণ, তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন আব্‌দালীর জয় লাভ করার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত ছিলেন না যে, আব্‌দালীই জয় লাভ করবেন। এজন্য যুদ্ধের শুরুতে তাকে উদ্বেগহীন দেখা যায়। সুজাউদ্দৌলার এই উদ্বেগহীনতার পরিচয় যেমন নাটকের জরিনা বেগমের সংলাপে উঠে এসেছে, তেমনি আরো বেশি প্রস্ফুটিত হয়েছে দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দাবার ছকে নজীবদ্দৌলা ও সুজাউদ্দৌলার সংলাপে:

নজীব : অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা মারাঠা শিবির আক্রমণ করা নিরর্থক মনে করেন। অযোধ্যার লুণ্ঠনকারীদের উচ্ছেদ করার কোনো সার্থকতা অনুভব করেন না। নিষ্ক্রিয় ঘরে বসে বুদ্ধির রকমারি খেলা অভ্যাস করাটাকেই বড় কাজ বলে মনে করেন।

সুজা : করি। (মন্নুবেগকে) তোমার সঙ্গে হুঁশিয়ার হয়ে খেলতে হচ্ছে। তুমি সোজা লোক নও।

নজীব : আমার পক্ষে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত উদাসীন থাকা সম্ভব নয়।

সুজা : কেন?

নজীব : কেন? কারণ, আমি নজীবদ্দৌলা, রোহিলা পাঠান। হিন্দু মারাঠা দস্যুরা আমার দেশ লুট

করেছে। আমাকে দেশচ্যুত করেছে। আমার কাছ থেকে দিল্লীর সিংহাসন কেড়ে নিয়ে গেছে। পশু পেশবা আর তার ঘৃণ্য অনুচরদের সমুচিত শিক্ষা না দিয়ে ক্রীড়াকৌতুকে মন মজাবো না। ... আমি রোহিলাখণ্ডের, আপনি অযোধ্যার প্রতিনিধি। আহ্‌মদ শাহ্ আব্‌দালী হিন্দুস্থানের [হিন্দুস্তানের] কেউ নন, তিনি কাবুলেশ্বর। আগামী দিনে হিন্দুস্থানের [হিন্দুস্তানের] সমগ্র মুসলমানকে পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে হবে আমাকে বা আপনাকে– আব্‌দালীকে নয়।

... ...

সুজা : আহ্‌মদ শাহ্ আব্‌দালীর নেতৃত্ব স্বীকার করেছি এই জন্য যে তাঁর মতো রণকুশলী বীর এদেশে নেই। যেমন সাহসী তেমনি বিচক্ষণ। পক্ষের বিপক্ষের প্রতিটি সৈনিকের প্রতি মুহূর্তের নড়া-চড়া সর্বক্ষণ এত জাজ্বল্যমানরূপে প্রত্যক্ষ করেন যে মনে হয় যেন গোটা যুদ্ধটাই তার একক রচনা। লড়াই করা স্থির করলে এমন লোকের হুকুম মেনে চলাই শ্রেয়ঃ।[১৫]

লক্ষণীয়, উদ্ধৃত সংলাপের প্রথমাংশে সুজাউদ্দৌলার উদ্বেগহীনতার পরিচয়; দ্বিতীয়াংশে নজীবদ্দৌলার যুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণ এবং সুজাউদ্দৌলার উদ্বেগহীনতা দূর করে হিন্দুস্তানে সমগ্র মুসলিম জাতির পরিচালনার ভার গ্রহণের প্রলোভন দেখিয়ে যুদ্ধের গতিকে ত্বরান্বিত করা এবং শেষাংশে সুজাউদ্দৌলার যুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণ উদ্ভাসিত হয়েছে। এই ঘটনাগুলো ঐতিহাসিকভাবে সত্য। যে সত্য থেকে আরো পরিষ্কারভাবে বোধগম্য হয়, পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ– 'স্বার্থ'– 'ক্ষমতার লোভ'। উল্লেখ্য যে, এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণকে সাম্প্রদায়িক খাতে প্রবাহিত করেছিলেন নজীবদ্দৌলা। বস্তুত আহ্‌মদ শাহ্ আব্‌দালী মারাঠাদের কাছ থেকে পুত্রের হৃত সিংহাসন উদ্ধারের জন্যই আফগান থেকে ভারতের দিকে অগ্রযাত্রা করেন। এই 'যাত্রা'কে নজীবদ্দৌলা 'পুত্রের সিংহাসন উদ্ধার' না-বলে 'ইসলামের বিজয় অভিযান' নাম দিয়ে আব্‌দালীকে আমন্ত্রণ জানান। জে. এল. মেহতার (Jarava Lal Mehta; ১৯১২-১৯৮৮) বর্ণনায়:

> Ahmad Shah Abdali invaded India for fifth time in October 1759. His declared objectives in resorting to this adventure were to avenge the defeat and eviction of his son, Timur Shah, from Punjab, to retrieve his lost Indian possessions including the provinces of Lahore and Multan besides the northwest frontier, and topunish the Marathas for their intrusion into his preconceived sphere of influence and control. Nevertheless, Najib Khan and some others in India, who had esablished liaison with Abdali, held much higher expectation from him. For instance, Najib repeatedly appealed to him 'to invade India in the name of Islam'.[১৬]

অতএব বোধগম্য হয় যে, পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধকে 'ইসলামের বিজয় অভিযান' হিসেবে চিহ্নিত করেন নজীবদ্দৌলা তার নিজের স্বার্থেই। কারণ, ধর্মের নামে তিনি যত সহজে মুসলিম নৃপতিদের আব্‌দালীর ছত্রছায়ায় আনতে সক্ষম হন, অন্যকোনোভাবে সেটা সহজ হতো না। ইতিহাসের এই নিরেট সত্যটি দেখা যায় নজীবদ্দৌলার সংলাপে: 'আহ্‌মদ শাহ্ আব্‌দালীকে এইজন্য সালাম করি যে তিনি হতভাগা বহু-বিভক্ত মুসলিম ভারতকে ঐক্য এবং শৃঙ্খলা দান করেছেন। তাঁর নেতৃত্বের প্রভাব ভিন্ন হয়তো আমি আপনার পাশে, আপনি আমার পাশে এসে এক কাঁতারে দাঁড়িয়ে মারাঠাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পারতাম না।'[১৭] উল্লেখ্য যে, নজীবদ্দৌলার কূটকৌশলের কারণেই

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ 'ধর্মযুদ্ধ' (Religious war) হিসেবে পরিগণিত হয়। ফলে পরবর্তীকালে কিছু ঐতিহাসিক এ-যুদ্ধকে চিহ্নিত করেছেন 'হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ' হিসেবেই। মুনীর চৌধুরী নিজেও এ-নাটকের 'ভূমিকা'তে এমনটাই উল্লেখ করেছেন: 'হিন্দু ও মুসলিম পরস্পরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার সংকল্প নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধের স্থূল পরিণাম মারাঠাদের পরাজয় ও পতন, মুসলিম শক্তির জয় ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ।'[১৮] বস্তুত পাকিস্তান-অধীন বাংলাদেশের মূল সমস্যাই ছিল– 'হিন্দু-মুসলিম সমস্যা'। ফলে মুনীর চৌধুরী পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের 'স্থূল পরিণাম'কেই 'স্থূলদৃষ্টিতে' দেখালেন স্রেফ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর 'জাতীয় সংহতি' রক্ষাকারীদের সান্ত্বনাস্বরূপ এবং 'সূক্ষ্মদৃষ্টিতে' যুদ্ধের মূল কারণও শিল্পিত করলেন সত্যানুসন্ধানীদের প্রয়োজনে। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন: 'ভারত উদ্ধার, ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয় চিন্তায় উদ্ভাসিত পোশাকী জৌলুস মাত্র।'

মারাঠাবাহিনীর একজন সম্মুখসারির সৈন্যাধ্যক্ষ ইব্রাহিম কার্দি। এ-নাটকে নাট্যকার তার পরিচয় দিয়েছেন এভাবে: 'সাধারণ সৈনিকের কাজ করেছি ফরাসীদের সৈন্যবাহিনীতে। আধুনিক রণবিদ্যা তারাই আমাকে শিখিয়েছে। যৌবনে চাকরির সন্ধানে সকল জাতের শিবিরেই হানা দিয়েছি। উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে কেউ নিযুক্ত করতে চায়নি। সেদিন সসম্মানে সৈন্যাধ্যক্ষের পদে যোগদান করবার জন্য যিনি আমাকে আমন্ত্রণ জানান, তিনি হলেন মারাঠাধিপতি পেশবা।'[১৯] বস্তুত যৌবনে ইব্রাহিম কার্দির বিভিন্ন বাহিনীতে কাজ করা, ফরাসিদের কাছ থেকে আধুনিক রণবিদ্যার প্রশিক্ষণ নেওয়া এবং মারাঠাবাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ হিসেবে একনিষ্ঠভাবে কাজ করার ঘটনাও ঐতিহাসিকভাবে সত্য, যা Sidney J. Owen-এর বর্ণনায় পরিস্ফুট হয়:

> Ibrahim Khan Gardee, who had been trained under Bussy in the Nizam's army, but who now took service with the Mahrattas.
> The Nizam also was strong in guns, but they were old-fashioned lumbering cannon; while Ibrahim furnished a good train of the light and mobile field-pieces which the French had introduced, and which had been one of the most important factors of their success. The Bhow had also at his disposal the very numerous and as yet unimpaired hosts of cavalry, so long accustomed to triumph over the Moguls in the Dekkan.[২০]

মূলত এ-নাটকে মুনীর চৌধুরী ইব্রাহিম কার্দিকে উপস্থাপন করেছেন 'কর্তব্য', 'ব্যক্তিত্ব' এবং 'কৃতজ্ঞতাবোধের' প্রতীক হিসেবে, যে কাজটি করতে যেয়ে তিনি কখনো কখনো ঐতিহাসিক সত্য এড়িয়ে 'আবেগময় অভিজ্ঞতা'[২১]র আলোকে কার্দিকে নির্মাণ করেছেন। নাট্যঘটনায় দেখা যায়, ইব্রাহিম কার্দিকে তার প্রণয়িনী (স্ত্রী) জোহরা বেগম মারাঠাপক্ষ ছেড়ে মুসলিমপক্ষে যোগ দিতে বললে কার্দি তাকে বলে: 'যে ফিরে যাবে সে আমি হবো না। সে হবে বিশ্বাসঘাতক। সে হবে ইব্রাহিম কার্দির লাশ। তাকে দিয়ে তুমি কী করবে?'[২২] কার্দি চরিত্রের এই দৃঢ়তাকে আরো সুদৃঢ় করতেই নাট্যকার যুদ্ধশেষে জোহরা বেগমের যুদ্ধপুরস্কারস্বরূপ আহত ইব্রাহিম কার্দির মুক্তিপ্রসঙ্গে সুজাউদ্দৌলার মুখ দিয়ে বলান: 'আব্‌দালীর কাছে হাত পেতে যে মুক্তি আপনি ভিক্ষা করে পেলেন, ইব্রাহিম কার্দি কি তা কখনো সজ্ঞানে গ্রহণ করতে পারবে?'[২৩] –এই তথ্যটি অনৈতিহাসিক, বরং ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, আহত ইব্রাহিম কার্দি সুজাউদ্দৌলার

শিবিরেই ছিলেন। সুজাউদ্দৌলার উদ্দেশ্য ছিল তাকে ব্যক্তিগতভাবে সুস্থ করে লক্ষ্ণৌতে পাঠানো। কিন্তু আব্‌দালীর কিছু লোক এই তথ্য পেলে আব্‌দালীকে অবহিত করেন। আব্‌দালী সুজাউদ্দৌলাকে ডেকে পাঠান এবং তাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি প্রথমে তা অস্বীকার করলেও আব্‌দালীর প্ররোচনা ও তোষামোদের বশবর্তী হয়ে তা স্বীকার করতে বাধ্য হন। অবিলম্বে বহু সংখ্যক আব্‌দালীসৈন্য সুজাউদ্দৌলার শিবির ঘেরাও করে চিৎকার করে ইব্রাহিম কার্দিকে ফেরৎ চায়। ফলে বিষয়টি আর স্বাভাবিক থাকে না। কারণ, গ্রান্ড ভিজিয়ার (Chief Officer of state of a Muslim Country) তখন হস্তক্ষেপ করেন এবং তিনি তার তত্ত্বাবধানে ইব্রাহিম কার্দিকে এক সপ্তাহের জন্য রাখার অনুরোধ জানান, সর্বোপরি নিরাপদে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন। সুজাউদ্দৌলা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা অনুভব করলে গ্রান্ড ভিজিয়ার কোরান স্পর্শ করে বলেন, 'বন্দির কোনো ক্ষতি হবে না'। ফলে সুজাউদ্দৌলা উপায়ান্তর হয়ে ইব্রাহিম কার্দিকে ডেকে পাঠান এবং গ্রান্ড ভিজিয়ারের হাতে তুলে দেন। আব্‌দালী কার্দিকে তার উপস্থিতিতে আনার নির্দেশ দেন এবং তাকে অপমানজনকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন:

> how a man of his courage came to be in such a condition?' He answered, 'that no man could command his destiny; that his master was killed, and himself wounded and prisoner; but that, if he survived, and his Majesty would employ him in his service, he was ready to shew the same zeal for him as he had done for the Bhow.[২৪]

অর্থাৎ এ-থেকে স্পষ্ট হয় যে ইব্রাহিম কার্দি সজ্ঞানে সদাশিব রাও ভাও-এর বাহিনীতে যেমন কর্তব্যপরায়ণ হয়ে কাজ করেছেন, তেমনি আব্‌দালীর বাহিনীতে করতেও সম্মত ছিলেন। ফলে আহত কার্দি সম্পর্কিত সুজাউদ্দৌলার শঙ্কাও অনৈতিহাসিক।

মুনীর চৌধুরী ইব্রাহিম কার্দির মৃত্যুদৃশ্য অস্পষ্ট রেখেছেন। প্রথমে মনে হয় প্রহরী রহিম শেখই কার্দিকে হত্যা করেছে। কারণ, রহিম শেখের মনমধ্যে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধস্পৃহা সদাজাগ্রত ছিল, যা নাটকের শুরুতেই প্রতিভাস হয়: 'আমার সোনা ভাইয়ের জীবনের খোয়াব তোপ দেগে উড়িয়ে দিয়েছে কার্দি। যদি সুযোগ পাই এই নাঙ্গা হাত দিয়ে ওর বুকের পাঁজর উপড়ে ফেলবো। চুমুক দিয়ে ওর বুকের রক্ত পান করবো। তারপর শান্ত হবো।'[২৫] এই প্রতিশোধস্পৃহাই তাকে কারাকক্ষে প্রবেশ করতে বাধ্য করেছিল। রহিম শেখ কারাকক্ষে কার্দিকে অঘোর ঘুমে অচেতন অবস্থায় দেখে নিজের চেতনঅচেতনজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ফলে সে তার বুকের পাঁজরে হাত রাখে এবং নিস্পন্দ আর ঠাণ্ডারক্ত অনুভব করে, সর্বোপরি প্রাণবাঁচাতে বশির খাঁর পাগড়ির ভাঁজে রক্তমাখা হাত মুছে ফেলে। এই দৃশ্য দেখে মনে হয়, রহিম শেখ কার্দিকে হত্যা করার আগেই সে মারা গেছে। কারণ, কার্দির বুকের 'ঠাণ্ডারক্তের' কথা স্মরণ করেছে সে। অপরদিকে পাঠকমনে সন্দেহ তৈরি হয়– রহিম শেখ প্রাণবাঁচানোর জন্য মিথ্যাও তো বলতে পারে! কারণ, দুজন প্রহরীর অপরজন– বশির খাঁ তখন গভীর ঘুমে নিমগ্ন। ফলে যে নিজের মাথার পাগড়ি পড়ে যাওয়ার কথাই জানে না, সে কি করে রহিম শেখের কারাকক্ষে প্রবেশ এবং কার্দিকে হত্যার খবর বলতে পারবে? না-পারাটাই স্বাভাবিক। ফলে রহিম শেখ যেটা বলেছে, সেটাকেই আমরা আপাতসত্য

বলে ধরে নিয়েছি। কিন্তু পরক্ষণেই যখন জোহরা বেগম কারাকক্ষে কার্দিকে মুক্ত করতে আসে, তখন নাট্যকার যে বর্ণনা দিয়েছেন ('বশির খাঁ ভয়ার্ত বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে রহিম শেখের দিকে। রহিম শেখের মুখ সামান্য বিকৃত হয়, স্পন্দিত হয়, তারপর নিশ্চল পাথরের মূর্তির ভ্রম সৃষ্টি করে'[২৬]), তা দেখে মনে হয় রহিম শেখই আহত কার্দিকে হত্যা করেছে। উল্লেখ্য যে, (নাট্যকারের বর্ণনানুযায়ী) রহিম শেখ যদি কার্দিকে হত্যা না-ই করে থাকে, তবে কারাকক্ষে জোহরার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কেন তার মুখ বিকৃত ও স্পন্দিত হয়, কেন নিশ্চল পাথরমূর্তির ভ্রম সৃষ্টি হয়? এমন জিজ্ঞাসা পাঠকমনে জেগে ওঠাই স্বাভাবিক। ফলে নাট্যকার কৌশলে এই ঘটনাকে আড়াল করতেই 'ভূমিকা'তে উল্লেখ করেন: 'নাটকে এমন কোনো প্রমাণ নেই যে রক্ষী রহিম শেখই আহত কার্দিকে হত্যা করে। কার্দির মৃত্যুর কারণ ইচ্ছাকৃতভাবে অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। একজন সাধারণ সৈনিকের প্রতিহিংসার কবলে পড়ে কার্দির মৃত্যু হয়, একথা ধরে নেয়ার চেয়ে, আহত বীর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যুবরণ করে– কল্পনা করা শ্রেয়।'[২৭] এতেও শেষ রক্ষা হয় না তাঁর। কারণ, ঐতিহাসিক সাক্ষ্যমতে যুদ্ধাহত ইব্রাহিম কার্দি অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যুবরণ করেননি, বরং তাকে কৌশলে হত্যা করা হয়েছিল। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আহত কার্দি সুজাউদ্দৌলার অধীনে চিকিৎসাধীন ছিল, সেখান থেকে সন্ধান পেয়ে আব্‌দালী গ্রান্ড ভিজিয়ারের মাধ্যমে তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন এবং অসম্মানজনকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। অতঃপর– 'The Shah gave him back in charge to the Grand Vizier, where he was treated with the greatest cruelty; and, as it is said, they ordered poison to be applied to his wounds, so that he died the seventh day after.'[২৮] অর্থাৎ আব্‌দালীর আদেশেই ক্ষতস্থানে বিষপ্রয়োগের মাধ্যমে কার্দিকে হত্যা করা হয়। অতএব নাট্যকারের বর্ণনা এবং বক্তব্য– দুই-ই অনৈতিহাসিক। এমন অনৈতিহাসিক আলাপ 'ভূমিকা'তে আরো আছে। যেমন: মারাঠাবাহিনীর নেতৃত্বকারী হিসেবে তিনি বালাজি রাও পেশোয়াকে চিহ্নিত করে বলেন: 'এই যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় ১৭৬১ সালে। মারাঠা বাহিনীর নেতৃত্ব করেন বালাজী রাও পেশোয়া; মুসলিম শক্তির পক্ষে আহমদ শাহ্ আব্‌দালী।'[২৯] স্মর্তব্য, মুসলিম শক্তির পক্ষে আহ্‌মদ শাহ্ আব্‌দালী নেতৃত্ব দিলেও মারাঠাবাহিনীর পক্ষে পেশোয়া (Prime Minister) বালাজি বাজিরাও নেতৃত্ব দেননি– এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। কারণ, মারাঠাধিপতি পেশোয়া পানিপথের যুদ্ধে অংশগ্রহণই করেননি, বরং তিনি সেসময় তার দ্বিতীয় বিয়ে নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন[৩০]। ফলে মারাঠাদের প্রাচীনরীতি (ancient custom of the Mahrattas) অনুসারে পেশোয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে বিশ্বাস রাও মাত্র সতেরো বছর বয়সে পানিপথ যুদ্ধের সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বস্তুত বিশ্বাস রাও সেনাপতি হলেও ছিলেন নামমাত্র সেনাপতি (nominal commander-in-chief), মূল সেনাপতি ছিলেন সদাশিব রাও। যুদ্ধে বিশ্বাস রাও মৃত্যুবরণ করেন। ইতিহাসের এই সত্যকে নাট্যকার সংলাপবদ্ধ করেছেন এভাবে:

আব্‌দালী : ... হতভাগ্য অদূরদর্শী কর্মফলভোগী পেশবা। নিজের ছেলেকে রণক্ষেত্রে অধিনায়ক করে পাঠিয়েছিল কুলগর্বের মোহে অন্ধ হয়ে। আর অক্ষম অবিবেচক রণোন্মাদ সেনাপতি রঘুনাথ সেই বালকের দুঃসাহসকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজে মরেছে, একটি নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক মানব শিশুকে অকালমৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে।

সুজা : রঘুনাথ সম্ভবতঃ প্রাণ নিয়ে পানিপথ ত্যাগ করতে পারেননি।[৩১]

লক্ষণীয়, নাট্যকারের সংলাপে পেশোয়ার নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক শিশুপুত্র বিশ্বাস রাও (বয়স: ১৭)-এর রণক্ষেত্রে অধিনায়কত্ব এবং মৃত্যুর ঘটনা সত্য হলেও নাট্যকার রঘুনাথ রাও-কে যে যুদ্ধের সেনাপতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, সেটা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। কারণ, ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, পেশোয়া তার ভাই রঘুনাথকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করে হিন্দুস্তান-অভিযানে প্রেরণ করেন। রঘুনাথ রাও ১৭৫৭ সালে দিল্লি এবং ১৭৫৮ সালে পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর আক্রমণ এবং দখল করেন। তিনি তিন মাস এই এলাকা শাসন করেন, কিন্তু সেনাবাহিনীর বেতন যথেষ্ট বকেয়া পড়ে যায়। ফলে পেশোয়া তাকে দাক্ষিণাত্যে (Deccan) ফিরে যাওয়াকে অধিক যুক্তিযুক্ত মনে করেন। ফিরে যাওয়ার পর সদাশিব রাওয়ের দ্বারা অভিযান-হিসাব পরিদর্শন করা হয় এবং দেখা যায় যে, তিনি সেনাবাহিনীর কাছে ৪০ লক্ষ টাকা ঋণী। সদাশিব যেহেতু রঘুনাথের চেয়ে সর্বক্ষেত্রে উন্নত (every respect superior) ছিলেন, সেহেতু তিনি তাকে এই হীনকর্মের জন্য তিরস্কার করেন। ফলে:

> Next year the scheme of reducing Hindostan being renewed, and the command again offered to Raghunaut Row, he declined it, saying, 'Let those have the command who are well-wishers to the state, and who will consult the public advantage.' This speech gave great offence to the Bhow, and on many considerations he offered himself to take the command of the expedition; taking with him Biswas Row, the eldest son of Bala Row.[৩২]

যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী কাশীরাজ রায়ের এই বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, পানিপথ যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন সদাশিব রাও এবং তিনি তার সাথে নেন বিশ্বাস রাও-কে। তাছাড়া কাশীরাজ রায় তাঁর গ্রন্থে মারাঠাবাহিনীর সম্মুখসারির যোদ্ধাদের যে তালিকা প্রদান করেছেন[৩৩], সেখানেও রঘুনাথ রাওয়ের নামোল্লেখ নেই। মূলত রঘুনাথ রাও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণই করেননি। অথচ নাট্যকার তাকে এ-নাটকে মারাঠাবাহিনীর সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত করেছেন, যা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। এ থেকে বোধগম্য হয়, নাট্যকার কোনো ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠ করে নাটক লেখেননি, লিখেছিলেন *মহাশ্মশান* এবং 'আবেগমথিত কল্পনা'র আলোকে। ফলে তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত না-হয়ে কল্পনার আলোয় আলোকিত হয়ে বলেন: 'রঘুনাথ সম্ভবতঃ প্রাণ নিয়ে পানিপথ ত্যাগ করতে পারেননি।'

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ইতিহাস যেমন শোকাবহ তেমনি ভয়াবহ। কারণ, যত হিন্দু-মুসলমান এই যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করেন, তা ভারতীয় ইতিহাসে আর কোনো যুদ্ধে ঘটেনি। মারাঠারা এ-যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হলো ঠিকই, কিন্তু মুসলিম শক্তিও কম ক্ষতিগ্রস্ত হলো না! অর্থাৎ জয়পরাজয়ের এই বাহ্য ফলাফলের অপর পিঠে রয়েছে উভয়পক্ষের অপরিমেয় ক্ষতির রক্তাক্ত-স্বাক্ষর। যে স্বাক্ষর নাট্যকার সংলাপবদ্ধ করেছেন তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে:

আব্‌দালী : আজ আমরা জয়ী। সমগ্র পানিপথ মারাঠা সৈনিকের রক্ত আর লাশে ঢেকে দিয়েছি। ...
সুজা : বাদশার পরাক্রম জগতে সুবিদিত।
আব্‌দালী : আমাদের নিজেদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কি খুবই ভয়াবহ?
সুজা : জাঁহাপনা স্বচক্ষে দেখেছেন।
আব্‌দালী : যা দেখেছি তা অবর্ণনীয়। লাশের উপর লাশ, তার পর লাশ। কেউ উপুড় হয়ে, কেউ চিৎ হয়ে, কেউ দলা পাকিয়ে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরেছে, আঁকড়ে ধরেছে। নানা জনের

> কাটা কাটা শরীরের নানা অংশ তালগোল পাকিয়ে এক জায়গায় পড়ে আছে। রক্তে রক্ত মিশেছে। কার সাধ্য এই রক্ত-মাংস-অস্থি হাতড়ে শত্রু-মিত্র বেছে বেছে আলাদা করে।[৩৪]

নাট্যকারের এই বিষাদপূর্ণ বর্ণনা পাঠকমন রক্তাক্ত করে। নাট্যকারও পৌঁছে যান তার অভীষ্ট লক্ষ্যে– যুদ্ধবিরোধী চেতনায়। কারণ, যুদ্ধ কখনো শান্তি আনতে পারে না, যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ উপর্যুক্ত দৃষ্টান্ত তথা পানিপথ যুদ্ধের পরিণতি। উল্লেখ্য যে, নাট্যকার এই 'যুদ্ধবিরোধীচেতনার' কথা বলতে গিয়ে আব্‌দালীর মুখে যুদ্ধের যে ভয়াবহ পরিণতি দেখিয়েছেন, সেটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। কাশীরাজ পণ্ডিতের বর্ণনায়:

> The day after the battle, the Shah, superbly dressed, rode round the field of battle, where he found thirty-two heaps of the slain of different numbers, most of them killed near each other, as they had fought; besides these, the ditch of the Bhow's camp, and the jungles all round the neighbourhood of Paniput, were filled with bodies.[৩৫]

এছাড়া নাট্যকার পেশোয়ার নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক কিশোরপুত্র বিশ্বাস রাওয়ের মৃতদেহ সনাক্তকরণ এবং লাশের যে বর্ণনা দিয়েছে, তাও পাঠকের হৃদয় বিদীর্ণ করে। রক্তাক্ত করে মন। নাট্যকারের বর্ণনায় :

> সুজা : বিশ্বাস রাওয়ের লাশও আমাদের সৈনিকরা উদ্ধার করে এনেছে।
> আব্‌দালী : বিশ্বাস রাওয়ের লাশ চিনতে পারলে কি করে? সনাক্ত করেছে কে?
> সুজা : আমি। চিনতে কোনো কষ্টই হয়নি। পেশবার এই সুন্দর সুকুমার কিশোর পুত্রকে যে একবার দেখেছে সেই মনে রেখেছে। মরণ সে মুখশ্রীকে নষ্ট করতে পারেনি। এত কোমল, এত স্নিগ্ধ, এত উজ্জ্বল যে কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না যে লাশ।[৩৬]

লক্ষণীয়, এখানে বিশ্বাস রাওয়ের লাশ প্রথমে সৈনিকদের দ্বারা উদ্ধার এবং পরে সুজাউদ্দৌলার দ্বারা চিহ্নিত করার কথা বলা হয়েছে– যার প্রথমটি ঐতিহাসিকভাবে সত্য হলেও দ্বিতীয়টি সত্য নয়। কারণ, ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়:

> Towards morning, some of Berkhordar Khan's Durranies having found the body of Biswas Row, on his elephant, after taking the elephant and jewels, brought the body to Shuja-ul-Dowlah, who gave them two thousand rupees for it, and ordered that it should be taken care of.[৩৭]

অর্থাৎ আব্‌দালীর ['দর-ঈ-দর্‌রান' ('দুর্গের প্রবাল') উপাধি নিয়েছিলেন বলে এই আব্‌দালীর আরেক নাম হয়– 'দুর্‌রানী' (Durrani)[৩৮]] অধীন সম্মুখসারির সৈন্যাধ্যক্ষ বারখোর্দার খানের সৈনিকরা প্রথমে বিশ্বাস রাওয়ের লাশ সনাক্ত করেন এবং সুজাউদ্দৌলাকে প্রদান করেন। ফলে নাট্যকারের তথ্যটি অনৈতিহাসিক হিসেবেই পরিগণিত হয়। তবে সুজাউদ্দৌলা বিশ্বাস রাওয়ের মৃতদেহের যে বর্ণনা দিয়েছে, তা ইতিহাসসম্মত। আমরা পূর্বেই জেনেছি যে, বিশ্বাস রাওয়ের লাশ নবাব সুজাউদ্দৌলার অধীনেই ছিল। আহ্‌মদ শাহ্ আব্‌দালী বিষয়টি জানতে পেরে পরের দিন সুজাউদ্দৌলাকে বিশ্বাস রাওয়ের লাশ তার কাছে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন। তদানুযায়ী সুজাউদ্দৌলা লাশ নিয়ে আব্‌দালীর তাঁবুতে পৌঁছান। ফলে:

> The whole camp great and small were assembled round the Shah's tent to see it; and every one was in admiration of the beauty of its appearance : it was not disfigured by death, but looked rather like a person who sleeps; he had one wound with a sword on the back of his neck, and a slight one with an arrow over his left eye, but there was no blood discoverable on any part of his remaining clothes.[৩৯]

অর্থাৎ বিশ্বাস রাওয়ের মৃতদেহের সৌন্দর্যসম্পর্কিত বর্ণনা যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী কাশীরাজ পণ্ডিত যেভাবে দিয়েছেন, নাট্যকার মুনীর চৌধুরীও যেন তার 'চেতনার রঙে' সেটাকেই অঙ্কন করেছেন– যা দেখে পাঠকমনে মায়া এবং করুণার উদ্রেক হয়।

আতা খাঁ এ-নাটকের পার্শ্বচরিত্র হলেও গুরুত্বপূর্ণ। নাট্যকাহিনিতে দেখা যায়, শৈশবে মারাঠা সৈন্যরা আতা খাঁকে লুট করে নিয়ে গিয়ে বিন্ধ্যগিরির আশ্রমে রেখে যায়। এখানেই সে অমরেন্দ্রনাথ হিসেবে বেড়ে ওঠে এবং আশ্রমকন্যা হিরণবালার সাথে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়। যৌবনে পদার্পণের পর হিরণবালা জানতে পারে সে আসলে অমরেন্দ্রনাথ নয়, আতা খাঁ– অর্থাৎ মুসলমান। কিন্তু হিন্দুরমণী হিরণবালা তাকে ত্যাগ করে আরেক প্রেমিক– স্বধর্মের দিলীপকে গ্রহণ করেনি। কারণ, আতা খাঁ সৎ, নিষ্ঠাবান, কর্তব্যপরায়ণ এবং মানবিকগুণসম্পন্ন এক নিখাদ প্রেমিক। অপরপক্ষে দিলীপ জটিল, কুটিল, নেশাগ্রস্ত, সর্বোপরি কামুক। ফলে হিন্দু হয়েও হিরণবালা সহজ-সরল-শুদ্ধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত বিধর্মী মুসলমান আতা খাঁকেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছে। মূলত নাট্যকার আতা খাঁ এবং হিরণবালার প্রেমের যে গাঢ়তা সৃষ্টি করেছেন, তা বৈষ্ণব কবিতা– 'পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি ॥/ দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'-র মতোই। এই গভীরপ্রেম সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নাট্যকার তাঁর অসাম্প্রদায়িকচেতনাকেই চিত্রিত করেছেন। উল্লেখ্য যে, আতা খাঁয়ের নাম পানিপথ যুদ্ধের সাথে জড়িত। কাশীরাজ পণ্ডিতের বর্ণনায় দেখা যায়– আতা খাঁ আব্‌দালীপক্ষীয় গ্রান্ড ভিজিয়ারের ভাগ্নে। পানিপথ যুদ্ধে তাঁর বীরত্বের কথাও উল্লেখ আছে। তিনি মারাঠাসৈনিক গোবিন্দ পণ্ডিতকে পরাজিত করেছিলেন। যুদ্ধে তিনি মারাঠাবাহিনীর হাতে নিহত হন।[৪০] তিনি শৈশবে মারাঠা বাহিনীর দ্বারা লুট হয়েছিলেন কিনা, কিংবা কোনো হিন্দুরমণীর প্রেমে পড়েছিলেন কিনা– এমন কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। কায়কোবাদই প্রথম কবিকল্পনায় আতা খাঁ এবং হিরণবালার প্রেমের কথা উল্লেখ করেন। মুনীর চৌধুরীও কায়কোবাদের পথ অনুসরণ করে বক্ষ্যমাণ নাটকের প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে আতা খাঁ, হিরণবালা এবং দিলীপের মাধ্যমে নির্মাণ করেন একটি প্রেমের শাখাকাহিনি। কায়কোবাদ আতা খাঁকে দিলীপের হাতে নিহত হওয়ার কথা জানান[৪১], কিন্তু দিলীপই যে তাকে হত্যা করেছে, এমন কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। মুনীর চৌধুরীর আতা খাঁকে আমরা জীবিতই দেখি, দেখি তার বিষাদভারাক্রান্ত রক্তাক্ত-অন্তর। কারণ, বেঁচে নেই তার প্রাণাধিক প্রিয়তমা হিরণবালা। নাট্যকার একটি ছোটো শাখাকাহিনির মাধ্যমে প্রিয়াহারা আতা খাঁর যে চিত্র তুলে ধরেন, তা পাঠকমনকে হতবাক করে, কিন্তু ক্ষুব্ধ করে না, বরং যুদ্ধবিরোধী হতে শিক্ষা দেয়। উল্লেখ্য যে, আতা খাঁ ঐতিহাসিক চরিত্র হলেও হিরণবালা কিংবা দিলীপের পরিচয় ইতিহাসে নেই। ইতিহাসের নীরস-শুষ্ক বিষয়ের মধ্যে রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জার প্রলেপ দিয়ে বিষয়টাকে সরস করে তোলা– সর্বোপরি 'শিল্পসৃষ্টির' প্রয়োজনেই নাট্যকার মূলত হিরণবালা, জরিনা বেগম, দিলীপ, বশীর খাঁ,

রহিম শেখের মতো সাধারণ চরিত্র এবং জোহরার মতো অসাধারণ প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এছাড়া তিনি যে সকল ঐতিহাসিক চরিত্র এবং ঘটনা শিল্পিত করেছেন, তাও পুরোপুরি ইতিহাসসম্মত নয়। নাট্যকারও সেটা অকপটে স্বীকার করেন:

> আমি নাটকের বশ, ইতিহাসের দাস নই। নাটকে ইতিহাস উপলক্ষ মাত্র। তাকে আমি নির্বাচন করি এই জন্য যে তার মধ্যে আমার আধুনিক জীবন-চেতনার কোনো রূপক আভাসে হলেও কল্পনীয় বিবেচনা করেছি। এবং যেখানে কল্পনা বিঘ্ন অলঙ্ঘনীয় মনে করেনি সেখানে অসংকোচে পুরনো বোতলে নতুন সুরা সরবরাহ করেছি। এই *রক্তাক্ত-প্রান্তর*কে ঐতিহাসিক নাটক না বললেও ক্ষতি নেই।[৪২]

এই সরল স্বীকারোক্তি নাট্যকারের মহত্বরই পরিচায়ক, কিন্তু সর্বাংশে যে সত্য নয়, সেটা বোধগম্য হতে বিলম্ব হয় না। এ-প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি, ড্রাইডেনের (John Dryden; ১৬৬৮-১৬৮৮) বিখ্যাত নাটক *আওরংজীব* (*Auren-zebe: A Tragedy*, রচনাকাল: ১৬৭৫, প্রকাশকাল: ১৬৭৬)-এর কথা। এই নাটকে ড্রাইডেন আওরংজীবকে যে আকৃতি দান করেছেন প্রকৃত ইতিহাসের সাক্ষ্য তার বিপরীত। অথচ মুনীর চৌধুরী *আওরংজীব*-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে যে প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন, সেটাও প্রণিধান করা অত্যাবশ্যক :

> সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস বা নাটকেও ইতিহাস মুখ্য নয়, মুখ্য অপূর্ব বস্তুনির্মাণক্ষম শিল্পীর প্রজ্ঞা। যদি শিল্পী মহাপণ্ডিত হন তবু লক্ষ্য করা যাবে যে তাঁর পাণ্ডিত্য গ্রহণ-বর্জনের একটা বিশেষ পথ অনুসরণ করে, এই নির্বাচন-নির্মাণের মধ্য দিয়ে তাঁর শিল্প-মনোদ্ভূত জীবনচেতনা স্বাধীনভাবে ইতিহাসের ঘটনাক্রমকে নবপরিচর্যা দান করে, পরিবেশে নতুন সম্মোহনশক্তি সঞ্চারিত করে, চরিত্রাবলীকে কবিকল্পিত আবেগের প্রচণ্ডতায় মাতিয়ে তোলে।[৪৩]

অর্থাৎ সার্থক ঐতিহাসিক নাটকের জন্য ইতিহাস মুখ্য নয়, মুখ্য 'অপূর্ব বস্তুনির্মাণক্ষম শিল্পীর প্রজ্ঞা'– যা ড্রাইডেনের যেমন ছিল, মুনীর চৌধুরীতেও তা সমান বর্তমান। ফলে *রক্তাক্ত-প্রান্তর*কে সার্থক ঐতিহাসিক নাটক না-বলে উপায় থাকে না।

৪.

রক্তাক্ত-প্রান্তর প্রকাশের দুবছর বাদে ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে 'ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায়' প্রবন্ধটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়। [প্রবন্ধটি পরে *তুলনামূলক সমালোচনা* (১৯৬৯) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়।] অর্থাৎ অনুমান করাই শ্রেয় যে, মুনীর চৌধুরী *রক্তাক্ত-প্রান্তর* রচনার সময় বা কিছুপূর্বে ড্রাইডেন বেশ ভালোভাবেই পড়েছিলেন। বিশেষত এই গ্রন্থে তিনি ড্রাইডেনের *আওরংজীব* ছাড়াও আরো দুটি নাটক– *রাইভাল লেডিজ* (*The Rival Ladies: A Tragi-Comedy*; ১৬৬৪), *ইন্ডিয়ান কুইন* (*The Indian Queen*; ১৬৬৫)-এর প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। যেগুলোর কাহিনিসারাংশ ইতিহাস (যেখানে মুখ্যবিষয় : রাজনীতি, রণনীতি, ধর্মীয় বা রাষ্ট্রীয় আদর্শ) থেকে গৃহীত হলেও মুখ্যবিষয় হিসেবে 'প্রেম'-ই শিল্পিত হয়েছে। ফলে *রক্তাক্ত-প্রান্তরে* ড্রাইডেনের প্রভাব পড়া অস্বাভাবিক কোনো বিষয় নয়। কারণ, ড্রাইডেনের মতো তিনিও যুদ্ধবিগ্রহে পরিপূর্ণ ঐতিহাসিক পটভূমিতে 'প্রেম'কেই মুখ্য করে তুলেছেন। এ-প্রেম আতা খাঁ-হিরণবালার মধ্যে যেমন দৃশ্যমান, তারও অধিক প্রতিফলিত হয়েছে ইব্রাহিম কার্দি-জোহরা বেগমের মধ্যে। উল্লেখ্য যে, ইব্রাহিম কার্দিকে যেহেতু নাট্যকার কর্তব্য ও কৃতজ্ঞতাবোধের

'আধার ও আধেয়' হিসেবে চিত্রিত করেছেন, সেহেতু এই নীতিবোধই তাকে প্রগাঢ় প্রেমানুভূতির বিপরীত পথে পরিচালিত করে। আবার কখনো কখনো নীতিবোধের ওপর প্রেমই গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ নাট্যকার কার্দির যে দ্বন্দ্ব শিল্পিত করেছেন, সেখানে প্রেম এবং নীতিবোধের দ্বন্দ্বই মুখ্য। নাট্যঘটনায় দেখা যায়, পাশ্চাত্য রণবিদ্যায় পারদর্শী এবং সকল গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও স্বজাতির কাছে কার্দি তার প্রাপ্য সম্মান পায়নি; অথচ তাকেই যথাযথ মর্যাদা দিয়ে সৈন্যাধ্যক্ষের পদে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে মারাঠাধিপতি পেশবা (পেশোয়া)। এরপরই পানিপথের প্রান্তরে শুরু হয়েছে মুসলিম শক্তির সাথে মারাঠার সংঘর্ষ। ফলে মুসলমান হয়েও মুসলমানদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করতে হয়েছে তাকে। জোহরা বেগম তা মানতে চায়নি, বরং প্রলোভন দেখিয়েছে, যা প্রতিভাস হয় কার্দির কথায়: 'মেহ্‌দী বেগ তার কন্যার জন্য লাহোরে যে সম্পত্তি রেখে গেছে জামাতা হিসেবে তার উপর আমার অধিকার নাকি ষোল আনা। মারাঠাদের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে, নিজের পত্নীর সম্পত্তিকে নিজ সম্পদ বিবেচনা করে তার সাহায্যে কোন স্বাধীন জীবন নির্বাহ করি।'[৪৪] জোহরার এই প্রলোভন কার্দির ব্যক্তিত্ব, কর্তব্য এবং কৃতজ্ঞতাবোধের কাছে হার মেনেছে। এমনকি জোহরা তাকে ছেড়ে মুসলমানদের পক্ষ নিলেও সে তার 'নীতি'তে থেকেছে স্থির :

> কার্দি : যে ফিরে যাবে সে আমি হবো না। সে হবে বিশ্বাসঘাতক। সে হবে ইব্রাহিম কার্দির লাশ। তাকে দিয়ে তুমি কী করবে? তুমি কাঁদছো! ভারতে মুসলিম শক্তি জয়যুক্ত হোক, তার পূর্ব গৌরব সে ফিরে পাক– বিশ্বাস করো এ কামনা আমার মনে অহরহ জ্বলছে। কিন্তু ভাগ্য আমাকে প্রতারিত করেছে। সে গৌরবে অংশগ্রহণের অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে। আমার সঙ্কটের দিনে যারা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, কর্মে নিযুক্ত করেছে, ঐশ্বর্য দান করেছে সে মারাঠাদের বিপদের দিনে আমি চুপ করে বসে থাকবো? পদত্যাগ করবো? দলত্যাগ করবো? সে হয়না, জোহরা। আমি নিশ্চিত জানি, জয়-পরাজয় যাই আসুক, মৃত্যু ভিন্ন আমার মুক্তির অন্য কোনো পথ নেই।[৪৫]

কার্দির এই নীতিবোধ কায়কোবাদও তাঁর *মহাশ্মশান* কাব্যে চিত্রিত করেছেন এভাবে:

> ... জান না কি তুমি (জোহরা)
> পেশবার ভৃত্য আমি, যেই দেহ মম
> তাহারি লবণ খে'য়ে হ'য়েছে বর্দ্ধিত,
> – তাহারি স্বার্থের তরে সেই দেহ মম[৪৬]

কিন্তু মুনীর চৌধুরী কার্দির 'নীতিবোধ'কে আরো মহান করে তোলার প্রয়োজনে জোহরার প্রলোভনকে (শ্বশুরের সম্পত্তিভোগের প্রলোভন) সংযোগ করেছেন। ফলে আমরা এমন এক নীতিজ্ঞ কার্দিকে প্রত্যক্ষ করি, যা কেবল হেনরিক ইবসেনের (Henrik Johan Ibsen; ১৮২৮-১৯০৬) *An Enemy of the People* (১৮৮২) নাটকের প্রধান চরিত্র ডাক্তার টমাস স্টকম্যানের সাথেই তুলনীয়। কেননা, নিজ কর্তব্যে স্থির থাকার কারণে ডাক্তার টমাস স্টকম্যান পরিণত হয়েছে 'গণশত্রু'তে, চাকরি হারিয়েছে, একমাত্র কন্যা পেট্রাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, ১০-১৩ বছরের দুই পুত্র এজলিফ ও মর্টেনকে স্কুলে যেতে নিষেধ করেছে শিক্ষকরা এবং বাড়িওয়ালাও বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার নোটিশ দিয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে টমাস স্টকম্যানকে। এমতাবস্থায় 'হঠাৎ-আলোর ঝলকানি' হয়ে এসেছে শ্বশুর মর্টেন

কিল। কেননা, মর্টেন কিলের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার তার স্ত্রী ও সন্তানেরা; কিন্তু বুর্জোয়া মর্টেন কিল ও নিঃস্ব টমাস স্টকম্যানের সংলাপে তৈরি হয়েছে চরম নাটকীয় পরিস্থিতি:

MORTEN KILL : ... that money is now invested in the Spa, all of it. And now I'm eager to see if your're that raging— barking— mad after all, Stockmann! If you go on letting creatures and such nasties come from my tannery, it'll be as if your tore wide strips of skin from Katrine, and Petra too, and the boys; and no proper husband and father does that— unless he's a madman, that is.

DR STOCKMANN : [*who is pacing up and down*] Yes, but I *am* a madman; I *am* a madman![৪৭]

এই সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতেও টমাস স্টকম্যান নীতিভ্রষ্ট হয়নি। *রক্তাক্ত-প্রান্তর* নাটকের ইব্রাহিম কার্দিও চরম নাটকীয় পরিস্থিতিতে নীতি বিসর্জন দেয়নি। বস্তুত মুনীর চৌধুরী যেহেতু নাটকের চরিত্র ও ঘটনাসংস্থাপনকে 'সর্বাংশে আধুনিক'[৪৮] করে তুলতে চেয়েছিলেন, সেহেতু আধুনিক নাট্যকার ইবসেনের ডাক্তার টমাস স্টকম্যান চরিত্রটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কার্দি চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলাটা অস্বাভাবিক নয়। তবে টমাস স্টকম্যান সর্বাংশে নীতির স্বাক্ষর রাখলেও কার্দি রাখতে পারেনি। কারণ, মুনীর চৌধুরী যেহেতু ড্রাইডেনের মতো ঐতিহাসিক পটভূমিতে 'প্রেমের নাটক' রচনা করতে সচেষ্ট হয়েছেন, সেহেতু তিনি ইবসেনের স্টকম্যানের নীতিকে সর্বাংশে রক্ষা করতে পারলেন না। ফলে প্রেমের কাছে পরাজিত হলো 'নীতি'। স্মর্তব্য, যে কার্দি তার প্রণয়িনীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল, 'যে ফিরে যাবে সে আমি হবো না। সে হবে বিশ্বাসঘাতক। সে হবে ইব্রাহিম কার্দির লাশ। তাকে দিয়ে তুমি কী করবে?'– অথচ সেই কার্দিই প্রেমের টানে যুদ্ধের পূর্বরাত্রে জোহরা বেগমের কাছে ছুটে এসেছে। জোহরার (ছদ্মনাম: মন্নুবেগ) কাছে কার্দির প্রত্যাবর্তনের যে চিত্র নাট্যকার চিত্রিত করেছেন, তা একার্থে প্রেমেই ক্লাইমেক্স:

মন্নু : ... এতই যদি দিগ্বিজয়ী হয়ে থাকো তাহলে আজ এলে কেন, এখানে এলে কেন?

কার্দি : প্রথম ভেবেছিলাম আসবো না। রণক্ষেত্রে যতোটুকু দেখতে পাবো তা দিয়েই মনের তিয়াস মিটাবো। তারপর হঠাৎ এক সময়ে মনের মধ্যে একটা ভয় ঢুকে গেল। যদি সেখানে তোমার সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা না হয়। হয়তো এমন এক সময় এসে তুমি আমার সামনে দাঁড়াবে যখন রক্তের বন্যায় এক প্রান্তর ডুবে গেছে। ঢেউয়ের দোলায় আমি কেবলই নীচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছি। তোমাকে দেখবো বলে যতোবার চোখ খুলতে চাইছি ততোবারই রক্তের ঝাপটায় সব গুলিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

(বাইরে বিপদ সংকেত ধ্বনিত হবে ও মাঝে মাঝে বাজবে)

মন্নু : তুমি মায়ামমতাশূন্য! তুমি ভয়াবহ! তোমাকে আমি চিনি না।[৪৯]

লক্ষণীয়, কার্দির সংলাপে কেবলই প্রেম প্রত্যক্ষিত হয়েছে, কিন্তু মন্নুবেগ তথা জোহরা বেগমের সংলাপে প্রেম প্রত্যাখ্যানের বিষয়টিই দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়। উল্লেখ্য যে, জোহরা বেগমের এই প্রেম-প্রত্যাখ্যান সত্যই কি সত্য? না। বরং জোহরার প্রেম-প্রত্যাখ্যাতের মধ্য দিয়ে নাট্যকার তার দুই রূপের (একরূপে জোহরা প্রেমময়ী, অন্যরূপে বীরাঙ্গনা) অন্যতম রূপ 'বীরাঙ্গনাসত্তা'কেই চিত্রিত করেছেন– যা একইসাথে 'কঠিন এবং কোমল'। ফলে জোহরার প্রেম প্রত্যাখ্যান আপাতদৃষ্টিতে 'কঠিন' হলেও, মূলত তা 'কোমল'– যা প্রেমের আরেক রূপ 'অভিমান'কেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

কেন এই অভিমান? নাট্যঘটনায় দেখা যায়, জোহরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও তার প্রাণপ্রিয় প্রেমিক (স্বামী) ইব্রাহিম কার্দিকে তার নীতি থেকে একবিন্দুও টলাতে পারেনি। আবার সেও ফিরে যেতে পারেনি কার্দির পক্ষে। কারণ, তাদের দুজনের মাঝখানে আছে মারাঠাদের হাতে নিহত জোহরার পিতার লাশ। এভাবে নাট্যকার তাঁর সৃজিত চরিত্রে সৃষ্টি করেছেন হৃদয়াবেগ ও কর্তব্যবুদ্ধির দ্বন্দ্ব। তবে 'কর্তব্যবুদ্ধির' দ্বন্দ্বে কার্দি ও জোহরার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু 'হৃদয়াবেগের' দ্বন্দ্বে ঘাটতি পড়েনি 'প্রেমের'। বস্তুত একথা সত্য যে, হৃদয়াবেগের দ্বন্দ্বে কার্দির চেয়ে বেশি দ্বন্দ্বিত জোহরা। কেননা, সে কার্দিকে ফেরাতে না-পেরে বিফল হয়ে ফিরে এসেছে এবং কার্দি যখন প্রেমের তাড়নায় তাকে শেষবারের মতো দেখতে এসেছে, তখন সেই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। অথচ যুদ্ধশেষে যখন সে জানতে পেরেছে কার্দি বন্দি, তখন সে আব্‌দালীর কাছে যুদ্ধপুরস্কারস্বরূপ প্রার্থনা করেছে আহত কার্দির মুক্তি। স্মর্তব্য, যে কার্দি সুস্থ-সজ্ঞানে প্রেম এবং প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করে নীতিগত জায়গায় স্থির থেকেছে, সেই কার্দিকে আহত-অজ্ঞান অবস্থায় মুক্ত করার প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে জোহরার দিশেহারা প্রণয়াবেগই প্রকাশ পায়। অর্থাৎ হেরে যায় 'কর্তব্যবুদ্ধি', জয়ী হয় 'হৃদয়াবেগ' তথা 'প্রেম'। বস্তুত এ-নাটকের 'রক্তাক্ত-প্রান্তর' মূলত জোহরার 'রক্তাক্ত-অন্তর'। কারণ, রক্তের তপ্তস্রোত সাঁতরে পার হয়েও সে তার প্রিয়তম কার্দিকে জীবিতাবস্থায় পায়নি। ফলে শূন্যতা, বেদনা ও কষ্টে রক্তাক্ত হয়েছে তার অন্তর:

> জোহরা : তুমি কেন সাড়া দিলে না? কেন জেগে উঠলে না? কেন ঘুমিয়ে পড়লে? আমি এত কষ্টের আগুনে পুড়ে, মনের বিষে জরজর হয়ে এত রক্তের তপ্তস্রোত সাঁতরে পার হয়ে তোমাকে পাবার জন্যে ছুটে এলাম– আর তুমি কিনা ঘুমিয়ে পড়লে। ঘুমের কোন্ অতল তলে ডুবে রইলে যে আমি এত চীৎকার করে ডাকলাম তবু তুমি একবারও শুনতে পেলে না। আহা! ঘুমোও। আমি তোমাকে জাগাবো না। তোমার মুখ দেখে আমি বুঝেছি, অনেকদিন তুমি ঘুমোওনি। চোখের দু'পাতা মুদে মনের আগুনের লক্‌লকে শিখাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও আড়ালে ঠেলে দিতে পারোনি। কষ্ট, ঘুমের বড় কষ্টে ভুগেছো তুমি। ঘুমোও! আরো ঘুমাও! প্রাণ ভরে ঘুমাও![৫০]

এই শিল্পিতসংলাপটি নির্মাণের মধ্য দিয়ে নাট্যকার করুণ রসের 'মহিমা' সৃষ্টি করেছেন। কেননা, মৃত্যু নয়, বেঁচে থেকে মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ যে যন্ত্রণা জোহরার অন্তরে উপলব্ধি হয়েছে পাঠকের অন্তরেও তা অসামান্য উপলব্ধির জন্ম দেয়।

সুজাউদ্দৌলা এ-নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। কেবল নিজের দায়িত্ব পালনের জন্যই সে যোগদান করে পানিপথ যুদ্ধে, কিন্তু অন্তরে সে জানে– যুদ্ধ কোনো সমস্যারই সমাধান করে না, বরং সংগ্রামের চেয়ে শান্তি, বন্দিত্বের চেয়ে মুক্তি অনেক বড়ো। পুরো নাটক জুড়েই তাকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন– ধীর, স্থির ও শান্ত প্রকৃতির বলেই মনে হয়। ফলে চারপাশের মানুষের মর্মও সে সহজে উপলব্ধি করতে পারে, তাদের ক্ষোভ ও ক্ষতের জন্য গভীর সহানুভূতিও অনুভব করে। এই সকল বৈশিষ্ট্যের গুণেই তাকে প্রজ্ঞাসম্পন্ন দার্শনিক মনে হয়। নাট্যকারও তার মুখে নির্মাণ করেন দার্শনিকোচিত সংলাপ: 'মানুষ মরে গেলে পচে যায়। বেঁচে থাকলে বদলায়। কারণে-অকারণে বদলায়। সকালে-বিকালে বদলায়।'[৫১]

কাবুলেশ্বর আহ্‌মদ শাহ্‌ আব্‌দালীও এ-নাটকের প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র। যেহেতু আব্‌দালী বাঙালি মুসলিম বিদ্বৎসমাজে মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রতীক, সেহেতু নাট্যকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই স্থূলদৃষ্টিতে আব্‌দালী চরিত্রের 'মহানুভবতা' দেখিয়েছেন। কিন্তু তিনি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে আব্‌দালী চরিত্রের মধ্য দিয়ে 'যুদ্ধবিরোধীচেতনা'কেই চিত্রিত করেছেন। বস্তুত আব্‌দালী, সুজাউদ্দৌলা এমনকি ইব্রাহিম কার্দির চেয়েও অধিকতর উজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত চরিত্র নবাব নজীবদ্দৌলা। কেননা, আমরা আব্‌দালীর মধ্যে কেবল 'মহানুভবতা', সুজাউদ্দৌলার মধ্যে কেবল ধীর, স্থির ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিকোচিত গুণাবলি এবং কার্দিকে কেবল কর্তব্য ও কৃতজ্ঞতাবোধের 'আধার ও আধেয়' রূপেই দেখি। অর্থাৎ তারা সকলেই সদর্থক, সদ্‌গুণাবলিসম্পন্ন। এ-দিক থেকে ব্যতিক্রম নজীবদ্দৌলা। সে দোষেগুণে 'মানুষ'। আমরা দেখি, সে সুজাউদ্দৌলাকে হিন্দুস্তানের সমগ্র মুসলিম জাতি পরিচালনার প্রলোভন দেখিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করছে; আবার যুদ্ধশেষে বিজয়োৎসবের আমেজ বৃদ্ধির জন্য সমগ্র ঘৃণা ও রোষের প্রতীক পেশোয়ার পুত্র বিশ্বাস রাওয়ের লাশ আব্‌দালীর কাছে প্রার্থনা করেছে– যা তার 'বীরসত্তা'কেই প্রতিনিধিত্ব করে। অপরপক্ষে কার্দিপত্নী জেনেও সে জোহরা বেগমের রূপ ও শৌর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করেছে। এ-প্রেম দিলীপের মতো কামুকপ্রকৃতির নয়, বরং 'নীরব'– ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যাওয়া, দগ্ধ হওয়া যার ধর্ম এবং যে প্রেম গোপন করতেই তার স্ত্রী জরিনা বেগমের নারীসুলভ সন্দেহের সাথেও ছল করা। এ-প্রসঙ্গে নাট্যকারের বক্তব্যটি প্রণিধানগম্য:

> প্রবল আবেগ সম্পন্ন এই আদর্শবাদী বীর জোহরা বেগমের রূপ ও শৌর্যে মুগ্ধ হয়। যদি জরিনা বেগমের পতি-সান্নিধ্য লাভের কামনা এত উদগ্র না হতো, সংকটের দিনেও যদি স্বামীকে তার কর্মময় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল নিজের বাহুপাশে আবদ্ধ রাখার জন্য জরিনা ব্যাকুলতা প্রকাশ না করত, যদি জরিনার নারীসুলভ সন্দেহপরায়ণতা বিষময় তীব্রতা ধারণ না করত, তা'হলে নবাব নিজের অন্তরের প্রচ্ছন্ন বাসনার আগুনে আরও দীর্ঘকাল পুড়ে মরলেও হয়ত যা অনুচিত তা প্রকাশ করত না।[৫২]

অর্থাৎ জরিনা বেগমের 'নারীসুলভ সন্দেহপরায়ণতার বিষময় তীব্রতা'য়ও নজীবদ্দৌলা তার 'অন্তরের প্রচ্ছন্ন বাসনা'– তথা 'জোহরার প্রতি প্রেম'কে গোপন করাই শ্রেয় মনে করেছে। হয়তো এই বাসনার আগুনে দীর্ঘকাল পুড়ে মরলেও সে তা প্রকাশ করত না। তাছাড়া সে জোর করে জোহরার মনকেও হরণ করতে চায়নি, বরং বরাবরই সে নিজের অন্তরের প্রচ্ছন্ন বাসনার আগুনে পুড়ে মরেছে। এ-সকল দোষগুণই তাকে 'মানুষ' করেছে। কারণ, মানুষ স্বর্গের দেবতা বা নরকের কীট নয়– সে দোষেগুণে মানুষ। এই 'মানুষ' চরিত্রটি ডি. এল. রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) *সাজাহান* (১৯০৯) নাটকের আওরংজীবের সাথেই তুলনীয়। কেননা, মুনীর চৌধুরী প্রবল সম্ভাবনাময় চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও আওরংজীবের মধ্যে অসম্পূর্ণতা লক্ষ করে বলেছিলেন: 'আওরংজীব-চরিত্র 'সাজাহান' নাটকের সর্বাপেক্ষা সম্ভাবনাপূর্ণ চরিত্র ছিল, কিন্তু নাট্যকারের অসাম্প্রদায়িক অধার্মিক আধুনিক মানস এ-জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে পরিপূর্ণ সহানুভূতির সেতু স্থাপন করতে সক্ষম না হওয়ায় নাটকের আওরংজীব অপূর্ণাবয়ব ও অসঙ্গতিপূর্ণ।'[৫৩] অর্থাৎ অনুমান করাই শ্রেয় যে, মুনীর চৌধুরী আওরংজীব চরিত্রের 'অপূর্ণাবয়ব ও অসঙ্গতি'কে 'পূর্ণাবয়ব ও সঙ্গতি' দানের নিমিত্তেই নজীবদ্দৌলাকে নির্মাণ করেছেন। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন, 'নাট্যকার কেবল বর্ণক নন, তিনি

স্রষ্টা। চরিত্রের সকল দোষগুণ তাঁকে এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে, যাতে তাদের সমাবেশ পাঠকের হৃদয়ে দ্বিধাহীন বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারে, অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য সত্ত্বেও সে চরিত্রের ঐক্যবদ্ধ অস্তিত্ব যেন সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য হয়, বিশ্বাসযোগ্য হয়।'[৫৪] এই বৈশিষ্ট্য নজীবদ্দৌলার মধ্যে দৃশ্যমান। ফলে নজীবদ্দৌলার সকল দোষগুণ পাঠকের কাছে দ্বিধাহীনচিত্তে গ্রহণযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য হয়– যার প্রবল অসঙ্গতি আওরংজীবের মধ্যে বিদ্যমান।

'ছদ্মবেশ' বক্ষ্যমাণ নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। নাট্যকার মূলত নাটকীয় উৎকণ্ঠা (suspence) সৃষ্টির নিমিত্তে চরিত্র বিশেষের ছদ্মবেশ ধারণকে শিল্পিত করেছেন। নাটকের প্রধান চরিত্র জোহরা বেগমের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, তার দুটি রূপ। যে রূপকে নাট্যকার প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দুটি চিত্রকলার (Painting) প্রতীকে চিত্রিত করেছেন এভাবে:

অমর : এই ছবিটা এত কোমল, আর এটা এত কঠিন যে, না বলে দিলে কিছুতেই বুঝতে পারতাম না যে একই রমণীর চিত্র।

কার্দি : তোমার বোঝার কথা নয়।

অমর : এই শেষের ছবিটার কথা বলছি জনাব। অশ্বপৃষ্ঠে আসীন, কোষমুক্ত তরবারী হাতে রমণীরূপের এই বীরাঙ্গনা মূর্তি মারাঠা শিবিরে কখনো দেখিনি জনাব।[৫৫]

অর্থাৎ জোহরা বেগম একরূপে 'কোমল' তথা 'প্রেমময়ী', অন্যরূপে 'কঠিন' তথা 'বীরাঙ্গনা'। পানিপথ যুদ্ধের প্রতিকূল পরিবেশের নিপীড়নে এই দুই প্রবণতা তার হৃদয়ে কোনো শান্তিময় সামঞ্জস্য বিধানে সমর্থ হয় না। কারণ, সে একবার প্রণয়াবেগে দিশাহারা হয়ে শত্রুশিবিরে ছুটে গেছে, আবার স্বীয়শিবিরে প্রত্যাবর্তন করে বীরাঙ্গনামূর্তি ধারণ করেছে। ফলে ক্ষতাক্ত হৃদয়ে পরম প্রিয়তমের বিরুদ্ধেই উত্তোলিত অসিহস্তে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মূলত জোহরার এই বীরঙ্গনামূর্তির অনেকখানিই যে তার ছদ্মবেশ[৫৬], তা বুঝে নিতে বিলম্ব হয় না। নাটকের দার্শনিক চরিত্র সুজাউদ্দৌলাও সেটা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল বলেই জোহরাকে বলেছিল : 'নিজেকে শাস্তি দিও না। মুখোশ না পরে কে? মন উদাম করে চলে এমন বীর দুনিয়ায় ক'জন আছে? আমি তুমি কেউ তার ব্যতিক্রম নই। তবুও তুমি মহৎ এইজন্য যে তোমার আবরণ মনে নয়, পোশাকে। তোমার ছদ্মবেশ অন্তরে নয়, বহিরঙ্গে। তোমার রূপ, তোমার ভালোবাসা, তোমার জ্বালা কিছুই তার আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকে না।'[৫৭] ফলে দেখা যায়, যুদ্ধশেষে পুনরায় প্রণয়াবেগে দিশাহারা হয়ে যুদ্ধপুরস্কারস্বরূপ কার্দির মুক্তি প্রার্থনা করছে। ইব্রাহিম কার্দির হৃদয়ের আত্মক্ষয়ী দ্বন্দ্বের স্বরূপও একই প্রকৃতির। অর্থাৎ ছদ্মবেশী। ফলে দেখা যায়, সে কর্তব্যবুদ্ধিবশত মারাঠাপক্ষেই থেকেছে, অথচ মনেপ্রাণে চেয়েছে– 'মুসলিমশক্তিই জয়যুক্ত হোক'। এছাড়া হৃদয়াবেগের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধের পূর্বরাত্রে ছুটে এসেছে প্রিয়তমার সাথে সাক্ষাতের নিমিত্তে। অর্থাৎ তার কর্তব্যপরায়ণতাও যে অনেকখানি ছদ্মবেশ, সেটাও বুঝে নিতে বিলম্ব হয় না। বস্তুত উপর্যুক্ত দৃষ্টান্ত মূলত 'অন্তর্গত-ছদ্মবেশ'কেই প্রতিনিধিত্ব করে। তবে এ-নাটকে 'বহিরঙ্গের ছদ্মবেশ'ও চিত্রিত হয়েছে। আতা খাঁর 'অমরেন্দ্রনাথ রূপ' এবং জোহরা বেগমের 'মন্নুবেগ রূপ' যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বস্তুত মুনীর চৌধুরী নাটকীয় উৎকণ্ঠা সৃষ্টির নিমিত্তেই শেক্‌সপিয়রের আদর্শে চরিত্র বিশেষের এই ছদ্মবেশকে শিল্পে উন্নীত করেছেন। কারণ, শেক্‌সপিয়র ছিলেন তাঁর প্রিয়

নাট্যকার। ফলে 'চরিত্র বিশেষের ছদ্মবেশ' দেখিয়ে তিনি হয়তো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শেক্সপিয়রের আদর্শই গ্রহণ করেছেন। কারণ, শেক্সপিয়রই এই কারিগরির (চরিত্র বিশেষের ছদ্মবেশ ধারণ) বাদশাহ্। তিনি তাঁর *As You Like It*, *Much Ado About Nothing*, *The Merry Wives of Windsor*, *Twelfth Night* ইত্যাদি নাটকে এই কৌশল চমৎকারভাবে প্রয়োগ করেছেন। মূলত শেক্সপিয়র তাঁর এইসব নাটকের বিভিন্ন চরিত্র কর্তৃক মুখোশ পরিধান এবং ছদ্মবেশ ধারণের মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন, 'মানুষ মাত্রেই জীবনাভিনয় করে ছদ্মবেশে।'[৫৮] *রক্তাক্ত-প্রান্তর* নাটকের চরিত্র বিশেষের ছদ্মবেশ ধারণ দেখিয়ে মুনীর চৌধুরীও শেক্সপিয়রের দর্শনকেই পুনরায় দর্শিয়ে দিলেন। ফলে নাটকটি গভীর জীবনোপলব্ধির সূক্ষ্মতর দ্যোতনার ইঙ্গিতবহ হয়ে ওঠে।

৫.

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতিভাস হয় যে, মুনীর চৌধুরী কায়কোবাদের *মহাশ্মশান* মহাকাব্য থেকে কাহিনিসারাংশ গ্রহণ করলেও তা *মহাশ্মশানে*র মতো কেবল হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বই নয়; আবার তা পানিপথ যুদ্ধের সত্য কোনো ঘটনার বিবরণও নয়। বরং তিনি মোঘল-মারাঠা-আফগান চরিত্রকে আধেয় করে যুদ্ধবিগ্রহে পরিপূর্ণ ঐতিহাসিক পটভূমিকে কালজ-প্রেক্ষাপটে প্রতিস্থাপন করে স্বার্থ-ষড়যন্ত্র-ক্ষমতাদ্বন্দ্ব-জাতিদ্বন্দ্ব-জাতীয়তাবাদকে চিত্রিত করেছেন। যেখানে যুদ্ধবিরোধী, অসাম্প্রদায়িক এবং মানবিক চেতনার মধ্য দিয়ে 'প্রেম' তথা– হৃদয়াবেগের দ্বন্দ্ব– বিশেষত 'রক্তাক্ত-অন্তর'-ই তিনি মুখ্যবিষয় হিসেবে শিল্পিত করেছেন। অর্থাৎ মোঘল-মারাঠা-আফগান আধেয়ে সৃষ্ট *রক্তাক্ত-প্রান্তর* 'প্রেমের'ই নাটক– যার রূপ ও প্রকৃতি সর্বাংশে আধুনিক। ফলে নাটকটি 'কালজ' হয়েও 'কালোত্তরের' মাহাত্ম্যে মহিমান্বিত হয় তাঁর 'অপূর্ব বস্তুনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা'র গুণেই।

তথ্যসূত্র

---

১ আজহারউদ্দীন খান, 'রক্তাক্ত প্রান্তর: বিষণ্ন নায়ক', *দীপ্ত আলোর বন্যা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৯৯), পৃ. ৪৩০-৪৩১

২ উদ্ধৃত, তদেব, পৃ. ৪৩১

৩ নির্মলেন্দু গুণ ও হুমায়ূন কবির গৃহীত সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার (দুই), 'আত্মকথা', *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী-৪*, আনিসুজ্জামান সম্পা. (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, নভেম্বর ১৯৮৫), পৃ. ২২১

৪ তদেব, পৃ. ২১৭

৫ মুনীর চৌধুরী, 'ভূমিকা', 'রক্তাক্ত-প্রান্তর', *মুনীর চৌধুরী রচনাসমগ্র*-১, আনিসুজ্জামান সম্পা. (ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০০০), পৃ. ২৮

৬ কায়কোবাদ, 'তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা', *মহাশ্মশান* (ঢাকা: ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ৫ম সং., নভেম্বর ১৯৬৭), পৃ. ৸-৸৹ (১২-১৩)

৭ বেগম তাহেরউন্নিসা খাতুন, 'প্রকাশিকার নিবেদন', *মহাশ্মশান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৸৶০-২ (১৫-১৬)

[৮] আজহারউদ্দীন খান, 'রক্তাক্ত প্রান্তর: বিষণ্ন নায়ক', *দীপ্ত আলোর বন্যা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩২

[৯] J. L. Mehta, *Advanced Study in the History of Modern India, 1707-1813* (New Delhi: New Dawn Press Inc., 2005), p. 254

[১০] Ibid, p. 230-233

[১১] Ibid, p. 240

[১২] Casi Raja Pundit, *An Account of the Last Battle of Panipat And of the Events Leading to It*, Translated from Persian by Lieut.-Col. James Browne, Edited by H.G. Rawlinson (London: Oxford University Press, 1926), pp. 5-6

[১৩] মুনীর চৌধুরী, 'রক্তাক্ত-প্রান্তর', *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী-১*, আনিসুজ্জামান সম্পা. (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১ম প্রকাশ, জুন ১৯৮২), পৃ. ১০১

[১৪] Casi Raja Pundit, *An Account of the Last Battle of Panipat And of the Events Leading to It*, Ibid, p. 5

[১৫] মুনীর চৌধুরী, 'রক্তাক্ত-প্রান্তর', *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী-১*, আনিসুজ্জামান সম্পা. (বাংলা একাডেমি), পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬-৯০

[১৬] J. L. Mehta, *Advanced Study in the History of Modern India, 1707-1813*, Ibid, p. 263

[১৭] মুনীর চৌধুরী, 'রক্তাক্ত-প্রান্তর', *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী-১*, আনিসুজ্জামান সম্পা. (বাংলা একাডেমি), পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

[১৮] মুনীর চৌধুরী, 'ভূমিকা', 'রক্তাক্ত-প্রান্তর', *মুনীর চৌধুরী রচনাসমগ্র-১*, আনিসুজ্জামান সম্পা. (অন্যপ্রকাশ), পৃ. ২৮

[১৯] মুনীর চৌধুরী, 'রক্তাক্ত-প্রান্তর', *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী-১*, আনিসুজ্জামান সম্পা. (বাংলা একাডেমী), পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

[২০] Sidney J. Owen, *The Fall of The Mogul Empire* (London: John Murray, Albemarle Street, W, 1912), pp. 221-222

[২১] মুনীর চৌধুরী বিশ্বাস করতেন: 'শিল্পীর জ্ঞান বিজ্ঞানও নয়, বোধিও নয়– এ জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে আবেগময় অভিজ্ঞতা।' [মুনীর চৌধুরী, আ. ন. ম. গোলাম মোস্তফা গৃহীত সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার (এক), 'আত্মকথা', *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী-৪*, আনিসুজ্জামান সম্পা. (বাংলা একাডেমি), পূর্বোক্ত, পৃ. ২১১]

[২২] মুনীর চৌধুরী, 'রক্তাক্ত-প্রান্তর', *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী-১*, আনিসুজ্জামান সম্পা. (বাংলা একাডেমি), পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬

[২৩] তদেব, পৃ. ১১৮

[২৪] Casi Raja Pundit, *An Account of the Last Battle of Panipat And of the Events Leading to It*, Ibid, p. 46

[২৫] মুনীর চৌধুরী, 'রক্তাক্ত-প্রান্তর', *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী-১*, আনিসুজ্জামান সম্পা. (বাংলা একাডেমি), পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

[২৬] তদেব, পৃ. ১২৩

[২৭] মুনীর চৌধুরী, 'ভূমিকা', 'রক্তাক্ত-প্রান্তর', *মুনীর চৌধুরী রচনাসমগ্র-১*, আনিসুজ্জামান সম্পা. (অন্যপ্রকাশ), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

[২৮] Casi Raja Pundit, *An Account of the Last Battle of Panipat And of the Events Leading to It*, Ibid, p. 46

[২৯] মুনীর চৌধুরী, 'ভূমিকা', 'রক্তাক্ত-প্রান্তর', *মুনীর চৌধুরী রচনাসমগ্র-১*, আনিসুজ্জামান সম্পা. (অন্যপ্রকাশ), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

[৩০] Casi Raja Pundit, *An Account of the Last Battle of Panipat And of the Events Leading to It*, Ibid, See: Footnote 4, p. 1

[৩১] মুনীর চৌধুরী, 'রক্তাক্ত-প্রান্তর', *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী-১*, আনিসুজ্জামান সম্পা. (বাংলা একাডেমি), পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩

[৩২] Casi Raja Pundit, *An Account of the Last Battle of Panipat And of the Events Leading to It*, Ibid, p. 4

[৩৩] Ibid, p. 33

[৩৪] মুনীর চৌধুরী, 'রক্তাক্ত-প্রান্তর', *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী-১*, আনিসুজ্জামান সম্পা. (বাংলা একাডেমি), পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২

[৩৫] Casi Raja Pundit, *An Account of the Last Battle of Panipat And of the Events Leading to It*, Ibid, p. 46

[৩৬] মুনীর চৌধুরী, 'রক্তাক্ত-প্রান্তর', *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী-১*, আনিসুজ্জামান সম্পা. (বাংলা একাডেমি), পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩। উল্লেখ্য যে, বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত আনিসুজ্জামান সম্পাদিত *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী-১* এর এই সংলাপটি মুদ্রণ প্রমাদদোষে দুষ্ট। এখানে লেখা আছে: 'মরণ সে মুখশ্রীকে নষ্ট করতে পারেনি। এত কোমল, এত স্নিগ্ধ, এত উজ্জ্বল যে হতে চায় না যে এত লাশ। (দ্রষ্টব্য: পৃ. ১১৩) ফলে এটা কোনো বাক্য না-হওয়াতে আমরা বাংলা একাডেমী থেকে প্রথম প্রকাশিত *রক্তাক্ত-প্রান্তর* গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত সংলাপটি নির্বাচন করেছি। এখানে লেখা আছে: 'মরণ সে মুখশ্রীকে নষ্ট করতে পারেনি। এত কোমল, এত স্নিগ্ধ, এত উজ্জ্বল যে কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না যে লাশ।' [দ্রষ্টব্য : মুনীর চৌধুরী, *রক্তাক্ত-প্রান্তর* (ঢাকা: বাঙলা একাডেমি, ১ম প্র., মাঘ ১৩৬৮), পৃ. ৬৬]

[৩৭] Casi Raja Pundit, *An Account of the Last Battle of Panipat And of the Events Leading to It*, Ibid, p. 41

[৩৮] হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *ভারতবর্ষের ইতিহাস* (কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পর্ষদ কর্তৃক ৩য় পু. মু., জানুয়ারি ১৯৯০), পৃ. ১৬২

[৩৯] Casi Raja Pundit, *An Account of the Last Battle of Panipat And of the Events Leading to It*, Ibid, p. 41

[৪০] Ibid, p. 36

[৪১] কায়কোবাদ আতা খাঁর মৃত্যুদৃশ্য অঙ্কন করেছেন এভাবে:

দিলীপ আসিয়া তথা বিদ্যুৎ গতিতে
মারিল ভীষণ খড়্গ আতাখাঁর শিরে;
মুহূর্ত্তে সে ছিন্ন মুণ্ড পড়িল ভূতলে
রঞ্জিয়া সমর ক্ষেত্রে শোণিত প্লাবনে।

[দ্রষ্টব্য: কায়কোবাদ, *মহাশ্মশান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১০]

[৪২] মুনীর চৌধুরী, 'ভূমিকা', 'রক্তাক্ত-প্রান্তর', *মুনীর চৌধুরী রচনাসমগ্র-১*, আনিসুজ্জামান সম্পা. (অন্যপ্রকাশ), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭-২৮

[৪৩] মুনীর চৌধুরী, 'ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায়', *তুলনামূলক সমালোচনা* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১ম. মু., অক্টোবর ১৯৬৯), পৃ. ২১

[৪৪] মুনীর চৌধুরী, 'রক্তাক্ত-প্রান্তর', *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী-১*, আনিসুজ্জামান সম্পা. (অন্যপ্রকাশ), পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

[৪৫] তদেব, পৃ. ৭৬-৭৭

[৪৬] কায়কোবাদ, *মহাশ্মশান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫

[৪৭] Henrik Ibsen, 'An Enemy of the People', *A Doll's House and Other Plays*, Translated by Deborah Dawkin and Erik Skuggevik, Edited by Tore Rem (UK: Penguin Books, 2016), pp. 357-358

[৪৮] মুনীর চৌধুরী *রক্তাক্ত-প্রান্তরের* আধুনিকতা প্রসঙ্গে বলেন: 'আমার নাটকের চরিত্র-চিত্রণ, ঘটনা-সংস্থাপন ও সংলাপ নির্মাণের কৌশল আমার নিজস্ব। যে জীবনোপলব্ধিকে যে প্রক্রিয়ায় *রক্তাক্ত-প্রান্তরে* উজ্জ্বলতা দান করা হয়েছে তার রূপ ও প্রকৃতিও সর্বাংশে আধুনিক।' দ্রষ্টব্য: ভূমিকা অংশ, 'রক্তাক্ত-প্রান্তর', *মুনীর চৌধুরী রচনাসমগ্র*-১, আনিসুজ্জামান সম্পা. (অন্যপ্রকাশ), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

[৪৯] মুনীর চৌধুরী, 'রক্তাক্ত-প্রান্তর', *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী*-১, আনিসুজ্জামান সম্পা. (বাংলা একাডেমি), পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১

[৫০] তদেব, পৃ. ১২৪

[৫১] তদেব, পৃ. ৮৭

[৫২] মুনীর চৌধুরী, 'রক্তাক্ত-প্রান্তর', *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী*-১, আনিসুজ্জামান সম্পা. (অন্যপ্রকাশ), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

[৫৩] মুনীর চৌধুরী, 'ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায়', *তুলনামূলক সমালোচনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

[৫৪] তদেব, পৃ. ৪৫

[৫৫] মুনীর চৌধুরী, 'রক্তাক্ত-প্রান্তর', বাংলা একাডেমি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩-৭৪

[৫৬] মুনীর চৌধুরী, 'রক্তাক্ত-প্রান্তর', *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী*-১, আনিসুজ্জামান সম্পা. (অন্যপ্রকাশ), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

[৫৭] মুনীর চৌধুরী, 'রক্তাক্ত-প্রান্তর', বাংলা একাডেমি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮

[৫৮] মুনীর চৌধুরী, 'মাইকেল ও শেক্সপীয়র', *তুলনামূলক সমালোচনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একচল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০/জুন ২০২৩

বাংলাদেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থা এবং তাঁদের সুরক্ষায় বিদ্যমান আইনী কাঠামো

নাহিদ ফেরদৌসী*

সারসংক্ষেপ

মানবজীবনের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের সর্বশেষ অধ্যায় হচ্ছে প্রবীণত্ব। যদিও এটি ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় কিন্তু তা ব্যক্তি থেকে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্বকে ভাবিয়ে তুলেছে। উন্নত দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের প্রবীণদের সংখ্যা, তাঁদের প্রতি পরিবার ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁদের সামাজিক অবস্থা, মানবিক অধিকার এবং কল্যাণমূলক কার্যক্রম ভিন্ন ধরনের। নানা কারণে বাংলাদেশের প্রবীণদের সামাজিক কল্যাণ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাগত, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, মৌলিক ও মানবিক অধিকারের বিষয়টি পিছিয়ে রয়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে প্রবীণদেরকে সম্মান করা, বয়স্ক পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের দেখভাল করার পারিবারিক ও সামাজিক যে রীতি ছিল, তা বর্তমানে জীবনযাত্রার পরিবর্তনের কারণে শিথিল হয়ে পড়ছে। ফলে প্রবীণদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান বা তাঁদের অধিকার আদায়ে আইনী ব্যবস্থার প্রয়োজন। প্রবীণদের অধিকার সুরক্ষার জন্য মাদ্রিদ আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনা ১৯৮২-এর উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ২০১৩ সালে জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা প্রণীত হয়। এছাড়া ২০১৩ সালে পিতামাতার ভরণপোষণ আইনটিও প্রণয়ন করা হয় যেখানে প্রবীণ পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব পালন করা ও ভরণপোষণ আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে বাংলাদেশের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থা ও তাঁদের অধিকার সুরক্ষায় আইনী কাঠামো পর্যালোচনা করা হয়েছে।

চাবি শব্দ: প্রবীণ জনগোষ্ঠী, সামাজিক অবস্থা, আইনী কাঠামো, চিকিৎসা, বৃদ্ধাশ্রম।

ভূমিকা

বার্ধক্য মানবজীবনের শেষ অধ্যায়ে চরম সত্য। পৃথিবীর সকল মানুষই বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথেই জীবনের এই নির্দিষ্ট সত্যে এসে পৌঁছায়। জীবনের এই অধ্যায়ে প্রবীণজনরা সুস্থ জীবনযাপন ও পরিচর্যার জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তাঁদের পরিবার ও সমাজ থেকে সম্মান, মর্যাদা ও যত্নের সাথে সেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। একই সাথে নবীন ও প্রবীণের পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা থাকলে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা হয়। তবে বিশ্বায়নের এই যুগে উন্নত মানবসমাজ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তন হওয়ায় নির্ভরশীল প্রবীণদের সুরক্ষার বিষয়টি অবহেলিত হতে শুরু করেছে। এক সময় যৌথ পরিবার প্রথা বয়স্কদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব পালন করতো। জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সাথে সাথে গ্রামীণ সমাজ ভেঙে শহুরে সমাজ গড়ে উঠেছে। জীবনযাত্রার মানের

* অধ্যাপক (আইন), সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

ঊর্ধ্বগতি ও অর্থনৈতিক সংকট প্রভৃতি কারণে মানুষ একক পরিবারে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কগত কাঠামো ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। এতে করে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্ভোগে পড়ছেন আমাদের প্রবীণজনরা। প্রযুক্তিনির্ভর এই সমাজব্যবস্থায় দিন দিন বাড়ছে নবীন ও প্রবীণ প্রজন্মের মধ্যে সামাজিক ও মানসিক দূরত্ব। ফলে প্রবীণদের সঠিক যত্ন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা পরিবারগুলো গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করছে না।[১]

সম্প্রতি প্রতিটি দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বয়স্ক লোকের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। জাতিসংঘের এক হিসেবে দেখা যায়, ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ষাটোর্ধ্ব প্রবীণের সংখ্যা বাড়বে ২ দশমিক ৮ গুণ, সত্তরোর্ধ্ব প্রবীণের সংখ্যা বাড়বে ৩ দশমিক ৬ গুণ এবং ৮০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের প্রবীণের সংখ্যা বাড়বে ৪ দশমিক ৫ গুণ। ২০২২ সালের পপুলেশন এন্ড হাউজিং সেন্সাস মোতাবেক বাংলাদেশে বর্তমানে মোট জনসংখ্যার ৯.২৮ শতাংশ ষাটোর্ধ্ব প্রবীণ বসবাস করছেন।[২] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর তথ্য অনুযায়ী আগামী ২০২৫ সালে এই প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হবে ১০.০৯ শতাংশ (প্রায় ২ কোটি), ২০৫০ সালে তা পৌঁছাবে ১৭ শতাংশ অর্থাৎ ৪.৫ কোটি থেকে ৫.৫ কোটিতে।[৩] বিবিএস-এর পরিসংখ্যান দেখা যায় যে, বর্তমানে বাংলাদেশে শিশুদের আধিক্য থাকলেও ২০৫০ সালে শিশুদের চেয়ে প্রবীণদের সংখ্যা বেশি হবে।

প্রবীণদের এ বৃদ্ধির হার ধীরে ধীরে জাতীয় জীবনে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। ফলে প্রবীণ ব্যক্তিদের সকল ধরনের অধিকারগত প্রয়োজন মেটানোর মতো পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা ক্রমেই গভীর সংকট এবং তীব্র চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে পড়ছে।[৪] এছাড়া নির্ভরশীল এই জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান ধারার সাথে পরিবর্তিত সমাজ ও পারিবারিক কাঠামোর কারণে প্রবীণ জীবনের চিরাচরিত ঐতিহ্যগত সেবা ব্যবস্থায় যেমন বাধা সৃষ্টি হচ্ছে, তেমনি প্রবীণ জীবন নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ছে এবং এ প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। যদিও বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থ বছর থেকে শুধু দরিদ্র প্রবীণদের জন্য 'বয়স্কভাতা' কার্যক্রম গৃহীত হয়। এটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল। বর্তমানে ষাটোর্ধ্ব প্রবীণদের মাত্র এক-চতুর্থাংশ এই সুবিধা ভোগ করছেন। তবে বর্তমান বাজারদর এবং প্রবীণদের প্রয়োজনের তুলনায় ভাতার পরিমাণ মাসিক ৫০০ টাকা খুবই কম। তারপরও এই সামান্য আর্থিক সহায়তা ভাতাভোগী প্রবীণদের অনেক স্বস্তি দিয়ে থাকে।

এছাড়া বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থা প্রবীণদের কল্যাণে কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। উন্নত বিশ্বের মতো প্রবীণদের জন্য সরকারি পদক্ষেপ ও পর্যাপ্ত অবসরকালীন ভাতা, বৃদ্ধাশ্রম ইত্যাদি ব্যবস্থা বাংলাদেশে প্রচলিত নেই।[৫] বাংলাদেশের ৮০ শতাংশেরও বেশি প্রবীণদের বসবাস গ্রামে। তারা প্রায় সকলেই দরিদ্র ও কৃষি কাজের সাথে জড়িত। পেনশন, গ্রাচ্যুইটি, কল্যাণ তহবিল ইত্যাদি যেসব কর্মসূচি রয়েছে তা কেবল সরকারি ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেসরকারি কর্মচারীরা অবসর গ্রহণের পর পেয়ে থাকেন। বিপুল পরিমাণ গ্রামীণ দরিদ্র প্রবীণদের জন্য কার্যত

তেমন কোনো কর্মসূচি নেই। প্রবীণদের জন্য সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মপরিকল্পনার অভাব এবং আইনী সীমাবদ্ধতার কারণে এ সকল পদক্ষেপ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে প্রবীণদের অধিকার সুরক্ষার কোনো নীতিমালা বা আইন ছিল না। সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে কোন বিধি-বিধান ছিল না। সর্বপ্রথম প্রবীণদের উন্নয়ন, সুরক্ষা এবং সার্বিক কল্যাণে জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ প্রণীত হয়। একই সময়ে ২০১৩ সালে সন্তান কর্তৃক পিতামাতার ভরণপোষণ নিশ্চিত করার জন্য 'পিতামাতার ভরণপোষণ আইন ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়। যদিও অবসরকালীন পেনশন, বয়স্কভাতা কর্মসূচি, প্রবীণবিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ২০১৩, পিতামাতার ভরণপোষণ আইন ২০১৩, বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ পরিচালিত প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিতে অর্থায়নসহ নানা সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক ও দৈহিক সমস্যায় আক্রান্ত প্রবীণ ব্যক্তিদের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য পৃথক আইনী রক্ষাকবচ এবং সার্বিক কল্যাণার্থে সরকারি ও বেসরকারি পদক্ষেপ এখনও অপর্যাপ্ত রয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে প্রবীণদের আর্থিক, আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক কল্যাণমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ে সীমিত কার্যক্রম দ্বারা প্রবীণদের অধিকার রক্ষা করা কঠিন হবে।[৬] এছাড়াও রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনার ফলে প্রবীণদের দুর্ভোগ বেড়েই যাচ্ছে।[৭] এভাবে সকল ধরনের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে আমাদের প্রবীণ জনগোষ্ঠী। এ পরিপ্রেক্ষিতে এখানে বাংলাদেশের প্রবীণদের সামাজিক অবস্থা, সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে তাঁদের প্রতি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আইনী সুরক্ষাসহ সার্বিক কল্যাণ-বিষয়ক দিকগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থা

পারিবারিক কাঠামো ও প্রবীণ পরিচর্যা: ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। অতীতে সামাজিক ও পরিবারিকভাবে তাঁদের ভরণপোষণ ও পরিচর্যার বিষয়টি প্রাধান্য পেত। কৃষিনির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কারণে পরিবারগুলো ছিল যৌথ পরিবার এবং বয়োজ্যেষ্ঠরা পরিবারের প্রধান ছিলেন। পরিবারের সদস্যদের লেখাপড়া, বিবাহ প্রভৃতি বিষয়াদিতে যাবতীয় পারিবারিক সিদ্ধান্ত তাঁরা গ্রহণ করতেন। পারিবারিক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ব্যাপারেও পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের কর্তৃত্বমূলক ভূমিকা ছিল। সেকালের সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক বিচারে প্রবীণরা উচ্চ মর্যাদার উন্নত আসনে আসীন ছিলেন। প্রবীণ পিতামাতা ও অন্যান্য সদস্য যৌথ পরিবারে সকলের কাছ থেকে সেবা ও সহায়তা পেতেন এবং পরিবারই সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব পালন করতো। কিন্তু শিল্পায়নের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে নগরায়ণ, আধুনিকায়ন ইত্যাদি সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে। এই অর্থনৈতিক পরিবর্তন পরিবার ও সমাজব্যবস্থার উপর ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে। বেশিরভাগ পরিবারের নারী সদস্যরাও জীবিকার জন্য ঘরের বাইরে কাজ করছে। পূর্বের পারিবারিক কাঠামো বিশেষ করে সুদীর্ঘকালের যৌথ পরিবারগুলো দুর্বল হতে শুরু করে। যৌথ পরিবারের জায়গায় একক পরিবারের প্রচলন শুরু হতে থাকে।

এই পরিস্থিতিতে একক পরিবারের পারিবারিক কাঠামোয় কর্মব্যস্ততার মধ্যে প্রবীণদের প্রতি যত্ন নেওয়া বা তাঁদের দেখাশোনা করা একটি কঠিন বিষয় হয়ে পড়ছে। অধিকাংশ প্রবীণ ব্যক্তি বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শারীরিক সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। স্মরণ শক্তি হ্রাস, মানসিক অবসাদগ্রস্ততা, অনিদ্রা, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি সমস্যায় তাঁদের ভুগতে দেখা যায়। এভাবে প্রবীণ ব্যক্তিরা বার্ধক্যজনিত কারণে স্বাস্থ্যহানির ফলে দৈনন্দিন জীবনযাপনে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব সমস্যার সেবা ব্যক্তিগত থেকে শুরু করে চিকিৎসা নির্ভর শুশ্রূষা পর্যন্ত হতে পারে।[৮] কিন্তু অধিকাংশ সময় দারিদ্র্য, সম্পদহীনতা, অপ্রতুল সরকারি সহায়তার কারণে পরিবার প্রবীণ ব্যক্তিদের ভরণপোষণ ও বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে নিজ পরিবারে তাঁরা মানসিক নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হয়। HelpAge International-এর গবেষণায় প্রবীণ নিপীড়নের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা অত্যন্ত অমানবিক। ডব্লিউএইচওর মতে, বিশ্বে বর্তমানে প্রতি ৬ জনে ১ জন প্রবীণ নির্যাতনের শিকার, যাঁরা সংখ্যায় ১৪ কোটিরও বেশি। তবে প্রকৃত সংখ্যা যে এর চেয়েও অনেক বেশি, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, সব সমাজেই প্রবীণ নির্যাতনের বিষয়টি আড়াল করার প্রবণতা রয়েছে। এমনকি প্রবীণেরা নিজেরাও পরিবারের মান-মর্যাদা এবং নিজেদের সুরক্ষার কথা চিন্তা করে এ নিয়ে মুখ খুলতে চান না। তাই এ বিষয়ে প্রকৃত সত্য কোনো সমাজেই জানা যায় না বা জানানোও হয় না। বাংলাদেশের অবস্থা এ ব্যাপারে ভিন্ন কিছু নয়।[৯] তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বয়োবৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি সীমাহীন উদাসীনতা দেখাচ্ছে।[১০]

মূল্যবোধের অবক্ষয়ের এই ধারায় দেখা যাচ্ছে প্রবীণরা প্রথমত নিজ পরিবারেই তাঁদের অবস্থান ও সম্মান হারাচ্ছেন এবং ধীরে ধীরে সমাজের সকল কর্মকাণ্ড থেকে বাদ পড়ছেন। এছাড়া বহু পরিবার আছে যেখানে প্রবীণরা একাকী জীবন যাপন করছেন। আবার এক শ্রেণির প্রবীণ আছেন যাদের আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন কেউ থাকে না। ফলে সহায় সম্পদহীন, আত্মীয়-স্বজনবিহীন বয়স্ক মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়।[১১] এভাবে বিভিন্ন কারণে প্রবীণদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, আত্মতৃপ্তি, সেবাযত্ন এবং দেখাশোনা পাওয়ার অধিকার অনিশ্চয়তার দিকে যাচ্ছে।

আর্থ-সামাজিক অবস্থা: বর্তমান বাস্তবতা হচ্ছে, এ দেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ প্রবীণ দারিদ্র্যসীমার নিচে বা তার আশপাশে বসবাস করেন এবং তাঁদের কোনো নগদ টাকার উৎস তেমন নেই। সন্তানরাও এখন আর আগের মতো পিতামাতার দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক নন। সাম্প্রতিককালের এক গবেষণায় দেখা যায়, গ্রামবাংলায় ২০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের ছেলে সন্তানদের মধ্যে ৬০ শতাংশই পিতামাতার দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক।[১২] রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে সোশ্যাল সেফটি নেটওয়ার্ক (এসএসএন)-এর আওতায় ১৯৯৭-১৯৯৮ সাল থেকে শুধুমাত্র দরিদ্র প্রবীণদের জন্য 'বয়স্কভাতা' কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।[১৩] পরবর্তী সময়ে ২০০৭-২০০৮ সালে জাতীয় পরিচয়পত্রের উপর ভিত্তি করে ভাতা প্রদানের প্রক্রিয়াটিকে ডিজিটাল করা হয়। ইতোমধ্যেই সরকার ৩০ হাজার ভাতাভোগীকে ডিজিটালভাবে

ভাতা পরিশোধ করেছে এবং অন্যান্য ভাতাভোগীর তথ্য ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের (ইউডিসি) মাধ্যমে সংগ্রহ করা হচ্ছে। কিন্তু ষাটোর্ধ্ব সকল প্রবীণ জনগোষ্ঠী বয়স্ক ভাতার অর্ন্তভুক্ত হয়নি।

সরকার বয়স্কভাতা চালু করলেও প্রবীণদের বড় একটি অংশ এই সুবিধাটা পাচ্ছে না। এছাড়া পাহাড়ি অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রবীণেরা এই বয়স্কভাতা প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। আবার চা-বাগান এলাকাগুলোতে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রবীণরা কোনো প্রকার বয়স্কভাতাই পাচ্ছেন না।[১৪] অন্যদিকে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা বিশেষ করে দ্বীপগুলোতে অসংখ্য প্রবীণ বয়স্কভাতা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বয়স্ক যৌনকর্মীদের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। বয়স্ক যৌনকর্মীরা বয়সের কারণে আর উপার্জন করতে পারে না, আথচ এমতাবস্থায় তারা এই বয়স্কভাতা হতে বঞ্চিত হচ্ছে।[১৫]

দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত, নেপাল প্রভৃতি দেশে প্রবীণদের জন্য বয়স্কভাতার মতো আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রাম চালু আছে। তবে বাংলাদেশে সকল ধরনের প্রবীণদের এ ভাতার অন্তর্ভুক্ত না করায় বিশাল অংশ আওতা বহির্ভূত রয়েছে। এই 'বয়স্কভাতা' ছাড়া প্রবীণদের জন্য সরকারিভাবে কোনো আর্থিক সহায়তামূলক নতুন পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। বরং বাস্তবে বয়স্কভাতার উপকার ভোগীর তালিকা তৈরির সময় প্রায়ই যথাযথভাবে নীতিমালা অনুসরণ করা হয় না। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা মেম্বাররা নিজেদের মতো করে একটি তালিকা তৈরি করে দেন। এর ফলে তালিকায় এমন অনেকের নাম চলে আসে, যা তিনি হয়তো নিজেই জানেন না, আবার অনেকে ব্যাংকে টাকা তুলতে গিয়ে তালিকায় নাম না থাকায় টাকা পান না। আবার এমনও দেখা গেছে, যে চেক বই দিয়ে টাকা তোলেন, সেই বইয়ের পাতা শেষ হয়ে যাওয়ার পর নতুন বই সংগ্রহ করতে হয়রানি হতে হচ্ছে।[১৬]

অন্যদিকে, সরকারি চাকরিজীবী প্রবীণদের অবসরকালীন পেনশনই সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত একটি কল্যাণধর্মী ব্যবস্থা। ১৯২৫ সালে প্রবর্তিত সরকারি কর্মচারীদের অবসরকালীন পেনশন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তবে বাংলাদেশের ৮০ শতাংশেরও বেশি প্রবীণের বসবাস গ্রামীণ এলাকায়। তারা প্রায় সকলেই দরিদ্র ও কৃষি কাজের সাথে জড়িত। পেনশন, গ্রাচ্যুইটি, কল্যাণ তহবিল ইত্যাদি যেসব কর্মসূচি তা কেবল সরকারি ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেসরকারি কর্মচারীরা অবসর গ্রহণের পর পেয়ে থাকেন। বিপুল পরিমাণ গ্রামীণ দরিদ্র প্রবীণের জন্য কার্যত তেমন কোনো কর্মসূচি নেই।[১৭] প্রবীণ বয়সে কর্মক্ষমতা লোপ পায় বিধায় চাকরিজীবীরা অবসর গ্রহণ করেন। ফলে এ সকল প্রবীণের উপার্জনের কোন পথই খোলা থাকে না। অধিকাংশ প্রবীণের মৌলিক চাহিদা পূরণের সামর্থ্য থাকে না। তাই পারিবারিকভাবে এবং আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে সামান্য পরিমাণে আর্থিক সহযোগিতা লাভ করে তারা জীবন নির্বাহ করে থাকেন।[১৮]

চিকিৎসা, স্বাস্থ্যসেবা ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থা: সামাজিকভাবে শহরের প্রবীণদের থেকে গ্রামীণ, দরিদ্র, নিরক্ষর, কৃষিজীবী প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাগত এবং অর্থনৈতিক তথা মৌলিক মানবিক চাহিদা সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রবীণ ব্যক্তিদের মৌলিক অধিকার

বাস্তবায়নের জন্য আমাদের দেশে পৃথক কোন সামাজিক ব্যবস্থাপনাও নেই। এ কারণে আমাদের দেশের প্রবীণদের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণমূলক কর্মসূচির অভাব রয়েছে।[১৯]

বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান এই জনগোষ্ঠী আগামী সময়ে দেশের আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর কল্যাণ এবং অধিকারকে অবহেলা করে এবং প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে পেছনে রেখে দেশ উন্নতি এবং অগ্রগতির পথে বেশি দূর এগোতে পারবে না। প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবার অধিকার বিষয়েও বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। এছাড়া সত্তরোর্ধ্ব বা তদূর্ধ্ব বয়সের প্রবীণদের মধ্যে অনেকেই অন্যের সাহায্য ছাড়া খাওয়া, পরা, গোসল করা, কাপড় পরা, বিছানা করা ইত্যাদি দৈনন্দিন কোনো কাজই করতে পারেন না। প্রবীণদের জন্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবাদানকারী যে সকল প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার বেশির ভাগই রাজধানীকেন্দ্রিক এবং মূলত শহরে বসবাসরত প্রবীণদের জন্য।[২০] এসব প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিকভিত্তিতে পরিচালিত হওয়ায় নানা কারণে দরিদ্র পরিবারগুলো এসব সেবা নিতে চান না বা পারেন না। সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত তৃণমূল পর্যায়ের প্রবীণদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবার কোন ব্যবস্থা গ্রহণের তৎপরতা দেখা যায়নি। এছাড়া দেশের বেশিরভাগ হাসপাতালেও চিকিৎসা গ্রহণে প্রবীণদের জন্য পৃথক বা বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই। কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ এ ধরনের সেবাদানের পদক্ষেপ নিয়েছে, তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল।[২১] আমাদের পরিবার, সমাজ ও নীতি-নির্ধারকগণ এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এখনও যথেষ্ট সচেতন নয়।[২২]

জাপানিরা প্রবীণদের 'জীবন্ত শিল্প' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। বিশ্বের বহু দেশ প্রবীণদেরকে চিকিৎসাসহ নিত্য প্রয়োজনীয় এবং জরুরি সার্ভিস সবকিছুতেই বিশেষ ছাড় ও সামাজিকভাবে মর্যাদা দিয়ে থাকে।[২৩] অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশে প্রবীণদের প্রধান সমস্যা হলো অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, অপ্রতুল স্বাস্থ্যসেবা এবং আবাসন ব্যবস্থার অনিশ্চয়তা।[২৪] এর সাথে রয়েছে রাষ্ট্রীয় বরাদ্দকৃত বাজেট এবং সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির অভাব। সমাজের বিপুল এ জনগোষ্ঠীকে কোনভাবেই উপেক্ষা করার উপায় নেই। কিন্তু আমাদের দেশে প্রবীণদের অধিকার, উন্নয়ন এবং কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য পৃথক কোনো মন্ত্রণালয় বা শাখা অফিস নেই।[২৫] এমনকি দৈনন্দিন জীবনের আধুনিক প্রযুক্তি ও কলাকৌশল মোটেও প্রবীণবান্ধব নয়। প্রবীণদের বার্ধক্যজনিত, স্বাস্থ্যগত জটিলতা ও অপর্যাপ্ত চিকিৎসাসেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য বড় অন্তরায়। এছাড়া আমাদের দেশে সরকারি উদ্যোগে প্রবীণদের জন্য বিশেষ নার্সিং হোম, ডে কেয়ার সেন্টার, ওল্ড হোম ইত্যাদিও পর্যাপ্ত নয়।

বাংলাদেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার অনুমোদিত একটি স্বেচ্ছাসেবী বড় সংগঠন আছে, যার নাম হচ্ছে 'বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান'। এটি মূলত প্রবীণদের কল্যাণে প্রথম প্রতিষ্ঠান যা সুদূরপ্রসারী চিন্তা-ভাবনা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে স্থাপিত। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে দুটি ভবন রয়েছে যেখানে প্রবীণদের আবাসন সুবিধাসহ কিছু চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান ৯০টি শাখার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবীণদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে এবং

জাতীয়ভাবে প্রবীণদের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ, প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পরামর্শ, সহযোগিতা ও তথ্য দিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ এবং পিতামাতার ভরণপোষণ আইন ২০১৩ প্রণয়নের সাথে এ সংস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।[২৬]

এছাড়া বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কল্যাণ সমিতি_১৯৭৬ সাল থেকে সরকারি চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। ১৯৮১ সালে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের প্রবীণকালীন সময়ে কল্যাণের জন্য বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার কল্যাণ সমিতি স্থাপিত হয়, যা পুলিশ বাহিনীর অবসরপ্রাপ্তদের কল্যাণে নিয়োজিত রয়েছে। সেনাকল্যাণ সংস্থাটি বাংলাদেশে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্য ও তাঁদের নির্ভরশীল পোষ্যদের কল্যাণে নিয়োজিত। এছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ হচ্ছে প্রবীণদের কল্যাণে বাংলাদেশ মহিলা স্বাস্থ্য সংঘ, ডিফেন্স পার্সোনাল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার, বাংলাদেশ শিক্ষা বোর্ড অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, রোটারী ক্লাব ইত্যাদি।[২৭] বেসরকারি পর্যায়ে ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত গাজীপুরের বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্র বয়স্ক ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা ও বিনোদনসহ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। এখানে প্রবীণদের জন্য আমৃত্যু বিনা খরচে আবাসন, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন প্রভৃতির ব্যবস্থা রয়েছে। প্রবীণদের উপযোগী রাস্তাঘাট, অফিস-আদালত, যানবাহন, বিনোদন কেন্দ্র নেই আমাদের দেশে।[২৮] এমনকি প্রবীণ সমস্যা নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কোন চিন্তা-ভাবনা বা কার্যক্রম এখনও গুরুত্বসহকারে গ্রহণ শুরু হয়নি। বৃদ্ধ এবং প্রবীণদের বিষয়ে বাংলাদেশের গণমাধ্যম এবং শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্যোগ অত্যন্ত হতাশাজনক।

আমাদের দেশে কিছু এনজিও আছে যারা শুধু প্রবীণদের পুষ্টিবিষয়ক তথ্য ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকে।[২৯] বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কিছু আশ্রয় কেন্দ্র থাকলেও তা অত্যন্ত সীমিত ও ব্যয়বহুল। দেশের অধিকাংশ প্রবীণ ব্যক্তি বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ও পরিবারবিহীন প্রবীণদের জন্য আবাসস্থল না থাকায় তারা অসহায় জীবন যাপন করেন। প্রবীণদের আশ্রয় কেন্দ্রগুলো শহরকেন্দ্রিক হওয়ায় গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র প্রবীণ জনগোষ্ঠী আশ্রয়বিহীনভাবে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। আমাদের দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিবন্ধী প্রবীণদের জন্য এখন পর্যন্ত কোনো আশ্রয় কেন্দ্র নেই।[৩০] বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন সংঘ ও দেশের কর্মকণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা। জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা UNFPA, International Federation on Ageing, HelpAge International ইত্যাদি আর্ন্তজাতিক সংস্থা প্রবীণদের জন্যে কাজ করে যাচ্ছে।[৩১]

প্রবীণদের সার্বিক বিষয় নিয়ে কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হয়, সেগুলো হল প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে 'প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা', বয়স্ক ও শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্রের 'বপুকপত্রিকা', অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির 'অবসর জীবন' পত্রিকা ইত্যাদি। এছাড়াও বর্তমান সময়ে প্রবীণদের নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন ধরনের লেখা প্রকাশিত হচ্ছে যা শিক্ষিত সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারকদের প্রবীণদের বিষয়ে আরো সচেতন ও যুগোপযুগী কর্মসূচি গ্রহণে জোর তাগিদ প্রদান করছে।[৩২] তবে বার্ধ্যক্য বা প্রবীণ বিষয়টি দেশের সাধারণ এবং পেশাগত শিক্ষা পাঠক্রমে না থাকায় পরিবারে, স্বাস্থকেন্দ্রে, সরকারি ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত ব্যক্তি,

গণমাধ্যম ও গণসেবা ব্যবস্থা এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের পর্যাপ্ত পরিমাণে বার্ধক্য মোকাবেলা ও টেকসই প্রবীণ কল্যাণের লক্ষ্যে তেমন কোনো কার্যক্রম নেই। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটি বলা যায় যে, দ্রুত বর্ধনশীল এই প্রবীণদের সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার আদায়ের জন্যে বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত সরকারি পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। এভাবে সকল ধরনের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন প্রবীণ জনগোষ্ঠী।

প্রবীণ সুরক্ষায় আইনী কাঠামো

আর্ন্তজাতিক পরিপ্রেক্ষিত: ১৯৭৪ সালে সর্বপ্রথম বুখারেস্টে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জনসংখ্যা সম্মেলনে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সমস্যার ব্যাপকতা ও গভীরতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এতে স্বীকার করা হয় যে, বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যার দুটো দিক তাৎপর্যপূর্ণ এবং তা হলো জনবিস্ফোরণ এবং বার্ধক্য, যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরপর ১৯৮২ সালে ভিয়েনাতে অনুষ্ঠিত প্রবীণবিষয়ক প্রথম বিশ্ব সম্মেলনে এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনা (The Vienna International Plan of Action on Ageing 1982) গৃহীত হয়।[৩৩] এটি ছিল প্রবীণ-বিষয়ক প্রথম আন্তর্জাতিক উদ্যোগ যা প্রবীণদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ করে পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণ এবং স্বাস্থ্যসহ অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিষয়ে সুপারিশ করে।

পরবর্তীকালে ওআইসির উদ্যোগে ১৯৯০ সালের ৩১শে জুলাই থেকে ৫ই আগস্ট পর্যন্ত ৬ দিন ব্যাপী ওআইসিভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলন মিসরের রাজধানী কায়রোতে অনুষ্ঠিত হয়।[৩৪] সম্মেলনের সর্বশেষ দিন ৫ই আগস্ট 'The Cairo Declaration of Human Rights in Islam' সর্বসম্মত মতের ভিত্তিতে অনুমোদন করা হয়। এই ঘোষণাপত্রের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে সন্তান ও পিতামাতার অধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।[৩৫] জাতিসংঘ বার্ধক্যকে মানবজীবনের প্রধানতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করে এ সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯১ সালকে 'আন্তর্জাতিক প্রবীণ বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করেছিল। ১৯৯১ সাল থেকে জাতিসংঘ প্রতি বছর সকল দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় এবং গুরুত্বের সাথে ১লা অক্টোবর 'আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস' হিসেবে উদযাপনের জন্য নির্ধারণ করেছে। এরপর ২০০২ সালে ১৫৯টি দেশের প্রতিনিধিগণের অংশগ্রহণে স্পেনের মাদ্রিদে প্রবীণবিষয়ক দ্বিতীয় বিশ্ব সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা এবং রাজনৈতিক ঘোষণা গৃহীত হয়, যা 'মাদ্রিদ আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনা'[৩৬] হিসেবে পরিচিত। এর মধ্যে উন্নয়নের সকল পর্যায়ে প্রবীণদের জড়িত করা, তাঁদের জন্যে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও কল্যাণমূলক আয়োজন সম্প্রসারণ করা এবং কর্মক্ষম ও সহযোগিতামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এই মাদ্রিদ পরিকল্পনায় সরকার, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও সুশীলসমাজ কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য তিনটি প্রধান অগ্রাধিকারমূলক নির্দেশক ও একগুচ্ছ কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়। ভবিষ্যতে প্রবীণ-বিষয়ক যেসকল সমস্যা ও সম্ভাবনা তৈরি হবে সেগুলোকে মোকাবেলা করার জন্য আন্তর্জাতিক কিছু কর্মসূচি নির্ধারণের মাধ্যমে নতুন ভিত্তি এভাবে তৈরি করা হয়।

নাগরিক হিসেবে প্রবীণ ব্যক্তিগণ পূর্ণ অধিকার, সার্বিক নিরাপত্তা ও মর্যাদার সাথে যাতে জীবনযাপন করতে পারেন সেজন্য মাদ্রিদ বিশ্ব সম্মেলনের সদস্য রাষ্ট্রগুলো সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট ঘোষণা উপস্থাপন করে। এতে প্রবীণ ব্যক্তিদের শেষ জীবনে সচ্ছলতা, আত্মপরিতৃপ্তি ও ব্যক্তিগত উন্নয়নের সুযোগের সংস্থান করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। একই সাথে নিরাপদ বার্ধক্য অর্জন অর্থাৎ প্রবীণ বয়সে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সকল ধরনের প্রতিরোধ ও পুনর্বাসনমূলক স্বাস্থ্যসেবাসহ প্রবীণদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, সহায়তা ও সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার ভোগ করার বিধান রাখা হয়েছে। পাশাপাশি প্রবীণ ব্যক্তিগণ যাতে পূর্ণ অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে সে-ব্যাপারে সকল বৈষম্য দূর করে তাঁদের জন্য সুস্থ জীবনের নিশ্চয়তার অঙ্গীকার করা হয়। এছাড়া বার্ধক্যজনিত, ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং স্বাস্থ্যগত জটিলতার মোকাবেলা করতে, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা ও দক্ষতার সমন্বয় করে প্রযুক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর ওপর জোর দেয়া হয়।[৩৭]

মাদ্রিদ আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনার আলোকে 'জেনেভা আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক অন এইজিং' (জিনা) প্রবীণদের জীবনের সম্ভাবনা, সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জের ওপর গুরুত্বারোপ করে অনেক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিসমৃদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে যা বর্তমান বিশ্বে অনেক দেশ এবং সংগঠন অনুসরণ করছে। প্রবীণ জীবনকে মর্যাদাপূর্ণ, কর্মক্ষম এবং আরও অর্থবহ করার জন্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা ও কৌশল গ্রহণ করছে। দীর্ঘ জীবনের পথে ক্লান্তি বা অবসাদ যেন জীবনকে উৎকণ্ঠায় ভরিয়ে না তোলে, পরিবার-পরিজনের দ্বারা যেন অবজ্ঞার পরিবেশ রচিত না হয়, সে-লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী প্রবীণদের প্রতি সম্মান এবং প্রবীণ জীবনকে সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস চলছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে প্রবীণ প্রসঙ্গ

১৯৭২ সালের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান-এ সরাসরি প্রবীণদের অধিকারের বিষয়টি উল্লেখ না থাকলেও ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে দেশের সকল অভাবগ্রস্ত শ্রেণিকে সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার দেয়া রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।[৩৮] এ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– 'রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাতে নাগরিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারসমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়। সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত বা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার'।

সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে প্রবীণ ব্যক্তিগণ বার্ধক্যজনিত কারণে অভাবগ্রস্ততার শিকার হয়ে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকারী হলেও এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ আদালত কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য নয়। তাই বার্ধক্যজনিত পরিস্থিতিতে নাগরিকের সামাজিক নিরাপত্তা

প্রসঙ্গে প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির মাধ্যমে তাঁদের অধিকার ভোগ করতে পারে না। কারণ এগুলো মূলত নাগরিক অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনার ভিত্তিস্বরূপ এবং আমাদের দেশে আইনগতভাবে এ সকল নীতিমালা বাস্তবায়ন করা যায় না।[৩৯] বরং প্রবীণ ব্যক্তি নাগরিক হিসেবে মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারে। এটি তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার এবং আদালতে প্রয়োগযোগ্য।[৪০]

উল্লেখ্য, এশিয়ার অন্য দেশসমূহ প্রবীণদের সামাজিক, আর্থিক ও স্বাস্থ্যসেবা সুরক্ষায় বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে। যেমন, ভারত সরকার আদালতের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং মৌলিক অধিকারের সমন্বয়ে দেশের প্রবীণ নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য উন্নত কৌশল গ্রহণ করেছে। ভারতের সুপ্রিম কোর্টের আদেশ মোতাবেক প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ বেসরকারি সংস্থা– যেমন: ব্যাংক, কোম্পানি, হেলথ কেয়ার সেন্টার এবং যেকোন সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষার্থে মৌলিক অধিকারসমূহ প্রয়োগ করতে পারবে।[৪১] বাংলাদেশের উচ্চ আদালত প্রবীণদের অধিকার সুরক্ষায় রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালা ও মৌলিক অধিকার মোতাবেক এ ধরনের কোনো নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে না।

বাংলাদেশে সাংবিধানিক বিধান ছাড়া ২০১৩ সাল পর্যন্ত দেশের প্রবীণদের অধিকার-বিষয়ক কোনো আইন বা নীতিমালা ছিল না। ২০১১ সালের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালায় সকল নাগরিকের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের বিধান থাকলেও প্রবীণ নাগরিকের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিশেষ কোনো বিধান সন্নিবেশিত নেই। আমাদের দেশে প্রবীণদের জন্য পৃথক কোনো স্বাস্থ্যনীতি বা স্বাস্থ্যসেবা-বিষয়ক নীতিমালা আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আশি বা তদূর্ধ্ব বয়সের প্রবীণদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কোনো বিধান স্বাস্থ্য নীতিমালায় নেই। ফলে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য নীতিমালা ও মনিটরিং ব্যবস্থার অভাবের জন্য সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বার্ধক্য ও জরাবিজ্ঞানের সমস্যাসমূহ যথাযথভাবে গুরুত্ব দেয়া হয় না। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বেশিরভাগ দরিদ্র প্রবীণ নিজেদের চিকিৎসা খরচের ব্যয় বহন করতে পারে না।[৪২]

জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩: বাংলাদেশে প্রবীণদের অধিকার, উন্নয়ন এবং সার্বিক কল্যাণে দীর্ঘমেয়াদী এবং স্থায়ী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০১৩ সালে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মর্যাদাপূর্ণ, দারিদ্র্যমুক্ত, কর্মময়, স্বাস্থ্য ও নিরাপদ সামাজিক জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়। এই নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতিমালাসমূহে (স্বাস্থ্যনীতি, নারী উন্নয়ন নীতি, গৃহায়ণ, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি নীতিমালা) প্রবীণ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করে যথাযথ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা এবং বাংলাদেশের প্রবীণ ব্যক্তিদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবদানের স্বীকৃতিসহ সামগ্রিক উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।[৪৩] এছাড়া জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে প্রবীণদের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে বিদ্যমান সরকারি এবং বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কাঠামোতে প্রবীণদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সেবা প্রদানের নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা এই নীতির উদ্দেশ্য। ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ ও প্রচলিত যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার কারণে প্রবীণদের সার্বিক সুরক্ষায় আইন প্রণয়নের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথা

দুর্যোগপূর্ব সতর্কীকরণ, দুর্যোগকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা, আশ্রয়, ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ এবং পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচিতে প্রবীণদের অগ্রাধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে এই নীতিমালায়। পাশাপাশি প্রবীণ নারী এবং প্রতিবন্ধী প্রবীণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সকল বৈষম্য ও অবহেলা দূর করে বিশেষ সহায়তা প্রদান করা এবং আন্তঃপ্রজন্ম যোগাযোগ ও সংহতি গঠন ও সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করার বিষয়ে বলা হয়েছে। এই নীতি মোতাবেক ভরণপোষণ ছাড়াও প্রবীণ ব্যক্তিগণ সামাজিক, আবাসিক, অর্থনৈতিক, চিকিৎসাসেবা, সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। তবে এ নীতিমালা অনুযায়ী দেশে প্রবীণ অধিকার সুরক্ষায় এখনও কোনো প্রবীণবিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়নি। অধিকাংশ প্রবীণ ব্যক্তি এই নীতিমালা সম্পর্কে সচেতন নয় এবং বাস্তবে তৃণমূল পর্যায়ে হাসপাতাল, বিমানবন্দর, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন সেবা ও পরিবহণ সুবিধা পাচ্ছে না।[৪৪]

প্রবীণদের সকল ধরনের সামাজিক বৈষম্য ও অবহেলা দূরীকরণের জন্য ভারতে একটি একক ও সম্পূর্ণ সামাজিক এবং আইনী কাঠামো রয়েছে। মাদ্রিদ পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে ভারতে বয়স্ক নাগরিকদের সমাজকল্যাণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০০৬ সালে প্রবীণ ব্যক্তির আইন (The Older Person Act, 2006) প্রণয়ন করা হয়েছে।[৪৫] একইভাবে নেপালে ২০০৬ সালে সিনিয়র নাগরিক আইন (The Senior Citizens Act, 2006)-এর মাধ্যমে প্রবীণ নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষা করা হচ্ছে।[৪৬] এছাড়া ২০১০ সালে ভিয়েতনাম প্রবীণ ব্যক্তিদের কর্মজীবন নিশ্চিত করতে প্রবীণ-বিষয়ক আইন (Law on the Elderly, 2010) প্রণয়ন করেছে।[৪৭] এভাবে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে প্রবীণদের সামাজিক নিরাপত্তা, সেবা ও কল্যাণসংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের আইন ও নীতিমালা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে ভারত ও নেপালের মতো প্রবীণদের স্বার্থে-সংশ্লিষ্ট আইন না থাকলেও ২০১৩ সালে পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য আইনের কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৪৮]

পিতামাতার ভরণপোষণ আইন ২০১৩

সন্তান কর্তৃক পিতামাতার ভরণপোষণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'পিতামাতার ভরণপোষণ আইন ২০১৩' প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান সমাজের নৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে পারিবারিক বন্ধন ও দায়িত্ববোধের শিথিলতা লক্ষ করা যায়। পিতামাতাসহ সমাজের প্রবীণশ্রেণির প্রতি দায়িত্ব পালন ও তাঁদের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। প্রায় প্রতিদিন দৈনিক পত্রিকায় পিতামাতার প্রতি অসদাচরণের সংবাদ পরিলক্ষিত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে আইনটির মাধ্যমে সন্তান দ্বারা পিতামাতার ভরণপোষণের দায়িত্ব নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভরণপোষণের অধিকার আদায়ের জন্য আইনী সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

পিতামাতার ভরণপোষণ আইনের ২(ক) ধারাতে 'পিতা' বলতে সন্তানের জনককে বুঝানো হয়েছে। 'ভরণপোষণ' বলতে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং সঙ্গ প্রদানকে বুঝানো হয়েছে। সন্তানের 'মাতা' বলতে সন্তানের গর্ভধারিণী এবং 'সন্তান' বলতে পিতার ঔরসে ও মাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণকারী সক্ষম ও সামর্থ্যবান পুত্র বা কন্যাকে বুঝানো হয়েছে।[৪৯] এ

আইনের ৩-নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক সন্তানকে তার পিতামাতার ভরণপোষণ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন পিতামাতার একাধিক সন্তান থাকলে তাঁরা আলোচনার মাধ্যমে ভরণপোষণের দায়িত্ব নিশ্চিত করবেন এবং তা নিশ্চিত করার জন্য সন্তানদেরকে তাঁদের পিতামাতার সাথে একসঙ্গে এবং এক স্থানে বসবাস নিশ্চিত করতে হবে।[৫০] এছাড়া ৩-নম্বর ধারার (৪) এ বলা হয়েছে, পিতামাতাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বৃদ্ধ নিবাসে বসবাস করতে বাধ্য করা যাবে না কিংবা আলাদাভাবে বসবাস করতে বাধ্য করা যাবে না। ধারা ৩-এর (৫) উপধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক সন্তান তার পিতামাতার স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখবে এবং প্রয়োজনে চিকিৎসাসেবা ও পরিচর্যা করবে। একই ধারাবাহিকতায় ৩-নম্বর ধারার (৬) উপধারায় বলা হয়েছে, পিতা বা মাতা কিংবা উভয়ে সন্তান থেকে পৃথক বসবাস করলে সেক্ষেত্রে তাঁদের সাথে নিয়মিত সাক্ষাৎ করতে হবে। আইনের ৩-নম্বর ধারার (৭) উপধারায় বলা হয়েছে যে, পিতামাতা সন্তানদের সাথে বসবাস না করে পৃথকভাবে বসবাস করলে সেক্ষেত্রে প্রত্যেক সন্তান তার মাসিক বা বাৎসরিক আয় থেকে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ তাঁর পিতা বা মাতা বা ক্ষেত্রবিশেষে উভয়কে নিয়মিতভাবে প্রদান করবে। এমনকি পিতামাতা ছাড়াও দাদাদাদি, নানানানির ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হবে। আইনটিতে কোনো সন্তানকে ৩ ও ৪-নম্বর ধারা মোতাবেক দায়িত্ব লঙ্ঘনের অপরাধে দণ্ডিত করার সুযোগ রাখা হয়েছে। যদি কখনও কোনো কারণে পুত্রের স্ত্রী ও কন্যার স্বামী বা অন্য কোনো আত্মীয় দ্বারা পিতামাতার দেখাশোনার দায়িত্বের ব্যাপারে অসহযোগিতা করা হয় তবে তারা একই রকম শাস্তি প্রাপ্ত হবে। এমনকি পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত সন্তানরা পিতামাতাকে কোনো আশ্রয় কেন্দ্রে বা অন্য কোনো স্থানে পৃথকভাবে রাখতে পারবে না।

২০১৩ সালের পিতামাতার ভরণপোষণ আইনটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই আইনটিতে কিছু বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। যেমন- পিতামাতার প্রতি সদাচরণ, শ্রদ্ধাবোধ, কর্কশ ভাষায় কথা না বলা, কষ্ট না দেয়া, তাঁদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা, তাঁদের আনুগত্য স্বীকার করা ইত্যাদি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এছাড়া আইনটি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে পিতা বা মাতার সর্বনিম্ন বয়সসীমা, উপার্জনের উৎস বা আর্থিক সক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হয়নি। 'সন্তান'-এর ক্ষেত্রেও শুধু 'সক্ষম ও সামর্থ্যবান' সন্তানকেই বুঝানো হয়েছে। আইনে 'সক্ষম ও সামর্থ্যবান' বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। আমাদের সমাজে শিক্ষিত অনেক বেকার রয়েছেন, যারা যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থান পাচ্ছেন না। এ ছাড়া পিতামাতার সন্তান যদি বেকার থাকে অথবা যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি না পায়, তাহলে এ আইনের আলোকে সে কীভাবে দায়িত্ব পালন করবে তার বিকল্প কোনো দিক নির্দেশনা দেয়া হয়নি। 'সক্ষম' ও 'সামর্থ্যবান'-এর বয়স নির্ধারিত নেই এবং সংজ্ঞার্থও দেওয়া হয়নি। এমনকি 'সঙ্গ প্রদান' বলতে কী বুঝানো হচ্ছে তার ব্যাখ্যা আইনটিতে উল্লেখ করা হয়নি। রক্তের সম্পর্ক ছাড়া দত্তক ও সৎ পিতামাতার দায়িত্বের বিষয়ে কোনো বিধান নেই। তাছাড়া, পিতামাতা যদি সন্তানের প্রতি নির্যাতনপ্রবণ হয় বা সন্তানকে শৈশবেই পরিত্যক্ত করে থাকে, সেক্ষেত্রে ভরণপোষণের দায়িত্বে কোনো ব্যতিক্রম রাখা হয়নি।

আইনটিতে একই সঙ্গে সাধারণভাবে ধরে নিচ্ছে, পিতামাতা সব সময়ই একত্রে বসবাস করছেন। অথচ পিতামাতার যদি বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে থাকে বা তারা যদি পৃথক বসবাস করেন, তখন সন্তানরা কাকে ভরণপোষণ দেবেন বা কার সঙ্গে বসবাস করবেন ও পরিচর্যা করবেন এই বিষয়গুলো অস্পষ্ট রয়ে গেছে।

আইনে ছেলে ও মেয়ে সন্তানের উপর সমান দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বাস্তবে বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় আর্থিক সংগতি ও দায়-দায়িত্ব পুরুষ ও নারীর উপর সমানভাবে প্রযোজ্য হতে দেখা যায় না। বরং আর্থিক বিষয়ে সামর্থ্য ও দায়িত্বসমূহ পুত্র বা পুরুষগণ বেশি পালন করে থাকেন। কন্যা বা নারীগণ বিয়ের পরবর্তী জীবনে স্বামীর সংসারের দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অনেক সময় নারীদের কোন নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা থাকে না এবং আর্থিক বিষয়ে তাঁরা স্বামীদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এ সকল অবস্থায় পুত্র ও কন্যা উভয়ের আর্থিক সক্ষমতা সমান না হওয়া সত্ত্বেও সমান দায়িত্ব পালন কতটুকু সম্ভব তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, যা এই আইনে সুস্পষ্ট নয়।

এ সকল বিভিন্ন কারণে আলোচ্য আইনটি গ্রহণের পর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে আইনটি বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে অবহেলা ও নিপীড়ন থেকে প্রবীণ পিতামাতারা যথাযথভাবে সুরক্ষা পাচ্ছেন না। অথচ ভারতে ২০০৭ সালে Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 অনুযায়ী নিজ পিতামাতা ছাড়াও দত্তক ও সৎ পিতামাতা সন্তান কর্তৃক ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী।[৫১]

সন্তান ও পিতামাতার সম্পর্ক খুবই আন্তরিক ও গভীর। ধর্মীয় দিক থেকে পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার ও সদাচরণের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আইনী প্রতিকারের মাধ্যমে শ্রদ্ধাবোধ, মর্যাদা ও সদাচরণ আদায় করার দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। মূলত পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক এমন নয় যে, পিতামাতা তার ভরণপোষণ ও সদাচরণ প্রাপ্তি মামলা বা অভিযোগ দাখিল করে তা সন্তানের নিকট থেকে আদায় করবেন। বিষয়টি যতটুকু না আইনী তার চেয়ে অনেক বেশি নৈতিক ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত।

বাংলাদেশে প্রবীণ অধিকার সুরক্ষায় ২০১৩ সালে জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ও পিতামাতার ভরণপোষণ আইন গৃহীত হলেও বাস্তবে প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ তেমন কোনো সুফল ভোগ করতে পারছেন না। ইতঃপূর্বে এদেশে এমন ধরনের কোনো আইন ছিল না। সমাজের সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষার অনুশীলন ও চর্চা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধাবোধ, নৈতিক মূল্যবোধসহ উন্নত চরিত্র বিরাজমান থাকলে আইনের মাধ্যমে দায়িত্ব পালনের বাধ্যবাধকতার প্রয়োজন হতো না। আইনে পিতামাতাকে ভরণপোষণ না করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামাজিক মূল্যবোধের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আইনটিকে মানবিক মনে হলেও আইন মোতাবেক ফৌজদারী মামলা করে সন্তানকে শাস্তি দেয়ার মতো পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি আমাদের দেশের নেই। আইনের বিষয় সুনির্দিষ্ট এবং প্রয়োগযোগ্য হতে হবে নতুবা আইন শুধু কাগজে কলমে রয়ে যাবে। ফলে সাধারণ জনগণের আইনের প্রতি অনাস্থা তৈরি হবে।[৫২]

পিতামাতার ভরণপোষণ বিধিমালা (খসড়া) ২০২০

২০১৩ সালের পিতামাতার ভরণপোষণ আইনটি কার্যকর করার জন্য ২০২০ সালে পিতামাতার ভরণপোষণ বিধিমালা করা হয়েছে। বিধিমালাটিতে প্রচলিত পারিবারিক নৈতিকতা এবং মূল্যবোধকে আইনের মাধ্যমে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ২০১৩ সালের আইনটিতে যেসকল অস্পষ্টতা ছিল তা বিধিমালায় পরিষ্কার করা হয়েছে। বিধিমালাটিতে বলা হয়েছে, প্রত্যেক সন্তানকে পিতামাতার ভরণপোষণ দিতে হবে এবং ভরণপোষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে তাকে পিতামাতার সঙ্গে একত্রে বসবাস করতে হবে। আইনে 'ভরণপোষণ' বলতে বুঝানো হয়েছে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বসবাসের সুবিধা এবং সঙ্গ প্রদান। অর্থাৎ এই বিধিতে 'ভরণপোষণ' বলতে কোন অর্থের পরিমাণকে বুঝানো হচ্ছে না বরং পিতামাতার প্রতি সন্তানের বিবিধ দায়িত্ব পালন এবং সেবা প্রদানকেই বুঝানো হয়েছে।

এই বিধিমালায় বলা হয়েছে প্রত্যেক সন্তানকে পিতামাতার স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখতে হবে, চিকিৎসাসেবা ও অন্যান্য পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে হবে। এমনকি সন্তান পিতামাতার সাথে একত্রে না থাকলে নিয়মিত সাক্ষাৎ করতে হবে। এভাবে ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হলে পিতামাতা সন্তানের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করতে পারবেন। অর্থাৎ এটি একটি দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এই বিধিতে 'সক্ষম ও সামর্থ্যবান' সন্তানের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে, পরিবারের ব্যয় নির্বাহে সক্ষম সকল ব্যক্তি। অর্থাৎ পরিবারের উপার্জনকারী সন্তানের বয়স ১৮ বছরের নিচে হলেও এই বিধিমালার আওতায় তার ওপর ভরণপোষণের দায়িত্ব বর্তাবে। উল্লেখ্য যে, বিধিমালাটিতে দেশের প্রবীণ ব্যক্তিদের কল্যাণে আইনের বাস্তবায়ন, তদারকি ও মূল্যায়নে বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি গঠন করছে। এছাড়া ২০২০ সালের খসড়া বিধিমালাটিতে পৃথক বসবাসকারী বা বিবাহবিচ্ছেদের শিকার পিতামাতার ক্ষেত্রে সন্তানরা কাকে ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করবে বা কার সাথে বসবাস করবে ও পরিচর্যা করবে এই বিষয়গুলো অস্পষ্ট রয়ে গেছে। এমনকি পিতামাতা যদি সন্তানকে শৈশবে পরিত্যাগ করে থাকে সেক্ষেত্রে ভরণপোষণের দায়িত্বের কোনো ব্যতিক্রম রাখা হয়নি। এভাবে বর্তমান আইন প্রবীণদের অধিকার সুরক্ষায় সহায়তা করতে পারছে না। ভরণপোষণ ছাড়াও প্রবীণ ব্যক্তি সামাজিক, আবাসিক, অর্থনৈতিক, চিকিৎসাসেবা, সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারী।

প্রবীণ সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

বাংলাদেশে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কোনো পর্যায়েই প্রবীণের পথে যাচ্ছে এমন ব্যক্তি বার্ধক্য মোকাবেলায় প্রস্তুত বা সচেতন নন। তাই এখন প্রবীণ জনসমষ্টির জন্য প্রয়োজন নতুন চিন্তাভাবনা ও ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা। এজন্য নিম্নবর্ণিত কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যাতে একজন বয়স্ক ব্যক্তি জীবনের কল্যাণকর প্রয়োজনীয় অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

১. ২০১৪ সালে বাংলাদেশের প্রবীণদের সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এখন প্রবীণদের স্বতন্ত্র পরিচিতি বা 'সিনিয়র সিটিজেন কার্ড' এবং প্রবীণ-বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন করা প্রয়োজন যাতে এই কার্ডের মাধ্যমে প্রবীণ নাগরিকরা সুন্দর ও সম্মানজনক জীবন

যাপনের জন্য বৈধভাবে সরকার প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেন।[৫৩] পাশাপাশি দেশের সকল প্রবীণ নাগরিকের জন্য কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালের জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য বাজেটসহ কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া দরকার। একই সাথে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর অধিকার, চাহিদা, প্রাপ্য নাগরিক হিস্যা, সমাজের সকলের দায়িত্ব, প্রচলিত প্রবীণসেবা কর্মসূচি ইত্যাদি বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যমের মাধ্যমে প্রচারণা শুরু করা প্রয়োজন।[৫৪]

২. দেশের প্রবীণকল্যাণ নিশ্চিতকল্পে বয়স্কভাতার পরিধি এবং পরিমাণ দুটোই বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সকল প্রবীণকে বয়স্কভাতার আওতায় আনা, ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি এবং নিয়মিতভাবে বণ্টন করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এক্ষত্রে দরিদ্র প্রবীণদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। বয়স্কভাতার ক্ষেত্রে নাম তালিকাভুক্তির আগে নীতিমালা অনুযায়ী প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং ইউনিয়ন পরিষদকে প্রয়োজনীয় সময় ও খরচ প্রদান করতে হবে। এছাড়া উন্নত দেশের মতো বয়স্কভাতাকে সর্বজনীন করা যেতে পারে। কিন্তু সম্পদ সীমিত হওয়ায় সারাদেশে সর্বজনীন বয়স্কভাতা দেওয়া সম্ভব না হলেও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই সুবিধা গরিব প্রবীণদের দিতে হবে। দেশের ৫০টি সবচেয়ে গরিব উপজেলা যা ইতোমধ্যে চিহ্নিত আছে, সেখানে এই ভাতা কার্যক্রমকে সর্বজনীন করা প্রয়োজন। এরপর ধাপে ধাপে অন্যান্য উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩. বয়স্কভাতা ছাড়াও প্রবীণদের আর্থিক সহায়তা বাড়ানোর জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। কারণ, গ্রামে বেশিরভাগ প্রবীণই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করেন এবং তাঁদের কোনো মাসিক নগদ আর্থিক উৎস থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে সন্তানরা পিতামাতার দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক হয় না। গরিব সহায়-সম্পদহীন ও আত্মীয়-স্বজনবিহীন সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত প্রবীণ ব্যক্তিরা যেন পর্যাপ্ত ঋণ গ্রহণ করে অর্থকরী কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন সে বিষয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। এছাড়া প্রবীণদের জন্য অবসর ভাতা, আনুতোষিক, কল্যাণ তহবিল, যৌথ বীমা, ভবিষ্য তহবিল ইত্যাদি সেবার মান উন্নয়ন ও অব্যহত রাখতে সরকারকে আরো মনযোগী হতে হবে।[৫৫]

৪. দেশের প্রবীণদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্যে সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্যনীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। প্রতিটি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রবীণদের জন্য বিশেষ কাউন্টারের সুবিধা রাখতে হবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও বয়স্করা এ সকল সেবা থেকে অনেকাংশেই বঞ্চিত। দরিদ্র, মধ্যবিত্ত এবং অন্যান্য প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্যে বিনামূল্যে, স্বল্পমূল্যে এবং বিশেষায়িত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবা চালু করা যেতে পারে। এই পরিষেবার উদ্দেশ্য হবে শহর-গ্রাম ও বিস্তীর্ণ বস্তি এলাকায় উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবার সহায়তা সহজলভ্য করা। এছাড়া প্রবীণদের স্বাস্থ্যের প্রধান শত্রু নিউমোনিয়া ও ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধের জন্য সরকার কর্তৃক টিকা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার আওতায় রাজধানী ঢাকাসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রবীণদের জন্য বিশেষ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।[৫৬] এছাড়া নানা

সমস্যায় নিপতিত থাকার কারণে প্রবীণদের মানসিক চিন্তাটাও বেশি থাকে। তাঁদের বিভিন্ন মনো-সামাজিক থেরাপি প্রদানের মাধ্যমে কাউন্সেলিং প্রদান করা যেতে পারে।[৫৭]

৫. প্রবীণ নিবাস বা প্রবীণদের আবাসন সুবিধা শহর ও গ্রামে সমানভাবে সম্প্রসারণ করতে হবে। তাঁদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং হতদরিদ্র ও নিঃস্ব প্রবীণদের আবাসন সুবিধাও বাড়াতে হবে। শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী, দলিত ও আদিবাসী প্রবীণদের জন্য বিশেষ সেবা ও সুরক্ষার পাশাপাশি আবাসন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে গ্রামে, পার্বত্য অঞ্চলে, সমুদ্র-তীরবর্তী এলাকায়, চা-বাগানে, চরাঞ্চলে অভাবী প্রবীণদের জন্য সরকারি উদ্যোগে ঘর বা আবাসস্থল তৈরি করে দেয়ার পরিকল্পনা থাকতে হবে। এর ফলে কোনো দুর্যোগকালে এবং এর আগে ও পরে প্রবীণদের নিরাপত্তা, সহায়তা এবং পুনর্বাসনের যথাযথ ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। জাতীয় পর্যায়ে বয়স্কদের আবাসন ব্যবস্থার জন্য নীতিমালা গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৬. দেশের সকল প্রবীণ, বিশেষত গ্রামীণ প্রবীণদের জন্যে স্বল্প বা বিনামূল্যে খাদ্য রেশনিং ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দুর্বল ও প্রতিবন্ধী প্রবীণদের সহায়তায় বিভিন্ন সহায়ক উপকরণ (যেমন: চশমা, হিয়ারিং এইড, ক্যার্চ, ওয়াকার, হুইল চেয়ার) এবং অবকাশ সময় আনন্দে কাটানোর লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী (যেমন: রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট) ইত্যাদি আয়োজনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পাশাপাশি দেশের রাস্তাঘাট, হাট-বাজার, দালান-কোঠা, অফিস-আদালত, যানবাহন, বিনোদন কেন্দ্র, হাসপাতালসহ অন্যান্য গণসেবা ব্যবস্থায় প্রবীণদের উপযোগী এবং সহজ অভিগম্য রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রবীণদের অখণ্ড অবসর সময় চিত্তবিনোদনে ভরিয়ে রাখতে সামাজিক সংগঠনসমূহ বিভিন্ন খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আড্ডা, অডিও-ভিডিও ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে।

৭. দেশের সকল শিক্ষা কার্যক্রমে বার্ধক্য ও প্রবীণ কল্যাণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রাচীন সামাজিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় অনুশাসন, ইতিবাচক দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি বিষয় দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা করতে হবে। এছাড়া স্থানীয় সরকার ও এনজিও কার্যক্রমে বার্ধক্য ও প্রবীণ কল্যাণের বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত ও চর্চা করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে জেরিয়াট্রিক মেডিসিন (IGM) নামের একটি চিকিৎসা-বিষয়ক শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বর্তমানে চার বছর মেয়াদের তিনটি (প্যাথলজি, ফিজিওথেরাপি ও নার্সিং) ডিপ্লোমা কোর্স চালু রয়েছে।[৫৮] উল্লেখ্য, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে এক বছর মেয়াদি MSS in Social Welfare with Specialization in Gerontology and Geriatric Welfare কোর্স চালু করেছে। বর্তমানে জেরিয়েট্রিক স্পেশালিস্ট তৈরির জন্য দেশের সরকারি-বেসরকারি সকল মেডিকেল কলেজের কারিকুলামে জেরিয়েট্রিক বিষয় প্রবর্তন করা এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্পেশালিস্ট ডাক্তার তৈরি করা প্রয়োজন।

৮. প্রবীণ বিষয়ক আইন ও নীতিমালা প্রণীত হলেও কোনো বিধি না হওয়ায় প্রবীণরা অবহেলা ও নিপীড়ন থেকে যথাযথভাবে সুরক্ষা পাচ্ছে না। ভরণপোষণ ছাড়াও প্রবীণ ব্যক্তিরা সামাজিক, আবাসিক, অর্থনৈতিক, চিকিৎসা সেবা, সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। এক্ষেত্রে প্রবীণদের জন্য পৃথক স্বাস্থ্যনীতি বা স্বাস্থ্যসেবা-বিষয়ক নীতিমালা এবং প্রবীণ কল্যাণমূলক বিধিমালা প্রণয়ন করা অতীব জরুরি।[৫৯] প্রবীণ-বিষয়ক মাদ্রিদ আন্তর্জাতিক কর্ম-পরিকল্পনা বা মানদণ্ড বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার ও বেসরকারি সংস্থাকে প্রবীণ নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা ও কল্যাণে একযোগে কাজ করা প্রয়োজন।[৬০] প্রবীণদের জন্যে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও কল্যাণ আয়োজন সম্প্রসারণ করা এবং সক্ষমতা ও সহযোগিতামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করা দরকার। এছাড়া উন্নত দেশসমূহের বিভিন্ন প্রকল্পের মতো প্রবীণদের জন্য উপযোগী কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বতন্ত্র ও প্রবীণবিষয়ক অধিদপ্তর গঠন করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।[৬১] তবেই প্রবীণকল্যাণ ও অধিকার সুরক্ষার বিষয়টি গতিশীল ও কার্যকর হবে।

৮. বয়স্কদের প্রতি সমষ্টির জনগণের সার্বিক দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলা দরকার। বর্তমানে প্রবীণ মা-বাবার প্রতি সন্তানদের নির্যাতনের নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা সমাজে মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অবক্ষয়েরই একটি বহিঃপ্রকাশ বলা যায়। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখন আমাদের দেশেও মানুষ ক্রমান্বয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, স্বার্থপর এবং ভোগবিলাসী হয়ে উঠছে। তাই প্রবীণ নির্যাতন বিষয়ে মুখ খোলা, সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করা, এর প্রতিরোধ-প্রতিকারের বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া এবং প্রবীণদের সুরক্ষার বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া এখন খুবই জরুরি। তাঁদের যথাযথ স্বীকৃতি এবং মানবাধিকার সমুন্নত রাখার পাশাপাশি সব ধরনের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তাই শিক্ষাবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, সংস্কৃতিবিদ ও কর্মী, নগর-পরিকল্পনাবিদ, রাজনীতিবিদ, আইনবিদ, অধিকার সচেতন মানুষ- সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের ব্যবস্থা খুঁজে সর্বত্র সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। সমাজ, পরিবার সবারই এ কাজে দায়িত্ব রয়েছে, তবে প্রবীণদের সার্বিক কলাণের জন্য সরকারের সুদৃষ্টি ও সহানুভূতি সর্বাগ্রে প্রয়োজন।[৬২] কারণ ভবিষ্যতে প্রবীণদের দুর্দশা যে আরও বিস্তার ঘটবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং সেটি হতে দিলে সমাজের অনেক ভারসাম্যই ভেঙে পড়তে পারে, এমনকি আমাদের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও এটি বাধার সৃষ্টি হতে পারে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, জন্ম ও মৃত্যুর মতো বার্ধক্যও জীবনের অলংঘনীয় সত্য। বার্ধক্যে নারী-পুরুষ সকলেই পরিবার ও সমাজের কাছ থেকে সম্মান পাওয়ার যোগ্য। নাগরিক হিসেবে প্রবীণ ব্যক্তিগণ পূর্ণ অধিকার, সার্বিক নিরাপত্তা এবং মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী। জনমিতিক পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক স্থানান্তর, আধুনিকায়ন, ভিন্ন সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ইত্যাদির প্রভাবে বাংলাদেশে প্রবীণরা অনেকাংশে অরক্ষিত, অসহায় ও বিচ্ছিন্ন। বর্তমান সমাজে প্রবীণদের প্রতি বেশিরভাগ

দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব নৈতিক এবং মানবিক নয়। প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই প্রবীণদের অক্ষম, অসুস্থ, দুর্বল এবং পরনির্ভরশীল হিসেবে গণ্য করা হয়। পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রবীণ স্বজনদের কিছুটা দেখ্‌ভাল্ ও সেবা-পরিচর্যার দৃষ্টিতে দেখা হলেও সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতি বৈষম্যময় আচরণ করা হয়। যদিও ২০১৩ সালে প্রবীণ নীতিমালা ও পিতামাতার ভরণপোষণ আইন করা হয়েছে এবং ২০১৪ সালে প্রবীণদের সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, তথাপি বাংলাদেশে নাগরিক হিসেবে তাঁদের সার্বিক নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষায় পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সচেতনতা ও পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। একই সাথে আমাদের দেশে প্রাচীন সামাজিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় অনুশাসন, ইতিবাচক দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়গুলো ক্রমেই অপসৃত হচ্ছে। প্রবীণদের বিশেষ যত্নসহ জীবনের শেষ সময় নিশ্চিন্তে কাটানোর জন্য সরকারি ও বেসরকারি পদক্ষেপ গ্রহণের সময় এসেছে। সরকারি ও বেসরকারিভাবে প্রবীণদের বয়স্কভাতা, প্রবীণ নিবাস, চিকিৎসাসেবা ও অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে। রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব প্রবীণ ব্যক্তিদের নাগরিক ও সামাজিক অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। তরুণ প্রজন্মকে বার্ধক্য সম্পর্কে যথাসময়ে অবহিত, সচেতন আর সার্বিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে। আজকের নবীনরাই আগামী দিনে প্রবীণ হবে। তাহলে কেবল বর্তমান প্রবীণরাই নয়, আগামী দিনের প্রবীণদেরও জড়িত করা যাবে। আর এতে করে সমাজ হবে সকল বয়সি প্রবীণদের জন্য সমান উপযোগী। তবে সময় এসেছে প্রজন্মকে সঠিক পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে সকল বয়সিদের জন্যে সমান উপযোগী এক সুন্দর বিশ্ব গড়ে তোলার। এ গুরুদায়িত্ব দেশের সকলকেই নিতে হবে। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর বার্ধক্যের জীবন যেন স্বস্তিময় হয় সেজন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ ও আইন কাঠামো তৈরি করতে হবে। সকল প্রবীণের জন্য মর্যাদাপূর্ণ, অধিকারভিত্তিক এবং সমান উপভোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

তথ্যনির্দেশ

---

১ ধীরাজ কুমার নাথ, 'প্রবীণ জীবনের উৎকর্ষ ও উৎকণ্ঠা এবং সক্রিয় প্রবীণ জনগোষ্ঠী', *প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা*, সংখ্যা ৪৭, ২০১২, পৃ. ১৫৯

২ Population and Housing Census Report, 2022, (Preliminary Report) Ministry of Planning, Dhaka, Bangladesh.

৩ Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Report on Bangladesh Sample Vital Statistics 2020, Statistics and Informatics Division (SID), Ministry of Planning, June 2021, Bangladesh.

৪ M. S. Siddiqui, "Legal and social protection of senior citizens", *The Financial Express,* Dhaka, 25 January 2013

৫ মোহাম্মদ আলী খান, প্রবীণদের মানবাধিকার, *প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা*, বর্ষ ৫৩-৫৪, অক্টোবর ২০১৯, পৃ. ১৩১

৬ নাহিদ ফেরদৌসী, *প্রবীণ সমীকরণ*, প্রিয় বাংলা প্রকাশন, ঢাকা, ২০২৩, পৃ. ১৮

[৭] ফারজানা আক্তার ডালিয়া, বাংলাদেশে প্রবীণদের আর্থ-সামাজিক ও মানসিক অবস্থার বর্তমান চিত্র, *প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা*, বর্ষ ৫৩-৫৪, অক্টোবর, ২০১৯, পৃ. ১১৪

[৮] Sabrina Flora Meerjady, Ageing: A Growing Challenge, *Bangladesh Medical Journal*, Vol. 40, No. 3, September 2011, p. 49

[৯] শরীফা বেগম, 'প্রবীণ নির্যাতন বিষয়ে আমরা কতটা সচেতন', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৫ জুন ২০২২।

[১০] M. Nazrul Islam and Dilip C Nath, A Future Journey to the Elderly Support in Bangladesh, *Journal of Anthropology*, Hindawi Publishing Corporation, 2012, p. 2

[১১] Md. Zillur Rahman, *The Life of Older People*, Arafat's Publication, Dhaka, 2012, p. 123

[১২] অনুরাধা বর্ধন, 'শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রবীণদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা', *প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা*, সংখ্যা ৪৮, ২০১৩, পৃ. ২২১

[১৩] Ministry of Social Welfare (MoSW), Old Age Allowance Program, Implementation Manual, 2004.

[১৪] নাহিদ ফেরদৌসী, *প্রবীণ সমীকরণ*, প্রিয় বাংলা প্রকাশন, ঢাকা, ২০২৩, পৃ. ১৩-৩৬

[১৫] বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, সপ্তম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ, ২০২১, পৃ. ৮৮-৮৯

[১৬] A. N. M. Moin Uddin Shibly and Rasel Ahmed Rafi, 'Rights of Elderly Parents and Parents Maintenance Act 2013', *The Daily Star,* 29th January 2019

[১৭] এবিএম শামসুল ইসলাম, 'দ্রুত বর্ধনশীল প্রবীণ জনগোষ্ঠী: বিশ্ব বনাম বাংলাদেশের তুলনামূলক চিত্র', *প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা*, সংখ্যা ৪৭, ২০১২, পৃ. ১১৪-১১৬

[১৮] Md. Zillur Rahman, *The Life of Older People*, Arafat's Publication, Dhaka, 2012, p. 122

[১৯] Sazzadul Alam, Elderly People in Bangladesh: Vulnerabilities, Laws and Policies, Report of BRAC, 2015, p. 12

[২০] মোহাম্মদ শাহীন খান, ঢাকা শহরের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থা: একটি সমীক্ষা, *প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা*, সংখ্যা ৪৮, ২০১৩, পৃ. ২৩৫-২৩৯

[২১] Sazzadul Alam, Elderly people in Bangladesh: Vulnerabilities, Laws and Policies, Report of BRAC, 2015, p. 12

[২২] শরীফা বেগম, 'করুণা নয় তাঁদের অধিকার নিশ্চিত করুন', দৈনিক *প্রথম আলো*, ১ অক্টোবর, ২০১৯।

[২৩] প্রবীণ সম্মেলন ২০২১-এর গৃহীত কার্যবিবরণী ও প্রস্তাবাবলী, বাংলাদেশ সিনিয়র সিটিজেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, পৃ. ৮

[২৪] এ এস এম আতীকুর রহমান, 'বাংলাদেশের বার্ধক্য পরিস্থিতি এবং আমাদের করণীয়', *প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা*, সংখ্যা ৪৮, ২০১৩, পৃ. ১৭৯-১৮১

[২৫] Anuradha Bardhon, 'Field Practice Experience on Aging Issue in Bangladesh', *Bangladesh Journal of Geriatrics,* Vol. 47, 2012, p. 15

[২৬] Papia Sultana, 'Situation of Older Women Residing in BAAIGM's Old Home', *Bangladesh Journal of Geriatrics,* Bangladesh Association for the Aged and Institute of Geriatric Medicine (BAAIGM), Vol. 48, 2013, p. 59

[২৭] অনুরাধা বর্ধন, 'শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রবীণদের আর্থসামাজিক অবস্থা', *প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা*, সংখ্যা ৪৮, ২০১৩, পৃ. ১৮৬

[২৮] শরীফা বেগম, 'করুণা নয় তাঁদের অধিকার নিশ্চিত করুন', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১ অক্টোবর ২০১৯

[২৯] এবিএম শামসুল ইসলাম, 'দ্রুত বর্ধনশীল প্রবীণ জনগোষ্ঠী: বিশ্ব বনাম বাংলাদেশের তুলনামূলক চিত্র', *প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা*, সংখ্যা ৪৭, ২০১২, পৃ. ১১৪

[৩০] *আমাদের কথা,* New Hope: Senior Living, বাংলাদেশ সিনিয়র সিটিজেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, পৃ. ১৫

[৩১] মহাসচিবের প্রতিবেদন ২০১৮, ৫১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, পৃ. ২০

[৩২] লাবলু সরকার, 'বাংলাদেশের প্রবীণদের অবস্থা, সমস্যা এবং সেবা ব্যবস্থা', *প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা*, সংখ্যা ৫০-৫২ (যৌথ সংখ্যা), অক্টোবর ২০১৭, পৃ. ১৮৮

[৩৩] The Vienna International Plan of Action on Ageing 1982.

[৩৪] The Cairo Declaration of Human Rights in Islam 1990.

[৩৫] নাহিদ ফেরদৌসী, *প্রবীণ সমীকরণ*, প্রিয় বাংলা প্রকাশন, ঢাকা, ২০২৩, পৃ. ২০।

[৩৬] The Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 2002

[৩৭] Md Mostafa Kamal Mazumder, Bangladesh Progress Towards MIPAA Implementation, Ministry of Social Welfare (MoSW), 2017

[৩৮] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৭২, অনুচ্ছেদ ১৫।

[৩৯] Siti Zaharah Binti Jamaluddin, Gan Ching Chuan and Mohammad Abu Taher, 'Strategies in the prevention or reduction of Elder Abuse in Bangladesh and Malaysia', *Social and Behavioral Sciences,* Vol. 172, 2015, p. 42

[৪০] নাহিদ ফেরদৌসী, বাংলাদেশে প্রবীণ অধিকার রক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ: একটি পর্যালোচনা, *The Journal of Social Development,* Vol. 31, No1, Institute of Social Welfare and Research (ISWR), University of Dhaka, December 2020.

[৪১] Siti Zaharah Binti Jamaluddin, Gan Ching Chuan and Mohammad Abu Taher, 'Strategies in the prevention or reduction of Elder Abuse in Bangladesh and Malaysia', *Social and Behavioral Sciences*, Vol. 172, 2015, p. 42

[৪২] M. A. Kabir, 'Elderly Care in Bangladesh, Challenges Ahead', *The Daily Star,* Dhaka, 2015

[৪৩] Md. Raziur Rahman, 'An Empirical Study on Elderly Populations Care in Bangladesh: Legal and Ethical Issues', *Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 23, Issue 1, 2018, p. 5

[৪৪] Mohammed Mamun Rashid, Protecting the constitutional rights of senior citizens, *The Daily Star,* 18 January 2019

[৪৫] The Senior Citizens Act 2006 of India.

[৪৬] The Senior Citizens Act, 2006 of Nepal.

[৪৭] Law on the Elderly 2010 (No, 39/2009/QH12) (Vietnam).

[৪৮] নাহিদ ফেরদৌসী, *প্রবীণ সমীকরণ*, প্রিয় বাংলা প্রকাশন, ঢাকা, ২০২৩, পৃ. ১৩-৩৬

[৪৯] পিতামাতার ভরণপোষণ আইন, ২০১৩ বাংলাদেশ গেজেট, রেজিস্টার্ড নং ডি, এ-১ বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় কর্তৃক মুদ্রিত ও বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। আইন নং ৪৯, ধারা-২।

[৫০] পিতামাতার ভরণপোষণ আইন, ২০১৩, ধারা ৩।

[৫১] The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007 (India).

[৫২] A. N. M. Moin Uddin Shibly and Rasel Ahmed Rafi, 'Rights of Elderly Parents and Parents Maintenance Act 2013', *The Daily Star*, 29 January 2019

[৫৩] *আমাদের কথা,* New Hope: Senior Living, বাংলাদেশ সিনিয়র সিটিজেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, পৃ. ১৪

[৫৪] নাহিদ ফেরদৌসী, *আইনী সমাচার*, পিয়াল প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০২৩, পৃ. ৪৬

[৫৫] লাবলু সরকার, 'বাংলাদেশের প্রবীণদের অবস্থা, সমস্যা এবং সেবা ব্যবস্থা', *প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা*, সংখ্যা ৫০-৫২, অক্টোবর ২০১৭, পৃ. ১৮৬

[৫৬] *আমাদের কথা*, New Hope: Senior Living, বাংলাদেশ সিনিয়র সিটিজেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, পৃ. ১২, ১৩, ১৫।

[৫৭] মুহাম্মদ মামুনুর রশিদ, 'বাংলাদেশের প্রবীণদের সমস্যাবলি এবং আমাদের করণীয়', *প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা*, বর্ষ ৫৩-৫৪ (যুক্ত সংখ্যা), অক্টোবর ২০১৯, পৃ. ১১২

[৫৮] মহাসচিবের প্রতিবেদন ২০২০, ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, পৃ. ২২।

[৫৯] নাহিদ ফেরদৌসী, 'বাংলাদেশে প্রবীণ অধিকার ও সামাজিক বাস্তবতা: একটি পর্যালোচনা', *সমাজ নিরীক্ষণ*, খণ্ড ১৪৪, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, জানুয়ারী-মার্চ ২০১৮

[৬০] Mohammad Abdul Hannan Pradhan, Sadika Akthar, Md. Gias Uddin Khan, Mohammad Rafiqul Islam, 'Demographic Transition and Home Care for the Elderly in Bangladesh: An Urban Rural Comparison', *Advances in Economics and Business,* Vol. 5, No. 6, 2017, pp. 334-345

[৬১] এ এস এম আতীকুর রহমান, 'বাংলাদেশের বার্ধক্য পরিস্থিতি এবং আমাদের করণীয়', *প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা*, সংখ্যা ৪৮, ২০১৩, পৃ. ১৭৯

[৬২] শরীফা বেগম, 'প্রবীণ নির্যাতন বিষয়ে আমরা কতটা সচেতন', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৫ জুন ২০২২

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একচল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০/জুন ২০২৩

বাংলাদেশের 'নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্রে' 'নৃগোষ্ঠী' উপস্থাপন কৌশল বিশ্লেষণ: পরিপ্রেক্ষিত *মর ঠেংগাড়ি* ও "*Kalpona*"... *Not Imagination*

মো. অমিত হাসান সোহাগ*

সারসংক্ষেপ

বিশ্বব্যাপী সমাদৃত 'ফোর্থ সিনেমা' বা 'নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্র' নির্মাণের প্রভাব বাংলাদেশেও প্রত্যক্ষ করা যায়। সচেতন কিংবা অবচেতন যেভাবেই হোক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সচেতন প্রয়াস হিসেবে বাংলাদেশে নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়েছে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্বাধীন ধারার 'ফিল্ম সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার পর নৃগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে সচেতন চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রয়াস প্রত্যক্ষ করা যায়। তারই ধারাবাহিক প্রভাবে চাকমা ভাষার পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র '*মর ঠেংগাড়ি*' বা '*My Bicycle*' (২০১৫) নির্মিত হয়। নিকটবর্তী সময়ে নির্মিত হয় স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র "*Kalpona*".... *Not Imagination* (২০১৬)। অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় চলচ্চিত্র ২টি গবেষণা প্রবন্ধের জন্য নির্বাচনপূর্বক যৌক্তিক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। চলচ্চিত্রদ্বয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে বিষয়টিতে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা হলো, উক্ত চলচ্চিত্রের মধ্যে 'নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্র' বা 'ফোর্থ সিনেমা'র প্রকটিত প্রলক্ষণ। উক্ত চলচ্চিত্রদ্বয়ে নৃগোষ্ঠীর জনসংস্কৃতি কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তাদের নিজস্ব বক্তব্য ও অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে যে চালচ্চিত্রিক শিল্পকৌশল অনুসৃত হয়েছে তা উক্ত জনগোষ্ঠীর নৃতত্ত্বের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

চাবি শব্দ: চলচ্চিত্র, ফোর্থ সিনেমা, নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্র, নৃগোষ্ঠী, হেজিমনি, সাম্রাজ্যবাদ, *মর ঠেংগাড়ি*, *My Bicycle*, "*Kalpona*"....*Not Imagination*।

ভূমিকা

চলচ্চিত্রের সূচনা হয়েছিল চলমান ছবি দিয়ে গল্প বলার চেষ্টা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে। শুধু গল্প বলাই যদি একমাত্র লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হতো তাহলে হয়তো চলচ্চিত্র 'শিল্প' হয়ে উঠতে পারত না। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ গল্প শুনে এসেছে, লিখে এসেছে, পড়ে এসেছে। তাই শুধু গল্প বলা কিংবা গল্প শোনা চলচ্চিত্রের উদ্দেশ্যের মধ্যে যদি সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে চলচ্চিত্র 'শিল্প' হিসেবে স্বীকৃতি পেতো কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়। তেমনি সাধারণ মানুষের পক্ষে চলচ্চিত্রকে তুমুলভাবে গ্রহণ করার প্রবণতাও সৃষ্টি হতো না। চলচ্চিত্রশিল্প গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে মূল উপাদান বা কৌশল ছিল শট, ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল, ক্যামেরা মুভমেন্ট, গল্প, গল্প বলার ধরন, গল্পের বিষয়বস্তু এবং সার্বিকভাবে মানবজীবন সংশ্লিষ্ট ঘটনা। এ সকল উপাদানই হচ্ছে 'চলচ্চিত্র' মাধ্যমটির শিল্প নির্মাণ কৌশল। কালের বিবর্তনে চলচ্চিত্র শিল্পের বিষয়, আঙ্গিক,

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, উত্তরা, ঢাকা

পরিবেশনারীতি, প্রযুক্তি, জনসংস্কৃতির উপাদান নতুন নতুন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় 'বৃহত্তর জনগোষ্ঠী'র পাশাপাশি বৈচিত্র্যময় নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উপাদান অনুসন্ধান এবং তা চলচ্চিত্রশিল্পে উপস্থাপনের প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে নবীনতম শিল্প মাধ্যমটি বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠছে। কখনো কখনো মূল ধরার চলচ্চিত্রে নৃগোষ্ঠীর প্রসঙ্গ এসেছে চলচ্চিত্রকে বর্ণিল করে তোলার নিমিত্তে, আবার কখনো নৃগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির ভুল ব্যাখ্যা বা উপস্থাপনও প্রত্যক্ষ করা যায়। পাশাপাশি চলচ্চিত্র নির্মাণ কৌশল আত্তীকরণপূর্বক নৃগোষ্ঠীর মানুষ এখন তাদের নিজেদের সংস্কৃতি, ইতিহাস ঐতিহ্য, লোকাচার, কৃত্যমূলক পরিবেশনা, জীবনসংগ্রাম, অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণ, রাজনৈতিক মতবাদ ও মতাদর্শ ইত্যাদি চলচ্চিত্র মাধ্যমে নিজস্ব আঙ্গিকে উপস্থাপনের প্রয়াস পাচ্ছে। এমত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা বাঙালি জনগোষ্ঠী কর্তৃক নির্মিত চলচ্চিত্রে নৃগোষ্ঠী উপস্থাপনের বিপরীতে নৃগোষ্ঠী পরিচালক কর্তৃক নির্মিত চলচ্চিত্রে নৃগোষ্ঠী উপস্থাপনকৌশলের প্রবণতা নির্ণয় বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচিত হয়। যা এই প্রবন্ধে যৌক্তিক আলোচনার মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়েছে। বক্ষ্যমাণ গবেষণামূলক প্রবন্ধে নির্বাচিত দুটি চলচ্চিত্রে (*মর ঠেংগাড়ি* বা *My Bicycle* এবং "*Kalpona*"....*Not Imagination*) মূলত বাংলাদেশের পার্বত্যাঞ্চলে বসবাসরত নৃগোষ্ঠীর জীবনসংগ্রাম, রাজনৈতিক মতাদর্শ, তাদের সংস্কৃতি, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনাচরণ, ভাষা, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণ প্রভৃতি উঠে এসেছে। বিশেষ করে নৃগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যসহ চাকমা জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাপন প্রণালি নির্বাচিত চলচ্চিত্রদ্বয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

চলচ্চিত্র পর্যালোচনা

চলচ্চিত্র শিল্প বরাবরই ছিল উন্মুক্ত। নতুন প্রযুক্তির পাশাপাশি বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি আত্তীকরণের ক্ষমতা চলচ্চিত্র শিল্পের রয়েছে। তাই বিশ্বব্যাপী চলচ্চিত্র শিল্পের নেতৃত্বে থাকা তুলনামূলক 'বৃহত্তর জনগোষ্ঠী' চেয়েছে নতুন সংস্কৃতির উপাদান অনুসন্ধানে নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ চলচ্চিত্রে নিজস্ব আঙ্গিক ও কৌশলে উপস্থাপন করতে। বাংলাদেশেও এই প্রবণতা লক্ষ করা গেছে বিভিন্ন সময়। বিশেষ করে স্বাধীন বাংলাদেশে নির্মিত বাণিজ্যিক ধারার চলচ্চিত্র (ফার্স্ট সিনেমা), শিল্পমান নির্ভর চলচ্চিত্র বা আর্টফিল্ম (সেকেন্ড সিনেমা) এবং রাজনৈতিক ধারার চলচ্চিত্রেও (থার্ড সিনেমা) এই প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। এখানে উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশে নির্মিত চলচ্চিত্রে 'নৃগোষ্ঠী' প্রসঙ্গ উঠে এসেছে এমন কয়েকটি চলচ্চিত্রের 'নৃগোষ্ঠী' উপস্থাপন কৌশল মূল্যায়নপূর্বক নাতিদীর্ঘ পরিসরে উপস্থাপন করা প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করছি।

***মেঘের অনেক রং* (১৯৭৬)**

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম রঙিন চলচ্চিত্র *মেঘের অনেক রং*[১]-এ উঠে এসেছে নৃগোষ্ঠী প্রসঙ্গ। এখানে নৃগোষ্ঠী প্রসঙ্গ উঠে এসেছে যথাক্রমে-

- নৃগোষ্ঠী চরিত্রের উপস্থিতির মাধ্যমে: মাথিন এই চলচ্চিত্রে নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

- দৃশ্যায়নের মাধ্যমে: চলচ্চিত্রের ৮ মিনিট ২২ সেকেন্ডে পাহাড়ি জুম ক্ষেতে ফসল সংগ্রহের দৃশ্য এবং চলচ্চিত্রের ১৪ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড থেকে দৃশ্যে মারমা বা রাখাইন জনগোষ্ঠীর উৎসব 'সাংগ্রাই' উঠে এসেছে।
- মুক্তিযুদ্ধে নৃগোষ্ঠী নারীর অবদান উপস্থাপনার মাধ্যমে: মাথিনকে একজন নারী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে (যুদ্ধের ময়দানে সেবাদানকে বিবেচনায় নিয়ে) দেখা যায়।
- নৃগোষ্ঠী ভাষা ও সংগীত উপস্থাপনের মাধ্যমে: চলচ্চিত্রের ৩৪ মিনিট ৩০ সেকেন্ড থেকে ৩৪ মিনিট ৪০ সেকেন্ড পর্যন্ত দৃশ্যে নৃগোষ্ঠী ভাষার (রাখাইন ভাষার) সংলাপ প্রত্যক্ষ করা যায়।
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশে নৃগোষ্ঠীর অবস্থান ও অধিকারের প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে: মাথিন যখন বলছে, "লাইফ উইদাউট মিশন তো মৃত্যুর সমান। তাইতো এই মুক্তিযুদ্ধ ডক্টর" তখন বাঙালি ডাক্তার ওমর বলে ওঠে "এই মুক্তিযুদ্ধ কি আপনারও?" পরবর্তী সংলাপে মাথিন বলে, "I belong to this land, জানি আপনারা আমাকে বাঙালি বলে স্বীকার করতে চান না"। এর উত্তরে ডাক্তার ওমর বলেন- "আমি ও কথা মিন করিনি"। কিন্তু তিনি আসলে কি মিন করেছেন সেটা পরবর্তী কোন সংলাপে উঠে আসেনি। ফলে বিষয়টি অমীমাংসিত থেকে যায়।

চলচ্চিত্রের এই সংলাপ প্রসঙ্গে সমালোচক কবিতা চাকমা তাঁর "*Sovereign: Over Representation: Indigenous Cinema in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh*" (ডালিয়া চাকমা কর্তৃক ভাষান্তরিত) প্রবন্ধে একে 'বাঙালি কর্তৃত্ববাদ (Hegemony)' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[২]

আধিয়ার (২০০৩)

আধিয়ার[৩] চলচ্চিত্রে নৃগোষ্ঠী উপস্থাপিত হয়েছে যেভাবে সেগুলো হলো:

- সংলাপের মধ্যে নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে তথ্য উপস্থানের মাধ্যমে: *আধিয়ার* চলচ্চিত্রে তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সাঁওতাল এবং রাজবংশীদের কথা উঠে এসেছে চলচ্চিত্রের ১ঘন্টা ৫১ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে, ১ঘন্টা ৫৭মিনিট ৩৫ সেকেন্ডে। আর চলচ্চিত্রের পর্দায় নৃগোষ্ঠী জনজীবন কিংবা সংস্কৃতির উপাদান পরিচালক দেখিয়েছেন ১ঘন্টা ৪৯ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড থেকে একটি দৃশ্যে।
- সরাসরি কোরাস দৃশ্যে নৃগোষ্ঠী উপস্থাপনের মাধ্যমে: *আধিয়ার* চলচ্চিত্রের ১ ঘন্টা ৫৭ মিনিট ৩৫ সেকেন্ডে ধান কাটার দৃশ্যে নৃগোষ্ঠী কৃষকদের দেখা যায় তীর-ধনুক নিয়ে ধানক্ষেত পাহারা দিতে, কিছু নৃগোষ্ঠীর শ্রমিককে ধান কাটতে।
- প্রতিরোধ ও সম্মুখ যুদ্ধে নৃগোষ্ঠী উপস্থাপনের মাধ্যমে: চলচ্চিত্রের ২ ঘন্টা ৪ মিনিট ৯ সেকেন্ড থেকে ২ ঘন্টা ৪ মিনিট ২০ সেকেন্ড পর্যন্ত দৃশ্যে অত্যাচারী জমিদারের পাইক-বরকন্দাজদের উপর বাঙালি এবং নৃগোষ্ঠী কৃষকদের তীর ধনুক, লাঠি, বল্লম নিয়ে আক্রমণ করতে দেখা যায়। জমিদার বাড়ির দিকে ছুটে যাওয়া নৃগোষ্ঠী যোদ্ধাদের দেখা যায় তীর ধনুক, বল্লম হাতে আক্রমণ করতে।

- নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্যগীত পরিবেশনের মাধ্যমে: ১ ঘন্টা ৫৫ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড থেকে ১ ঘন্টা ৫৮ মিনিট ১০ সেকেন্ড পর্যন্ত দৃশ্যে নৃগোষ্ঠী নৃত্যগীত উপস্থাপন করেছেন পরিচালক। চলচ্চিত্রে এই নৃত্যগীত পরিবেশনকারী দলকে 'সাঁওতাল' হিসেবে চলচ্চিত্রে উল্লেখ করলেও মাঠপর্যায়ে সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে প্রকৃত পরিচয়ে তারা কুঁড়ুখ ভাষার ওরাঁও জনগোষ্ঠী।

গবেষণাকালে মাঠপর্যায়ে ক্ষেত্র সমীক্ষণের অংশ হিসেবে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার ওরাঁও জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি এবং সংগীতশিল্পী ভারতী কুজুরের সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। যিনি *আধিয়ার* চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত নৃগোষ্ঠী সংগীতের কোরাস শিল্পীদের মধ্যে একজন। অর্থাৎ এই চলচ্চিত্রে সংগীতে যে কজন শিল্পীর কণ্ঠ রয়েছে তিনি তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি নিশ্চিত করে বলেন "এটি কুঁড়ুখ ভাষার ঝুমুর আঙ্গিকের গান এবং ওরাঁও জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী ঝুমুর নৃত্য।"[৪] কিন্তু চলচ্চিত্রে তাদের উপস্থিতিকে সাঁওতাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে – যা একটি জনগোষ্ঠীর ভাষা সংস্কৃতি সম্পর্কে ভুল উপস্থাপন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

***নাচোলের রানী* (২০০৬)**

নাচোল বিদ্রোহ বা চাঁপাইনবাবগঞ্জ তথা বরেন্দ্রভূমিতে সংঘটিত তেভাগা আন্দোলনের বিষয় নিয়ে নির্মিত *নাচোলের রানী*[৫] চলচ্চিত্রটিতে 'নৃগোষ্ঠী' প্রসঙ্গ উঠে এসেছে ৩ ভাবে।

- বর্ণনা বা সংলাপে নৃগোষ্ঠী সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে: চলচ্চিত্রের আজহার ও রমেন মিত্রের কথোপকথনের দৃশ্যে (১৩ মিনিট ১৬ সে. - ১৩ মিনিট ৩০ সে. পর্যন্ত) উঠে এসেছে মাতলা মাঝি ও সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর প্রসঙ্গ। নাচোল বিদ্রোহের সাঁওতাল কৃষক প্রসঙ্গে আলোচনা উঠে এসেছে ৩৮ মিনিট ৩৬ সেকেন্ডে। এভাবেই আলোচনা প্রসঙ্গে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন স্থানে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।
- বাঙালি অভিনয় শিল্পী কর্তৃক সাঁওতাল বা 'নৃগোষ্ঠীর মানুষ' চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে: চলচ্চিত্রটিতে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে বাঙালি অভিনয়শিল্পী দিয়ে। মুখে কালো মেকাপ বা মেক-ওভার করে, ভাষাগত কিছু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সাঁওতাল চরিত্রসমূহ উপস্থাপন করেছেন পরিচালক। বিশেষ করে মাতলা মাঝি, হরেক, পারু এবং সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর অন্যান্য প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্রসমূহ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পরিচালক বাঙালি অভিনয়শিল্পী ব্যবহার করেছেন।
- সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর কোরাস অংশগ্রহণের মাধ্যমে: *নাচোলের রানী* চলচ্চিত্রে বিভিন্ন কোরাস দৃশ্যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায়। ইউটিউবে প্রাপ্ত চলচ্চিত্রটির ৩টি খণ্ডের মধ্যে প্রথম খণ্ডে (৩৯ মিনিট ০৩ সেকেন্ড থেকে ৪০ মিনিট ০১ সেকেন্ড পর্যন্ত) সাধারণ কৃষকদের উদ্দেশে রমেন মিত্রের দেওয়া এক কৃষক সমাবেশের দৃশ্যের মধ্যে প্রোটো-অস্ট্রালয়েড নৃগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সাঁওতাল জনগোষ্ঠীকে দেখা যায়। এছাড়াও চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় খণ্ডে যথাক্রমে ৩ মি. ৪১সে. থেকে ৪মি. ১৯ সে.; ১১ মি. ০৯সে. থেকে ১১মি. ২৭সে.; ২০মি. ৪৬সে. থেকে ২১মি. ৪০সে.; ২১মি. ৪১সে. থেকে ২৪মি. ৫সে. এর নাচগানের দৃশ্যে, ৩০মি. ৩০সে. থেকে ৩৯মি. ২সে. পর্যন্ত পুলিশের সাথে সংঘর্ষ এবং

পুলিশকে হত্যার দৃশ্যে, ৩৯মি. ২ সে. থেকে ৪০মি.৩২ সেকেন্ড পর্যন্ত পুলিশ হত্যাকাণ্ডের পর বাড়ির আঙ্গিনায় পরামর্শ-সভার দৃশ্যে, পুলিশ বাহিনী ও সাঁওতাল এবং বাঙালি কৃষকদের সঙ্গে যুদ্ধের দৃশ্যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায়।

ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটিতে ব্যাকগ্রাউন্ড বা আবহ নির্মাণের স্থান হিসেবে বরেন্দ্র অঞ্চল বেছে নেওয়া হলেও চরিত্র নির্মাণে প্রকৃত প্রোটো-অস্ট্রালয়েড নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোন অভিনয় শিল্পীকে নেওয়া হয়নি। ফলে একটি জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য চলচ্চিত্রের পর্দায় উপেক্ষিত থেকেছে। বাঙালি অভিনয়শিল্পী কর্তৃক সাঁওতাল চরিত্রে অভিনয়, চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রক্রিয়ায় পরিচালককে স্বস্তি দিলেও ঐতিহাসিক মূল্য বিচারে এবং চলচ্চিত্রের নৃতাত্ত্বিক সৌন্দর্য অনুসন্ধানে এই কৌশল অবলম্বন প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া অসঙ্গত নয়।

উল্লেখিত তিনটি বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে নৃগোষ্ঠী উপস্থাপনের কৌশল প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনায় যে তিনটি প্রবণতা বা বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়, তা হল–

- বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের নৃগোষ্ঠী উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর প্রতি বাঙালির কর্তৃত্ববাদী মনোভাব প্রকাশিত;
- একটি জনগোষ্ঠীর নৃত্য-গীত তথা ভাষা ও সংস্কৃতিকে অপর একটি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি বলে দেশের সকল জনগোষ্ঠীর সামনে ভুল তথ্যসমেত উপস্থাপন; এবং
- নৃগোষ্ঠীচরিত্রে বাঙালি অভিনয়শিল্পী উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রকৃত নৃগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করার প্রবণতা প্রতীয়মান হয়।

চিহ্নিত এই তিনটি প্রবণতা বাংলাদেশের অন্যান্য চলচ্চিত্রে যেখানে নৃগোষ্ঠী প্রসঙ্গ কোন-না-কোন ভাবে উঠে এসেছে সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়।[৬] ফলে বলা যায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নৃগোষ্ঠী প্রসঙ্গ কখনোই যথাযথ নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়নি।

বাংলাদেশের যে চলচ্চিত্রসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে নৃগোষ্ঠী উপস্থাপনের তিনটি প্রবণতা চিহ্নিত করা গেছে, তার প্রত্যেকটির পরিচালক ছিলেন বাঙালি। বাঙালি বা 'ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা' জনগোষ্ঠী কর্তৃক নির্মিত চলচ্চিত্রের মধ্যে নৃগোষ্ঠী উপস্থাপন কৌশলের মৌলপ্রবণতাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে নৃগোষ্ঠীর পরিচালক কর্তৃক নির্মিত ও অভিনীত চলচ্চিত্রের গুণগত ও সার্বিক পার্থক্য নির্ণয় করার নিমিত্তে, যার গুরুত্ব ও তাৎপর্য প্রবন্ধের শেষাংশে যথাযথভাবে প্রতীয়মান হবে।

নৃগোষ্ঠী প্রসঙ্গে

প্রবন্ধের এই অংশে বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক 'নৃগোষ্ঠী' সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন যৌক্তিক বিবেচিত হয়। 'নৃগোষ্ঠী' বলতে সাধারণার্থে মানবগোষ্ঠীকে বোঝালেও নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে নৃগোষ্ঠী বলতে শুধু মানবগোষ্ঠী নয় বরং বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানবগোষ্ঠীকে বোঝায়। বাংলায় বহুল ব্যবহৃত নৃগোষ্ঠী শব্দটি ইংরেজি Ethnic Group বা Ethnic People থেকে গৃহীত হয়েছে। সামাজিক নৃবিজ্ঞানী Denton and Massey তাঁদের *Race Relation and Population Diversity* গ্রন্থে নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে বলেন, Group of people who see themselves and are seen by the

other, as having hereditary training that sets them apart.[৭] কোথাও কোথাও নৃগোষ্ঠীকে 'আদিবাসী' হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

চলচ্চিত্রের বিকাশমান পর্যায়ে নৃগোষ্ঠী সংস্কৃতি চলচ্চিত্রায়িত হতে শুরু করেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। সামাজিক নৃবিজ্ঞানের একটি শাখা হলো 'ভিজ্যুয়াল অ্যানথ্রোপলজি'।[৯] যেখানে কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ চিহ্নিত হয়। যার একটি হলো নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ভিডিও, চলচ্চিত্র, ফটোগ্রাফি এবং ভিডিও ব্যবহারের মাধ্যমে নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে যথাযথ ও মানবিক পর্যবেক্ষণ। 'ভিজ্যুয়াল অ্যানথ্রোপলজি'র মধ্যে বিশেষভাবে বিবেচিত হয় চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রের মধ্যে আবার যে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল থাকা প্রয়োজন সেগুলো হলো:

- জনজাতি বা প্রজাতি হিসেবে মানুষকে সেখানে কীভাবে উপস্থাপন করা হয় বা হয়েছে এবং কীভাবে তাদের জীবনের সঙ্গে তা সম্পর্কিত;
- কোন বিশেষ জনজাতি বা সমাজ অথবা সভ্যতার নিজস্ব গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি; এবং
- একটি জনজাতি বা সাংস্কৃতিকভাবে স্বতন্ত্র জাতিসত্তাকে চলচ্চিত্রের পর্দায় উপস্থাপন করা হয় উক্ত জনজাতির জীবনাচরণ ও তাদের জীবনের প্রেক্ষাপটে এবং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। যা 'ভিজ্যুয়াল অ্যানথ্রোপলজি'র নৈতিক বিবেচ্য বিষয়।[১০]

ভিজ্যুয়াল অ্যানথ্রোপলজি বলতে বুঝায় নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণাকালে কিংবা নৃগোষ্ঠীর জীবন-সম্পর্কিত বাস্তবঘনিষ্ঠ তথ্যাদি ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে পুঙ্খানুপুঙ্খ উপস্থাপন করা। যেখানে কোন কৃত্রিমতা বা নৃগোষ্ঠী সম্পর্কিত ভুল তথ্য থাকবে না। যা পরবর্তীকালে নৃগোষ্ঠী সম্পর্কিত সঠিক তথ্য প্রদান করতে পারে। নৃগোষ্ঠী-চলচ্চিত্র নির্মাণে ভিজ্যুয়াল অ্যানথ্রোপলজি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ। সমালোচক লিখেছেন:

> Visual anthropology is either the use of visual media as a research method or its study as a research topic. Whether they consider themselves visual anthropologists or not, most anthropologists take photos of the people and places they encounter in their fieldwork. Visual anthropologists go further, using photography and film to document important events for fine-grained future analysis. As moments frozen in time, photographs allow for analytical contemplation and shared consideration. Film can be slowed down or sped up to focus on certain aspects of individual action or group dynamics that might otherwise go unnoticed. Images may be magnified to reveal minute details. Both film and photography allow for images to be placed side by side for comparison.[১১]

গবেষকগণের প্রদত্ত সংজ্ঞার আলোকে নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্র নির্মাণে ভিজ্যুয়াল অ্যানথ্রোপলজির গুরুত্বকে সংক্ষেপে তিনটি কারণে চিহ্নিত করার প্রয়াস পাওয়া যায়, সেগুলো হলো:

- বিশেষ কোন জনগোষ্ঠী বা নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে গভীর ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে ওঠে:
  ভিজ্যুয়াল অ্যানথ্রোপলজি নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অনুশীলন, বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে গভীর গবেষণা এবং বোঝার সাথে জড়িত। এর মাধ্যমে, চলচ্চিত্র নির্মাতারা নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে গভীর ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে পারে, যা সঠিকভাবে নৃগোষ্ঠীর জীবনচিত্র তুলে ধরতে সাহায্য করে।

- নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত বা স্টেরিওটাইপ ধারণা এড়াতে সাহায্য করে:
  মূলধারার মিডিয়াতে (বিশেষত চলচ্চিত্রে) নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে প্রচার কতিপয় ধাঁধাঁযুক্ত বদ্ধমূল ভুল ধারণা দ্বারা প্রভাবিত। যা অন্যান্য জনগোষ্ঠীর নিকট নেতিবাচক ধারণাকে শক্তিশালী করতে পারে এবং ভুল বর্ণনার দিকে নিয়ে যেতে পারে। ভিজ্যুয়াল অ্যানথ্রোপলজি নৃগোষ্ঠী সংস্কৃতির সূক্ষ্ম উপলব্ধি প্রদান করে, যা চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সাধারণ স্টেরিওটাইপ বা বদ্ধমূল ধারণা এড়াতে ও নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে আরও সঠিক এবং সম্মানজনক চিত্র উপস্থাপন করতে সাহায্য করে।
- নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিক সংরক্ষণের প্রচার করে:
  নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্র যেহেতু এক বা একাধিক নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণ, বিশ্বাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য কিংবা সংগ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, তাই মাঠপর্যায়ে সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে ভিজ্যুয়াল অ্যানথ্রোপলজি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যা পরবর্তীকালে চলচ্চিত্র মাধ্যমে যথাযথভাবে উপস্থাপিত হলে সর্বসাধারণের সামনে নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও সংগ্রামের রূপচিত্র সংরক্ষণ ও প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ফলে নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্র নির্মাণে ভিজ্যুয়াল অ্যানথ্রোপলজি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত হয়।

প্রসঙ্গ: ফোর্থ সিনেমা

চলচ্চিত্র শিল্প মাধ্যমটি ক্রমাগত জনপ্রিয় এবং সহজপ্রাপ্য হয়ে ওঠার নিরিখে সর্বসাধারণের চলচ্চিত্র নির্মাণের সহজগম্যতা তৈরি হয়েছে। 'ক্ষমতাসীন জনগোষ্ঠী'-র বাইরে অন্য সকল জনগোষ্ঠীর নিকট প্রায় সমান্তরাল চলচ্চিত্র নির্মাণকৌশল পৌঁছে যাওয়ায় নৃগোষ্ঠীর মানুষও নিজেদের সংস্কৃতি, ভাবনা ও বক্তব্য তাদের শিল্পকৌশলের আলোকে চলচ্চিত্রে উপস্থাপন শুরু করে, যা পরবর্তীকালে 'ফোর্থ সিনেমা' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। মাওরি চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং তাত্ত্বিক বেরি বার্কলে (Barry Barcla, ১৯৪৪-২০০৮) হলেন ফোর্থ সিনেমা তত্ত্বের প্রবক্তা। তিনি আদিবাসী বা নৃগোষ্ঠীসমূহের জগতকে 'ফোর্থ ওয়ার্ল্ড' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[১২] তিনি ২০০৩ সালে অকল্যান্ড ইউনিভার্সিটি অনুষ্ঠানে 'নৃগোষ্ঠী জীবন ও সংস্কৃতি'-নির্ভর চলচ্চিত্রকে বিশ্ববাসীর সামনে ফোর্থ সিনেমা হিসাবে উপস্থাপন করেন। পূর্ব থেকে প্রচলিত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিনেমার পরিপ্রেক্ষিতে ফোর্থ সিনেমাকে স্বতন্ত্র হিসেবে আখ্যা দানকালে তিনি উল্লেখ করেন যে, "The phrase Fourth Cinema comes as a late addition to the First-Second-Third Cinema framework with which you will be familiar, First Cinema Being American cinema; Second Cinema Art House cinema; and Third Cinema the cinema of the so-called Third World."[১৩]

বেরি বার্কলে প্রদত্ত ফোর্থ সিনেমার সংজ্ঞার আলোকে স্টুয়ার্ট মুরে (Stuart Murray, জন্ম ১৯৬৭) তার *Images of Dignity: Barry Barclay and Fourth Cinema* গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে:

> It is the conception of Fourth World 'world views and value systems', to use Tuhiwai Smith's words, and an idea of their legitimacy and worth in a contemporary era dominated by beliefs and practices often antithetical to Indigenous peoples, that drove a figure like Barclay in the making of his films. Central to such concerns is the vexed and contested notion of Fourth World 'difference' and the view that the lived experiences of Indigenous lives encompass social, cultural and individual acts that differ widely from those of their non-Indigenous counterparts[…]While he writes that there is a 'temptation to analyse Fourth Cinema' in terms of 'surface features: the rituals, the language, the posturing, the décor, the use of elders, the presence of children, attitudes to land, the rituals of a spirit world', he also notes that 'in Fourth Cinema, at its best, something else is being asserted which is not easy to access'. This 'something else' is, fundamentally, what Barclay thinks of as a 'reworking' of the 'ancient core values' of Indigenous cultures. [১৪]

'ফোর্থ সিনেমা' বা ইন্ডিজেনাস ফিল্ম বা নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্র বলতে বুঝায় "Fourth cinema is used to describe legitimate films that are made by indigenous people, using their concepts, words, settings, and other features that are used to distinctly define them."[১৫]

বেরি বার্কলে প্রদত্ত সংজ্ঞার্থ বা তত্ত্ব এবং স্টুয়ার্ট মুরে ও অন্য গবেষকগণ প্রদত্ত বিশ্লষণের আলোকে বলা যায় যে, ফোর্থ সিনেমা বা চলচ্চিত্র হল সেই চলচ্চিত্র যেখানে,

- চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু হবে আদিবাসী বা নৃগোষ্ঠীর জনসংস্কৃতি ও তাদের জীবনসংগ্রাম;
- চলচ্চিত্র পরিচালনা এবং অভিনয় করবেন আদিবাসী বা নৃগোষ্ঠীর মানুষ;
- উক্ত চলচ্চিত্রটি হবে নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষায় (ক্যামেরার ভাষা কিংবা মৌখিক ভাষায়);
- 'বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর' মূল ধারার চলচ্চিত্রে সাংস্কৃতিক লক্ষ্য আকাঙ্ক্ষার সাথে এই ধারার চলচ্চিত্র হবে সাংঘর্ষিক বা স্বতন্ত্র;
- বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য (ফার্স্ট সিনেমার বৈশিষ্ট্য) প্রধান না হয়ে বরং নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব বক্তব্য প্রধান হয়ে উঠবে;
- থার্ড সিনেমার (রাজনৈতিক চলচ্চিত্র) সঙ্গে এই ধারার চলচ্চিত্রের কিছুটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হবে।

নৃগোষ্ঠী সংস্কৃতি প্রচলিত ধারার পরিচিত সংস্কৃতি বলয়ের বাইরে বৈচিত্র্যময়, বর্ণিল এবং বহুমাত্রিক সংস্কৃতি হিসেবে এই প্রবন্ধে গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশেও শুরু হয়েছে নৃগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চেতনালব্ধ 'নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্র' নির্মাণ প্রক্রিয়া। বাংলাদেশের 'নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্রে' 'নৃগোষ্ঠী' কোন কোন কৌশল অবলম্বন পূর্বক উপস্থাপিত হয়েছে বা নৃগোষ্ঠী সংস্কৃতি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যে কৌশলের প্রয়োগ ঘটেছে তা চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধের গুরুত্বসহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

নির্বাচিত চলচ্চিত্রদ্বয় বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের 'নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্র' প্রসঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে সমকালীন সময়ে দুইটি নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্র *মর ঠেংগাড়ি* (২০১৫) ও *"Kalpona"... Not Imagination* (২০১৬) প্রাসঙ্গিক এবং

গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণা প্রবন্ধে *মর ঠেংগাড়ি* ও *Kalpona… Not Imagination* চলচ্চিত্রদ্বয় কেন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক সে বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপনের পূর্বে দুইটি বিষয়ে ধারণা প্রদান করা প্রয়োজন। অর্থাৎ বাংলাদেশে নির্মিত চলচ্চিত্রে নৃগোষ্ঠী এবং তাদের জীবনযাপন বা জনসংস্কৃতি এই গবেষণার আলোচ্য বিষয়। সেই বিবেচনায় এই চলচ্চিত্রদ্বয় (*মর ঠেংগাড়ি* ও *Kalpona… Not Imagination*) গবেষণার উপাত্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। যেখানে দেখানো হয়েছে যে নির্বাচিত চলচ্চিত্রদ্বয়ে 'বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্র' হয়ে ওঠার সকল বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বিধায় *মর ঠেংগাড়ি* ও *Kalpona… Not Imagination* চলচ্চিত্রদ্বয় এই গবেষণার উপাত্ত হিসাবে নির্বাচন যৌক্তিক এবং বিশ্ব-চলচ্চিত্র ও দেশীয় চলচ্চিত্র সংস্কৃতির নতুন পাঠ নির্মাণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয়। নিম্নে পর্যায়ক্রমে '*মর ঠেংগাড়ি*' ও "*Kalpona*"… *Not Imagination* চলচ্চিত্রে নৃগোষ্ঠী উপস্থাপনকৌশল বিশ্লেষণপূর্বক উপস্থাপন হলো-

মর ঠেংগাড়ি (২০১৫)

একজন চাকমা যুবকের জীবনসংগ্রাম ও পাহাড়ি জীবন বাস্তবতার চলচ্চিত্র *মর ঠেংগাড়ি* বা *আমার বাইসাইকেল* (২০১৫)। নৃগোষ্ঠী যুবক কমল চাকমা। সে শহরে কাজ করত, কিন্তু একদিন তার চাকরি চলে যায়। তখন সে প্রায় নিঃস্ব হয়ে একটি সাইকেল নিয়ে তার পাহাড়ের জন্মভূমিতে ফিরে আসে। বাড়িতে ফিরে আসার পর কমলের ছেলে তার বাবাকে ফিরে পেয়ে খুশি হয়। তবে কমলের কাছে সঞ্চয় বলতে একটি বাইসাইকেল ছাড়া কিছুই ছিল না। পরিবারে অনেক অভাব-অনটন। কিন্তু কমল নতুন চাকরির জন্য আর শহরে ফিরে যেতে চায় না। সে জীবন নির্বাহ করার জন্য এই বাইসাইকেল দিয়েই কাজ শুরু করে। সে সাইকেল দিয়ে বিভিন্ন পণ্য এবং মানুষকে নিয়ে যাতায়াত শুরু করে। এভাবেই সে তার পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে। কিন্তু একদিন এক দুর্ঘটনা ঘটে। সেই দুর্ঘটনায় তার সাইকেল থেকে একজন আরোহী পড়ে গিয়ে আহত হয়। পরে কারবারির নেতৃত্বে বিচারে কমলের ১০০ টাকা জরিমানা করা হয় এবং তিনি কেবল পণ্য বহন করতে পারবেন, মানুষ আর বহন করতে পারবেন না এমন সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। সবই ঠিকঠাক চলছিল। এর একদিন পর কিছু লোক তার কাছে চাঁদা দাবি করলে কমল তা দিতে অস্বীকার করে। এক রাতে ঘুম থেকে উঠে কমল দেখে তার সাইকেলটি ঘরের সামনে নেই। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে বাড়ির পাশে নিচু স্থানে ভাঙ্গা অবস্থায় বাইসাইকেল পড়ে থাকতে দেখে। এরপর সেই সাইকেল নিয়ে শহরের দিকে রওনা দেয় ঠিক করার জন্য। এমন সময় যাত্রাপথে কমল দেখতে পায় বিপরীত দিক থেকে আসা নৌকাগুলোতে নতুন বাইসাইকেল, টেলিভিশন সেট এবং একটি মোটরসাইকেল তাদের পাহাড়ি গ্রামের দিকে আসছে। এখানে চলচ্চিত্রটি সমাপ্ত হয়।

চলচ্চিত্রটিতে অভিনয় করেছেন- কমল মণি চাকমা (কমল চরিত্রে), ইন্দিরা চাকমা (দেবী চরিত্রে), উ চিং হ্লা রাখাইন (দেবু চরিত্রে), বিনয় কান্তি চাকমা (কারবারি চরিত্রে), জয় শান্তি চাকমা (নেবু চরিত্রে) সুভাস চাকমা (নৌকা চালক চরিত্রে), আনন্দ চাকমা, সোহাগ চাকমা, মিন্টু চাকমা, জীবন চাকমা প্রমুখ। চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেছেন অং রাখাইন।

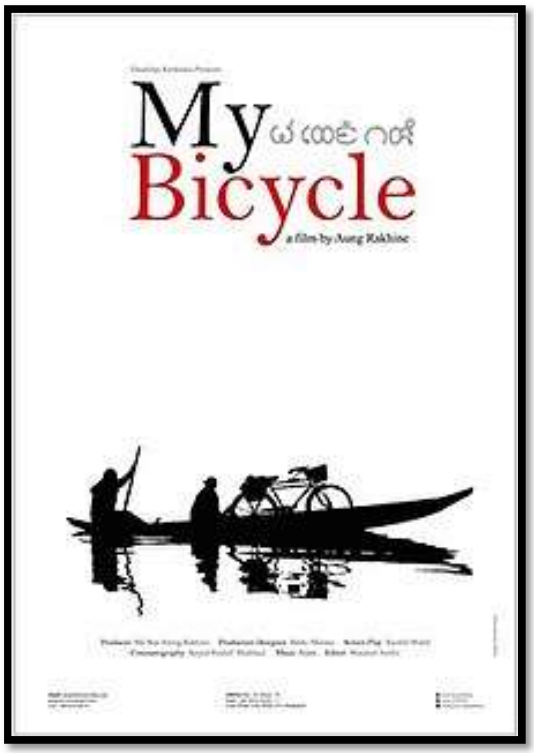

চিত্র ১: *মর ঠেংগাড়ি* (*My Bicycle*) চলচ্চিত্রের পোষ্টার।

মর ঠেংগাড়ি চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু পরিপ্রেক্ষিত ভেদে ভিন্নভাবে আলোচনার সুযোগ থাকলেও এই গবেষণা শিরোনামের সাথে সঙ্গতি রেখে বলা যায় - পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত নৃগোষ্ঠী জীবন ও সংগ্রাম এই চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু। পূর্ণাঙ্গ নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্র বলতে যা বোঝায় তা এই চলচ্চিত্রের মধ্যে বিদ্যমান। পার্বত্য অঞ্চলের নৃগোষ্ঠী জীবন, ধর্ম, ভাষা, অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থা, বাসস্থান, পরিবেশ, সংগ্রাম তথা সার্বিক নৃগোষ্ঠী জনসংস্কৃতি এই চলচ্চিত্রে উঠে এসেছে। নৃগোষ্ঠী জনসংস্কৃতির সার্বিক চিত্র প্রতিনিধিত্বমূলক ভাবে এই চলচ্চিত্রে উঠলেও গবেষণার সুবিধার জন্য পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত চাকমা জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি এই চলচ্চিত্রের কিভাবে উঠে এসেছে তা সুনির্দিষ্টভাবে উক্ত জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে আলোচনা অধিকতর যৌক্তিক বলে বিবেচিত হয়।

মর ঠেংগাড়ি চলচ্চিত্রে একটি দরিদ্র চাকমা পরিবারের সংগ্রাম দেখানো হয়েছে। পরিবারের প্রধান কমল নামের একজন যুবক, যার পূর্বপুরুষের বসতভিটা কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কারণে পানির নিচে তলিয়ে গেছে। ঐতিহাসিক বিবেচনায় ১৯৬০-এর দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে তৈরি হওয়া কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কারণে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামের ৪০ ভাগ কৃষি জমি পানির নিচে

তলিয়ে যায়। পাহাড়ের ভাঁজেভাঁজে সমতল ভূমিতে বসবাসরত লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে।[১৬] উদ্বাস্তু জনসংখ্যার বৃহত্তর একটি অংশ দেশের সীমানা পাড়ি দিয়ে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করে। আর যারা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারত বা মিয়ানমারে যায়নি তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন পাহাড়ের উপরে আশ্রয় নেয়। নতুন করে ঘর বেঁধে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে। সে রকমই একটি পরিবারের সদস্য কমল। কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ-এর কারণে বাস্তুচ্যুত হওয়া মানুষগুলোর দুঃখ-কষ্টের অন্যতম কারণ কাপ্তাই লেক। চলচ্চিত্রের শুরুতে স্টাবলিশমেন্ট শটের মাধ্যমে কাপ্তাই লেক দেখানো হয়েছে। কাপ্তাই লেকের বিশালতা ও সৌন্দর্যের পাশাপাশি এর তলদেশে থাকা অতীত ইতিহাস খুঁড়ে বের করে দর্শককে তা দেখানোর প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। নান্দনিক চলচ্চিত্র কৌশল হিসেবে দেখা যায় কাপ্তাই লেকের বুকে জলকে দ্বিখণ্ডিত করে সামনে এগিয়ে আসছে নৌকার অগ্রভাগ। এরপর চলচ্চিত্রের প্রথম সংলাপের আলোচ্য বিষয় হিসেবে উঠে আসে কাপ্তাই লেকের তলদেশে কোথায় কার বাড়ি ছিল, কেমন ছিলো তাদের জীবন ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রসঙ্গ। পূর্ববর্তী কাপ্তাই লেকের বিশালতা দেখা গেলেও এই বিশালত্বের নিচে লুকিয়ে আছে ঐতিহাসিক দুঃখ-ঘোর-ক্লান্ত বাস্তুচ্যুত হওয়ার ইতিহাস। চলচ্চিত্রটি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর বাস্তুচ্যুত হওয়ার ইতিহাস থেকে শুরু হয়ে বর্তমান সময়কে স্পর্শ করে গেছে।

নৌকায় যেতে যেতে কমল যখন পানিতে হাত ডুবিয়ে জল নাড়াচাড়া করতে থাকে তখন ক্লোজ শটে কমলের হাত, জল এবং নৌকার পার্শ দেখা যায়। সাধারণত এরকম স্বচ্ছ জলধারা দেখে যেকোনো পরিণত ব্যক্তির ভেতরেও শিশু মন জেগে উঠবে, ইচ্ছা করবে তাতে হাত দিয়ে পানি নাড়াচাড়া করতে। এটি মানুষের ভেতরে লুকিয়ে থাকা শৈশব চেতনার বহিঃপ্রকাশ। এর মাধ্যমেই কমলের মনে উদয় হয় জলের নিচে তলিয়ে যাওয়া তার পূর্বপুরুষের বসতভিটার কথা। ক্লোজ শট থেকে মাস্টার শট বা কম্পোজিট শটের মাধ্যমে কাপ্তাই লেকের জল দিয়ে কমলের মুখ ধৌত করা দেখানো হয়। চোখে মুখে পানি দিয়েই কমল আবার বিস্তৃত জলরাশির দিকে তাকায়। যেন সে তার চোখে মুখে লেগে থাকা শহুরে ধূলিকণা ও নাগরিক স্মৃতিচিহ্ন ধুয়ে ফেলে। 'শহুরে নাগরিক মানুষে'র খোলস ছেড়ে হয়ে ওঠে কাপ্তাই লেকের জলে অতীত-হারানো বন-প্রকৃতিঘনিষ্ট এক পাহাড়ি মানুষ। তারপর ফিরে যায় তার অতীতে। কমলের অতীত ইতিহাস স্মৃতিতে হানা দেয়। সে স্মৃতিকাতর হয়ে নৌকার মাঝিকে প্রশ্ন করে, "আচ্ছা দাদা তোমার মনে আছে কি এখানে আমার দাদা দাদির বাড়ি ছিল। ঐদিকে কবরস্থান ছিল, মনে আছে?"

পরিচালক যেন দর্শককে অতীত ইতিহাসের কবর খুঁড়ে দেখাতে চাচ্ছেন বাস্তবতার ভয়াবহতা। দর্শককে নিয়ে প্রবেশ করছেন গল্পের ছলে নিজেদের ঐতিহ্যময় সমৃদ্ধ এক অতীতে। প্রশ্ন-উত্তরে গল্প বলার ছলে ইতিহাস উপস্থাপনের কৌশল প্রয়োগ এই দৃশ্যে উঠে আসে। কমলের কথা শেষ হলে নৌকার মাঝি তাকে যেন আরেকটু যাচাই করে আরো অতীত কথা স্মরণ করিয়ে দিতে প্রশ্ন করছে নৌকা চালক- "তোমার আর কিছু মনে নেই?" কমলের সব স্মরণে আছে। তাই সে বলে, কমল- "হ্যাঁ আমার মনে আছে, রাজবাড়িটা ঐদিকে ছিল, আর ওদিকে কিছু ঝাড় জঙ্গল ছিল।"

কথোপকথনের মধ্য দিয়ে দর্শককে খানিকটা ইতিহাস সচেতন করে দিয়ে চলচ্চিত্র দেখার জন্য প্রস্তুত করে দিলেন পরিচালক। অর্থাৎ এই চলচ্চিত্রের জন্য কিছুটা ইতিহাস সচেতন হওয়া

প্রয়োজন। জানা থাকা দরকার পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জীবনসংগ্রাম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে। নতুবা এই চলচ্চিত্র অনেকের কাছে ভুল সংবাদের কারণ হতে পারে। কথা শেষ করে কমল আবার ফিরে তাকায় বিস্তৃত জলরাশির দিকে। লং-শটে কাপ্তাই লেকের উপর ভাসমান এই নৌকায় দু'জন মানুষ এবং একটি বাইসাইকেল দেখা যায়। শট-কাট করে সাইকেলের পয়েন্ট অব ভিউ থেকে আমরা দেখি কমল আবার প্রশান্ত-এক্সপ্রেশন নিয়ে নৌকা থেকে উঠে সাইকেলের দিকে এগিয়ে আসছে। পরম যত্নে সাইকেলের শরীরে হাত বুলিয়ে দেয়। সাইকেলের বেলে হাত বুলিয়ে দেয়ার সময় এক্সট্রিম ক্লোজ শটে সেটা দেখানো হয়। সাইকেল যে পরবর্তী অংশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠতে যাচ্ছে, তার বার্তা পাওয়া যায়। সাইকেলের বেল বেজে ওঠে এবং দৃশ্যের সমাপ্তি হয়। অর্থাৎ ঘাটে পৌঁছে গেছি আমরা। এতক্ষণ ধরে চলচ্চিত্রের যে প্রাক্‌কথন বা ভূমিকা উপস্থাপন করলেন পরিচালক, এখন সেটা সমাপ্ত হলো। এবার আমাদের বর্তমান সময়ে নামতে হবে নতুন আরেক গল্প শোনার জন্য।

চিত্র ২: *মর ঠেংগাড়ি* (*My Bicycle*) চলচ্চিত্রের একটি স্থিরচিত্র।

অং রাখাইন নির্মিত *মর ঠেংগাড়ি* চলচ্চিত্রে নৃগোষ্ঠী জীবন ও সংস্কৃতি উঠে এসেছে। উঠে এসেছে চাকমা জনজীবন ও তাদের সর্বপ্রাণবাদী বৌদ্ধ ধর্মীয় কৃত্য, মদ জগরা, চাকমা জনগোষ্ঠীর গান, তাদের পোশাক, বিচার ব্যবস্থা, পাহাড়ি অঞ্চলের প্রতিবেশ প্রভৃতি। পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসরত নৃগোষ্ঠী জনজীবনের যে সকল উপাদান *মর ঠেংগাড়ি* চলচ্চিত্রে উঠে এসেছে তা সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

- নৃগোষ্ঠী সদস্য হিসেবে চলচ্চিত্রে নৃগষ্ঠীর অভিনয়শিল্পী;
- নৃগোষ্ঠী ভাষা;
- নৃগোষ্ঠী ধর্ম ও সর্বপ্রাণবাদী কৃত্য;
- নৃগোষ্ঠী কৃষি উৎপাদন ও আর্থনৈতিক জীবন ব্যবস্থা;

- নৃগোষ্ঠী সমাজব্যবস্থা;
- পারিপার্শ্বিক ভূ-রাজনৈতিক প্রতিবেশ;
- মদ জগরা ও দাবা দ্রব্য;

চিহ্নিত বিষয় বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে বিশ্লেষণ করা হলো:

• নৃগোষ্ঠী সদস্য হিসেবে চলচ্চিত্রে নৃগোষ্ঠীর অভিনয়শিল্পী

মর ঠেংগাড়ি চলচ্চিত্র যেহেতু চাকমা জনগোষ্ঠীর জীবন সংগ্রাম নিয়ে নির্মিত তাই এখানে চাকমা জনগোষ্ঠীর মানুষের উপস্থিতি স্বাভাবিক। চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত সকল চরিত্রই নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এখানে কোন বাঙালি অভিনয় শিল্পী দিয়ে অভিনয় করানো হয়নি। চলচ্চিত্রের পর্দায় উপস্থিত প্রতিটি শিল্পীই মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। চাকমা জনগোষ্ঠীর জীবন সংগ্রাম নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হলেও দু'একটি চরিত্রে অন্য জনগোষ্ঠীর মানুষ অভিনয় করেছন। যেমন দেবু চরিত্রে অভিনয়কারী শিশু শিল্পী উ চিং হ্লা রাখাইন জনগোষ্ঠীর মানুষ, আ চিং মারমা নামের আরেকজন মারমা জনগোষ্ঠীর শিল্পীও এখানে অভিনয় করেছেন। তবে তারাও মঙ্গোলীয় নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হওয়ায় দর্শকের দৃষ্টিতে চাকমা এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠীর অভিনয়শিল্পীকে পৃথক করা সম্ভব নয়। ফলে বাংলাদেশে নির্মিত অপরাপর চলচ্চিত্রে যেখানে নৃগোষ্ঠী চরিত্রে বাঙালি অভিনয় শিল্পী কর্তৃক অভিনয় উপস্থাপন করতে দেখা যায়, যা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু, তা এই চলচ্চিত্রে পরিলক্ষিত হয়নি। এ কারণে এই চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশে নির্মিত অপরাপর নৃগোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র থেকে স্বতন্ত্র এবং মৌলিক।

• নৃগোষ্ঠী ভাষা

মর ঠেংগাড়ি চলচ্চিত্রে পূর্ণাঙ্গভাবেই চাকমা ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যান্য নৃগোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রের তুলনায় এই চলচ্চিত্র অনেক বেশি বাস্তব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে চাকমা জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা ব্যবহারের কারণে। এমনকি শিশু শিল্পী উ চিং হ্লা রাখাইনকেও চাকমা ভাষায় এই চলচ্চিত্রে কথা বলতে দেখা যায়।

• নৃগোষ্ঠী ধর্ম ও সর্বপ্রাণবাদী কৃত্য

চাকমা জনগোষ্ঠী বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। পাশাপাশি তারা সর্বপ্রাণবাদী সংস্কৃতি ও কৃত্য পালন করে থাকে। চলচ্চিত্রে দেখা যায় কমল সাইকেল নিয়ে যাত্রী পরিবহনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর উক্ত পরিসেবার মঙ্গল কামনার্থে বাড়িতে বৌদ্ধ ভিক্ষু ডেকে পূজার আয়োজন করে (২৫ মি. ০৮ সে. - ২৬ মি. ৫০সে.)। তখন বৌদ্ধ ভিক্ষুর উচ্চারিত মন্ত্র এবং সম্মুখে থাকা কৃত্যের নৈবেদ্য স্বরূপ নারকেল, কলা, আগরবাতি, গোলাপজল, আমের জুস, প্রভৃতি উপকরণ দেখা যায়। যা সর্বপ্রাণবাদী কৃত্যের অংশ বলেই গবেষকগণ মনে করেন।[১৭] এছাড়াও চলচ্চিত্রে ৪৭ মি.২০ সে. - ৪৭ মি.৫৬ সে. পর্যন্ত দৃশ্যে কার্বারী কাকা ও কমলের কথোপকথনের দৃশ্যে উঠে আসে বিজু উৎসবের প্রসঙ্গ। যেখানে কার্বারী কাকা বিজু উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কমলকে কিছু অর্থ দান করতে বলেন। বিজু চাকমা জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর সামাজিক ও কৃত্যমূলক অনুষ্ঠান। পুরাতন বছরকে বিদায় এবং নতুন বছরকে বরণ উপলক্ষে চাকমা সমাজের মানুষ একত্র হয়ে সামাজিক ও

ধর্মীয় কৃত্যমূলক অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। সেখানে উক্ত সমাজের সকলে নিজের সামর্থ্যানুযায়ী অংশগ্রহণ করে। চাকমা সমাজের ঐতিহ্যবাহী এই উৎসবের বিষয়টিও চলচ্চিত্রে উঠে এসেছে।

চিত্র ৩: *মর ঠেংগাড়ি* (*My Bicycle*) চলচ্চিত্রে কৃত্যমূলক প্রার্থনার একটি স্থিরচিত্র।

• নৃগোষ্ঠী কৃষি উৎপাদন ও আর্থনৈতিক জীবন ব্যবস্থা

পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়কেন্দ্রিক জীবন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত জনগোষ্ঠীর আর্থনৈতিক জীবন পরিচালিত হয় পাহাড়কে কেন্দ্র করে। বিশেষ করে পাহাড়ি জুম কৃষি উৎপাদন ও সাধারণ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পেশা এখানকার মানুষের আর্থনৈতিক জীবন ব্যবস্থার প্রধান অনুষঙ্গ। বর্তমান সময়ে পার্বত্য অঞ্চলের অনেক জনগোষ্ঠীর মানুষ উচ্চশিক্ষা গ্রহণপূর্বক দেশ-বিদেশে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। কিন্তু এখনো পার্বত্য অঞ্চলের একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা পাহাড়ি কৃষি-উৎপাদন ও স্থানীয় ব্যবসাকেন্দ্রিক। চলচ্চিত্রটিতে দেখানো হয়, কমল শহরে চাকরি করার সময় ৬ মাস বেতন পায়নি। এই সময় বাড়িতে টাকা পাঠাতে পারেনি। কিন্তু তার স্ত্রী দেবী এই ছয় মাস পাহাড়ি কৃষি ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে তার পরিবার রক্ষা করেছে। এমনকি চলচ্চিত্রে আমরা দেখতে পাই কমল বাড়িতে ফিরে আসার পরে যখন তার আয়-রোজগারের কোন ব্যবস্থা নেই, তখন দেবী পাহাড়ি জুম ফসল সংগ্রহ করে এনে সংসারে সকলের খাবারের ব্যবস্থা করে। চলচ্চিত্রের ২১ মি.২৫ সে.- ২১ মি.৩০ সেকেন্ড পর্যন্ত দৃশ্যে কমল তার ছেলে দেবুকে বাড়ি ফিরে এসে জিজ্ঞেস করে,

কমল - "দেবু তোমার মা কোথায় গেছে"
দেবু - "জুমে গেছে"

এরপর দেবীকে আমরা দেখতে পাই ঝুড়িতে শাকসবজি নিয়ে বাড়িতে আসতে। এবং আয়-রোজগারবিহীন এই বৈরী সময়ে পরিবারের খাবার আসছে পাহাড়ের জুম ভূমি থেকে। অর্থাৎ প্রচণ্ড প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও পাহাড় এই জনগোষ্ঠীকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এমনকি চলচ্চিত্রে দৃশ্যমান অধিকাংশ পেশাজীবী মানুষের পেশাই কৃষি সংশ্লিষ্ট। চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত জনগোষ্ঠীর কেউ কেউ তাদের উৎপাদিত কলা, আনারস, বা অন্যান্য কৃষি পণ্য নিয়ে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতে যায়। অর্থাৎ তারা কৃষি সংশ্লিষ্ট ফসল নিয়ে ব্যবসায় জড়িত। পাশাপাশি বাজারে ছোট ছোট দোকান বা ব্যবসায়ী শ্রেণিও রয়েছে। সেখানে নতুন পেশাজীবী হিসেবে কমল পরিবহন সেবা নিয়ে উপস্থিত হয়। পাহাড়ি জনজীবনে কৃষি-উৎপাদন ও স্থানীয়-ব্যবসা প্রধান অর্থ উপার্জনকারী মাধ্যম তা এই চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত হয়েছে। একই সাথে নতুন পেশাজীবী শ্রেণির উদ্ভবের সম্ভাবনার ইঙ্গিতও পাওয়া যায় চলচ্চিত্রের শেষ দৃশ্যে যখন নতুন বাই সাইকেল, মোটর বাইক পাহাড়ি জনপদে প্রবেশ করে।

- **নৃগোষ্ঠী সমাজব্যবস্থা**

যৌথ সমাজকাঠামোয় অভ্যস্ত চাকমা জনগোষ্ঠীর মানুষ গ্রামকে বলে 'আদাম'। আর গ্রামের প্রধানকে বলে 'কার্বারী'। কার্বারী গ্রামের লোকদের দ্বারা নির্বাচিত হয়। গ্রামের ছোটখাটো বিবাদ বা সমস্যা নিষ্পত্তি করে থাকেন একজন কার্বারী। এছাড়াও চাকমাদের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন কার্বারী।[১৮] চাকমা সমাজের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি 'কার্বারী' পদবীর একটি চরিত্র এই চলচ্চিত্রে দেখা যায়। যে চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিনয় কান্তি চাকমা। চলচ্চিত্রে দেখা যায় কমলের সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে একজন আহত হলে কার্বারীর কাছে তার বিচার দাবি করে। তখন কার্বারী পাড়ার মানুষদেরকে সঙ্গে নিয়ে বসে সামাজিক প্রথা অনুযায়ী বিচার করে অর্থাৎ চাকমা সমাজে কার্বারীর যে দায়িত্ব এবং ক্ষমতা রয়েছে তা এই চলচ্চিত্রে দৃশ্যমান হয়। পাশাপাশি বিজু উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠান আয়োজনের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় কার্বারী চরিত্রের মধ্যে। তিনি কমলের সঙ্গে দেখা করে বিজু উৎসব আয়োজনে তার অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করেন। সেই উৎসব উপলক্ষে তাকে সামান্য কিছু দান করে অংশগ্রহণ করতে বলেন। পাশাপাশি কমল যখন শহর থেকে ফিরে আসে, তখন কমল কি করবে, না-করবে এসব নিয়ে তাকে পরামর্শ দেয়। অর্থাৎ পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত চাকমা জনগোষ্ঠীর সমাজবদ্ধ জীবনযাপন এবং পরস্পরের কাছাকাছি অবস্থান, তাদের সমাজকাঠামোয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও পরামর্শ তাদের সামষ্টিক জীবনাচরণের বহিঃপ্রকাশ। যা এই চলচ্চিত্রে পরিচালক তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণভাবে।

- **পারিপার্শ্বিক ভূ-রাজনৈতিক প্রতিবেশ**

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক প্রতিবেশ বাংলা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় ভিন্ন। প্রায় সময়ই দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক চাঁদাবাজির ঘটনা উঠে আসে। এই বিষয়টিকে পরিচালক চলচ্চিত্রে উপস্থাপন করেছেন। কমল যখন আর্থিক দুরবস্থা দূর করার জন্য তার সাইকেলে যাত্রী এবং পরবর্তীকালে পণ্য পরিবহনণ শুরু করে তখন তার অর্থনৈতিক অবস্থা ভালোর দিকে যেতে শুরু করে। এমন সময় তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়

একদল পাহাড়ি যুবক। তাদের পরিচয় চলচ্চিত্রে সুস্পষ্ট না করা হলেও এটা বোঝা যায় যে এরা কারা। তারা কমলের কাছে কিছু টাকা দাবি করে। কমল সে টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। পরদিন ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে কমল দেখে ঘরের সঙ্গে রাখা তার বাইসাইকেলটি নেই। পরে বাড়ির পাশে খাদে ভাঙ্গা অবস্থায় সাইকেলটি খুঁজে পায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন সুন্দর, তেমনি সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিতরে অসুন্দর রাজনৈতিক পরিবেশ বিরাজ করে। যা এই চলচ্চিত্রে পরিচালক কৌশলী হাতে উপস্থাপন করেছেন।

চিত্র ৪: *মর ঠেংগাড়ি* (*My Bicycle*) চলচ্চিত্রে মা-ছেলের ভীত-সন্ত্রস্ত মুখ।

আরো অনেক জটিল শ্বাসরুদ্ধকর ভূ-রাজনৈতিক প্রতিবেশের চিত্র স্বল্প সময়ের জন্য উপস্থাপন করেছেন পরিচালক। যা দর্শনে যেকোন সচেতন দর্শকের মনে নতুন ভাবনা ও প্রশ্নের উদয় হবে। ভাবনা-চিন্তার উদ্রেককারী এমন ভূ-রাজনৈতিক প্রতিবেশ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অথচ সংক্ষিপ্ত পরিসরে পরিচালক 'ফোর্থ সিনেমা কনসেপ্টে'র এই চলচ্চিত্রে উপস্থাপন করেছেন।

- **মদ জগরা ও দাবা দ্রব্য**

মদ জগরা চাকমা সমাজে সুপরিচিত পানীয়। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে তারা এগুলো বাড়িতে তৈরি এবং পান করে থাকে। অতিরিক্ত মদ জগরা পান চাকমা তথা পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত নৃগোষ্ঠীর আর্থনৈতিক অবনতির জন্য দায়ী বলে অনেকে ধারণা করেন।[১৯] চলচ্চিত্রে দুইটি দৃশ্যে মদ্যপানের বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে। কমলের বাইসাইকেলের চাকা নষ্ট হলে সেটা নিয়ে সে যখন বাজারে যাচ্ছিল ঠিক করার জন্য তখন (৪০ মি.২৮সে.- ৪১ মি.১৩ সে. পর্যন্ত) দু'জনকে দেখা যায় মাতাল হয়ে পড়ে থাকতে। মাতাল অবস্থায় তারা বিভিন্ন কথা বলতে থাকে। দ্বিতীয় আরেকটি দৃশ্য দেখা যায় (৪৮মি.৩৭ সে.-৫০মি.৪০ সে.) কমল সাইকেল নিয়ে যাওয়ার পথে তিনজন মদ্যপানরত যুবক তাকে বসতে বলে তাদের আসরে। কমল যুক্ত হয় এবং

আনন্দ বিনোদনের সঙ্গে মদ পান করে থাকে। মদ পান নৃগোষ্ঠীর আনন্দ বিনোদনের অংশ। যা এই চলচ্চিত্রে দেখা গেছে।

পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত চাকমাসহ অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মানুষ দাবা বা বাঁশের তৈরি বিশেষ ধরনের ধূমপান করার যন্ত্র নিজেরাই তৈরি ও ব্যবহার করে থাকে। অবসর সময়কালে কিংবা কাজের ফাঁকে তারা দাবা বা হুকায় দম নেয়। তামাক জাতীয় দ্রব্য এর মধ্যে দিয়ে আগুন ধরিয়ে তার ধোঁয়া গ্রহণ করে। এটা নাগরিক সমাজের প্রচলিত সিগারেট বা বিড়ির একটি সনাতন অথবা নৃগোষ্ঠী সংস্করণ বলা যায়। চাকমা জনজীবনের সঙ্গে দাবা বা হুকা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এটা তাদের জনসংস্কৃতির অংশ। চলচ্চিত্রের বিভিন্ন স্থানে একাধিক কোরাস চরিত্রকে এবং কমলের আয়-রোজগার বৃদ্ধি পাওয়ার পরে ঘরে বসে অবসর যাপনের সময় এই হুকা বা দাবায় টান দিতে দেখা যায়। যা চাকমা জনজীবনকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরতে অন্যতম উপাদান হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

মর ঠেংগাড়ি চলচ্চিত্রটি একজন নৃগোষ্ঠী পরিচালক কর্তৃক নির্মিত, নৃগোষ্ঠী জীবন সংগ্রাম ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের চলচ্চিত্রিক শিল্পভাবনার নান্দনিক প্রকাশ। এখানে একটি জনগোষ্ঠীর সার্বিক জীবন সংস্কৃতির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ যেমন উঠে এসেছে, তেমনি উঠে এসেছে তাদের প্রাত্যহিক জীবনে ছোট ছোট আশা আকাঙ্ক্ষা, পরিশ্রম, সমস্যা, সংকট ও বাস্তবানুগ জীবনব্যবস্থা। সার্বিক বিবেচনায় এই চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের 'নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্রে' 'নৃগোষ্ঠী' উপস্থাপন পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে নতুন ভাবনা ও শিল্পিত প্রয়োগের নান্দনিক বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

"Kalpona"... Not Imagination (২০১৬)

স্বাধীন-ধারার চলচ্চিত্র নির্মাতা সান্তুয়া ত্রিপুরা পরিচালিত *"Kalpona"... Not Imagination* চলচ্চিত্রটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন কবিতা চাকমা ও সান্তুয়া ত্রিপুরা। চলচ্চিত্রটিতে অভিনয় করেছেন জয়তু দেওয়ান, পদ্মিনী চাকমা, মীর রিফাত উস সালেহীন এবং শেখ সজীব ইসলাম।

চলচ্চিত্রটিতে দেখা যায় যে, ঢাকার নাগরিক সমাজে বসবাসরত চাকমা জনগোষ্ঠীর একজন শিক্ষার্থীর দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে যায়। স্বপ্নের মধ্যে সে দেখতে পায় উন্মত্ত কুকুরের হিংস্র শব্দ সিঁড়ি বেয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। স্বপ্নে এই দৃশ্য দেখে তার ঘুম ভেঙে যায়। সে যখন ঢাকার রাস্তায় হাঁটে কালো পোশাকের কেউ একজন তাকে অনুসরণ করতে থাকে। একাধিকবার এমন ঘটনা সে দেখে। লাইব্রেরিতে যায়, বইপত্র নেয়, পড়ে এবং ভাবে। ভাবতে থাকে তার নিজের পার্বত্য অঞ্চলের দুরবস্থা সম্পর্কে। চলচ্চিত্রের আরেকটি চরিত্রে দেখা যায় একজন চাকমা নারীকে। সে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করতে থাকে। ছেলেটি পার্বত্য চট্টগ্রামে তার গ্রামের বাড়িতে যায়। সেখানেও যেন তাকে তাড়া করে ফেরে অদৃশ্য সেই শত্রু। যার আগমনের শব্দ হায়না বা কুকুরের মত। পাহাড়ী গ্রাম-পাড়া ঘুরে সে পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে আত্ম উপলব্ধি করতে পারে। তারপর আবার শহরে ফিরে আসে। তার বইপত্র গুছিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে সংগ্রামী চেতনা বুকে ধারণ করে।

বাংলাদেশে নির্মিত বিকল্পধারার এই স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটিতে শুধু 'নৃগোষ্ঠী উপস্থাপন' নয় বরং এই চলচ্চিত্রটি একজন নৃগোষ্ঠী নির্মাতা কর্তৃক নির্মিত। যার চিত্রনাট্য রচনা করেছেন চাকমা জনগোষ্ঠীর মানুষ। যেখানে অভিনয় করেছেন উক্ত জনগোষ্ঠীর অভিনয়শিল্পী এবং যে চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু আবর্তিত হয়েছে পার্বত্য অঞ্চলের নৃগোষ্ঠী জীবন, সংগ্রাম ও মানবাধিকারের বিষয় নিয়ে।

চিত্র ৫: "*Kalpona*"..... *Not Imagination* চলচ্চিত্রের স্টাবলিশম্যান্ট শটের একটি স্থিরচিত্র।

"*Kalpona*"... *Not Imagination* চলচ্চিত্রটি শুরু হয়েছে একটি স্টাবলিশমেন্ট শট দিয়ে। যেখানে ভাসমান মেঘরাশির নিচে কাপ্তাই হ্রদ। হ্রদ ও আকাশের স্থির একটা শটে কেবল মেঘ ভেসে যাচ্ছে আর ব্যাকগ্রাউন্ডে ভেসে আসছে কুকুরের চিৎকার। দুইবার কুকুরের চিৎকারের মাধ্যমে এই দৃশ্য সমাপ্ত হয়। এই একটি মাত্র দৃশ্য যেখানে কুকুরের শব্দ দিয়ে পরিচালক যে অর্থ তৈরি করার চেষ্টা করেছেন তা সচেতন দর্শকের কাছে কৌতূহলোদ্দীপনা তৈরি করবে। পরের দৃশ্য শুরু হয় একটা পুরাতন পাকা বাড়ির ঘরের ছাদ থেকে। সেখান থেকে ক্যামেরা নেমে এসে বিছানায় ঘুমন্ত রামনকে (জয়তু দেওয়ান) দেখায়। ঘুমন্ত মুখে দুশ্চিন্তার বলিরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্যামেরা কাট করে যে ভবনে সে ঘুমিয়ে রয়েছে সেই ভবনটিকে কাত হয়ে যেতে দেখায়। এক্সপ্রেশনিস্ট ধারার এই ক্যামেরা এঙ্গেলের মাধ্যমে চরিত্রের অবচেতন মনে জমে থাকা বিভিন্ন ট্রমা ও নিপীড়নের অবদমিত যন্ত্রণাকে তুলেধরার চেষ্টা করেছেন পরিচালক। অর্থৎ অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে সে ঘুমাচ্ছে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সময় ব্যাকগ্রাউন্ডে কুকুরের তাড়া করার শব্দ। ক্ষীপ্র কুকুরের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা সামনের দিকে এগুতে থাকে। শট কাট করেই আবার ঘুমন্ত মুখ, মুখে চিন্তার বলিরেখা দেখা যায়। কাট টু কাট শটের মাধ্যমে এবার দেখা যায় দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে কেউ একজন তার ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেটা যে কোন মানুষের পা, তা স্পষ্টভাবে বুঝায় না। কারণ এখানে কোন মানুষের পা দেখা যায় না। তবে ক্যামেরার সাদাকালো চিত্রণের সাথে এভাবে সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠা এবং ব্যাকগ্রাউণ্ডে ক্ষিপ্র কুকুরের শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ভয়ানক এক পরিস্থিতির পূর্বাভাস দেয়। স্বাধীন ধারার স্বল্পদৈর্ঘ্য এই

চলচ্চিত্রটিতে কোন সংলাপ ব্যবহৃত না হলেও ছিল ব্যাকগ্রাউণ্ডে ধারাবর্ণনা। এই ধারাবর্ণনার সূত্রধরে এর বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ যৌক্তিক।

চলচ্চিত্রটির দুটি পর্যায় সাদাকালো এবং রঙিন। শহরের জীবন যাপন, কর্মব্যস্ততা তথা নাগরিক বৈচিত্র্যময় কংক্রিটের নগর সাদাকালো দেখিয়েছেন পরিচালক। অপরদিকে প্রকৃতির নিকটবর্তী পাহাড়, মেঘ, ঝরনা ও পাহাড়ি মানুষ এবং জনজীবনকে উজ্জ্বল, রঙিন করে চলচ্চিত্রের পর্দায় উপস্থাপনের মাধ্যমে পরিচালক ভিন্ন এক বার্তা দিতে চেয়েছেন। শহরের জীবন যাপনে ব্যস্ততা রয়েছে, কংক্রিটের বিশালত্ব রয়েছে, কিন্তু তাতে জীবন্ত প্রাণ নেই। বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের জনজীবন এই কর্মব্যস্ত কংক্রিটের নগরে এসে প্রাণহীন হয়ে ওঠে। সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে চলচ্চিত্রটির পরিচালক জানান, নিষ্প্রাণ এবং অপরের দুঃখ অনুধাবনে ব্যর্থ এই নাগরিক সমাজকে বোঝাতে তিনি সাদাকালো নগর দেখিয়েছেন। অপরদিকে প্রকৃতি ও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর পার্বত্য অঞ্চলের জীবনযাত্রা, ঘরবসতি, মানুষ এবং তাদের সংস্কৃতি উপস্থাপনের সময় তাকে উজ্জ্বল এবং রঙিন করে দেখিয়েছেন। প্রাণ এবং প্রকৃতির মেলবন্ধনে প্রকৃতপক্ষে মানুষ তথা সভ্যতা বেঁচে থাকে। সেই সভ্য জীবনকে সুন্দর ও রঙিন করে উপস্থাপন কল্পে পরিচালকের নান্দনিক এই শিল্প ভাবনা চলচ্চিত্রে অনুসৃত হয়ে থাকতে পারে। মূলধারার গণমাধ্যম বা চলচ্চিত্র মাধ্যমে শহরকে (ঢাকা) যেভাবে দেখতে কিংবা দেখাতে অভ্যস্ত এর বিপরীতে গিয়ে একজন পাহাড়ে বড় হওয়া নাগরিক শহরকে যেভাবে দেখেন বা অনুভব করেন সেই দেখার এবং অনুভবের অনুভূতি চলচ্চিত্রে কালার কনট্রাস্ট এর মাধ্যমে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। এর মাধ্যমেই মূল ধারার চলচ্চিত্র বা মেইনস্ট্রিম মিডিয়া এবং সিনেমার সাথে ফোর্থ সিনেমার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই কালার কন্ট্রাস্টের মাধ্যমে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং সচেতন রাজনৈতিক বক্তব্যের মাধ্যমে *"Kalpona"..... Not Imagination* চলচ্চিত্রটি ফোর্থ সিনেমার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। কারণ নৃগোষ্ঠীর প্রতি মূল ধারার জনগণের যে দৃষ্টিভঙ্গি তার বিপরীতে মূল ধারার নাগরিক জীবনের প্রতি নৃগোষ্ঠী সমাজের যে দৃষ্টিভঙ্গি তা এই চলচ্চিত্রে প্রকাশ হয়েছে। *"Kalpona"..... Not Imagination* চলচ্চিত্রে নৃগোষ্ঠী সংস্কৃতি এবং জীবন সংগ্রাম যে যে উপাদানের আলোকে উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলো হলো-

- নৃগোষ্ঠী চরিত্রের উপস্থিতি;
- নৃগোষ্ঠী রাজনৈতিক সংগ্রাম ও চেতনাগত অবস্থান;
- নৃগোষ্ঠীর বাসস্থান ও ভৌগোলিক অবস্থা;
- নৃগোষ্ঠী সংস্কৃতি ও পোশাক;

চিহ্নিত বিষয়-বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে বিশ্লেষণ করা হবে নৃগোষ্ঠী নৃতত্ত্ব, নৃগোষ্ঠী জনসংস্কৃতি এবং নৃগোষ্ঠী রাজনৈতিক চেতনা ও অবস্থানের আলোকে।

- **নৃগোষ্ঠী চরিত্রের উপস্থিতি**

নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে চাকমা জনগোষ্ঠী জনসংখ্যার দিক থেকে বৃহত্তম। পার্বত্য অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এমনকি শিক্ষা-সংস্কৃতিতে তাদের নেতৃত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

পার্বত্য জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক নেতৃত্বের এক ঐতিহাসিক চরিত্র কল্পনা চাকমা। কল্পনা চাকমা অপহরণকে কেন্দ্র করে নির্মিত এই চলচ্চিত্রে একজন চাকমা যুবক ও চাকমা নারী প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। রামন চরিত্রে অভিনয় করেছেন জয়তু দেওয়ান এবং কল্পনা চামকা চরিত্রে অভিনয় করেছেন পদ্মিনী চাকমা। এছাড়াও এই চলচ্চিত্রের শেষ দিকে (০৯মি. ৩৩ সে.- ১০মি. পর্যন্ত দৃশ্য) পাহাড়ে বসবাসরত বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায়। এর মধ্যে ৫ জন নৃগোষ্ঠী শিশু (২ জন বৌদ্ধভিক্ষুসহ), নৃগোষ্ঠী নারী (চাকমা, মারমা, উসুয়ে), জুম চাষি প্রভৃতি পেশা ও কর্মব্যস্ত নৃগোষ্ঠীর উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায়। যেহেতু নৃগোষ্ঠী জীবন ও রাজনৈতিক মতাদর্শকে কেন্দ্র করে এই চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে সেহেতু এখানে নৃগোষ্ঠী চরিত্রের উপস্থিতি স্বাভাবিক। পাশাপাশি নাগরিক জীবন এবং নাগরিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নৃগোষ্ঠী জীবন উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এই চলচ্চিত্রে নৃগোষ্ঠীর অধিক উপস্থিতি যৌক্তিক ও নান্দনিক। এমনকি বাণিজ্যিক ধারার পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে যেখানে নৃগোষ্ঠী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বাঙালি অভিনয়শিল্পী কর্তৃক অভিনয় উপস্থাপনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তার বিপরীতে শিল্পমান নির্ভর ও বক্তব্যমূখ্য এই স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে পূর্ণাঙ্গ ভাবেই নৃগোষ্ঠী সংস্কৃতি, জীবন সংগ্রাম ও রাজনৈতিক চেতনাগত অবস্থান স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।

• নৃগোষ্ঠী রাজনৈতিক সংগ্রাম ও চেতনাগত অবস্থান

পাহাড়ি নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করতো কল্পনা চাকমা। তাকে মধ্যরাতে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা আজ সর্বজনজ্ঞাত । যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও চেতনা পাহাড়ে বসবাসরত জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন কল্পনা চাকমা, তা ব্যাহত হয় কল্পনা চাকমা অপহরণের মাধ্যমে। তবে তা থেমে যায়নি, বন্ধ হয়ে যায়নি চিরদিনের মত। সময়ের বিবর্তনে এখন তারা অনেকেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছে। শহর ও নাগরিক জীবনে পদচারণা করে শিখে নিয়েছে রাজনৈতিক কূটকৌশল ও চিন্তাধারার মূল সূত্র আবিষ্কারের কৌশলপূর্ণ পদ্ধতি। তারা এখন তাদের সংগ্রামী চেতনার কথা, রাজনৈতিক বক্তব্য চালচ্চিত্রিক শিল্পকৌশলে নান্দনিক ভাবে প্রকাশ করতে পারে। শিল্পের বহুমাত্রিক প্রকাশভঙ্গির কৌশল এখন তারা আয়ত্ত করেছে। শিল্পের পথ ধরে তারা তাদের বক্তব্য পৌঁছে দিচ্ছে দেশ ও বিদেশের মানুষের কাছে। সচেতন রাজনৈতিক চিন্তার শিল্পিত বহিঃপ্রকাশ *"Kalpona"..... Not Imagination* স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটি। চলচ্চিত্রটিতে সাবটাইটেল ও ভয়েস ওভার ব্যবহার করা হয়েছে ইংরেজি ভাষায়। মূলত আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উপস্থাপনের নিমিত্তে ইংরেজি ভাষার প্রয়োগ।[২০] চলচ্চিত্রের মূল বক্তব্য কল্পনা চাকমা বিষয়ে হলেও এর আরো অনেক শাখা বক্তব্য রয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে কেন তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, কেন তারা তাদের অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হয় কিংবা কেন তাদের সংগ্রাম করা উচিত, কেন মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত তাদের প্রতি অন্যায় নিপীড়নের সঠিক ইতিহাস। তারা এই ভূখণ্ডে বসবাস করেও যেন স্বাধীন দেশের পূর্ণাঙ্গ নাগরিকের অধিকার পাচ্ছে না। তারা দমবন্ধকরা সামরিক আস্তানার মধ্যে বেড়ে উঠছে। অথচ বাংলাদেশের মানুষ কখনোই দীর্ঘকাল সামরিক শাসন মেনে নেয়নি। পাকিস্তান আমলের সামরিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, সেই স্বাধীন দেশেই তাদেরকে বছরের পর বছর যেন সামরিক শাসনের অধীনে থাকতে হচ্ছে। এটা তাদের

শৈশব-কৈশোরের নির্মল আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেছে। যা তারা ফিরে পেতে চায়, তাদের পূর্বপুরুষের বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত বসতভিটা সেটলার কর্তৃক দখল হয়েছে, পাহাড়ে ক্রমাগত নির্যাতন-নিপীড়ন হয়, ভূমি থেকে উৎখাত করা হয় ভূমিপুত্রদের, এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছাড়া আর কোনো পথ নেই। সেই প্রতিবাদী চেতনা প্রকাশিত হয়েছে এই চলচ্চিত্রে। তাই আমরা শুনতে পাই– "What will happen to the future? and where is it truth, the truth of Victory, the truth of society and your ideology."

এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মানুষকে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করা এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহী করতে উদ্বুদ্ধ করবে:

> Someone chasing me like I am a dog. Who am I actually? Why there are so many states of ideology? Dear there is no Red flag, not even a red balloon that I want to play with them. I want to smile with them. Dear is this the one state where people disappear? Oh dear! Where is my existence? Do I have a fear? this night is it really a Nightmare? Am I screaming from the box? Dare what is happening on the other side of the world? fire, blood shade. let the people know is it really a nightmare or reality.

উল্লিখিত ভয়েস ওভারের সাথে পর্দায় ভেসে ওঠা দৃশ্যকল্প এবং শ্রবণে আঘাত করা শব্দমালা আমাদেরকে ক্রমাগত শ্বাসরুদ্ধকর বদ্ধ পরিবেশে নিয়ে যায়। যেখানে দমবন্ধ হয়ে আসবে রক্তমাংসের মানুষের। পাহাড়ের প্রকৃত পরিস্থিতির নান্দনিক উপস্থাপনকল্পে বিপ্লবী কবিতার ভাষা, সাদাকালোর চলমান চিত্রমালা এবং দুশ্চিন্তা উদ্রেককারী ভয়ার্ত সাউন্ড ইফেক্ট পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে প্রকাশ করে। রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থাপনের অন্যতম দৃষ্টান্ত -"Where are all these revolutions? Oh dear! Why did not resist? Why shall I not racist? "

পাহাড়ের রাজনৈতিক অবস্থা এবং নির্যাতন নিপীড়নের চিত্র চলচ্চিত্রের ভাষায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা এই চলচ্চিত্রের নান্দনিক অভিপ্রায়।

- **নৃগোষ্ঠীর বাসস্থান ও ভৌগোলিক অবস্থা**

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কংক্রিটের নগর এবং সবুজঘেরা পাহাড়ি জনপদের ব্যবধি নির্ণয় করতে পরিচালক চলচ্চিত্রটিকে যথাক্রমে সাদাকালো অংশ এবং রঙিন অংশে উপস্থাপন করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা পাহাড়ি অঞ্চল এবং তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রাণ-প্রকৃতিতে পরিপূর্ণ। সেই প্রাণৈশ্বর্য সম্পন্ন নিরাভরণ প্রকৃতি, প্রতিবেশ ও ভৌগোলিক অবস্থান এবং তাদের নিজেদের বসতবাড়ির দৃশ্য নির্মাণের ক্ষেত্রে রঙিন কালারটোন ব্যবহার পরিচালকের নিজস্ব নন্দন ভাবনার বহিঃপ্রকাশ। নান্দনিক বাস্তবানুগ চলচ্চিত্রিক পরিবেশ বিনির্মাণে পরিচালক রঙিন কালারটোনের পাশাপাশি পাহাড়ি নৃগোষ্ঠী জনজীবনের ভৌগোলিক অবস্থা ও বাসস্থান উপস্থাপন করেছেন। কৃত্রিম স্টুডিও-নির্ভর সেট নয় বরং প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ ও নৃগোষ্ঠী বাসস্থানের দৃশ্য তিনি ধারণ করেছেন সরাসরি। *"Kalpona"... Not Imagination* চলচ্চিত্রে ০:৫:০৬-০:৫:৫০ সেকেন্ড পর্যন্ত বিশাল পাহাড় এবং পাহাড়ের চূড়া দেখা যায়। যে পাহাড়ের ভাঁজেভাঁজে বসবাস করে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ। পাহাড়ের সঙ্গে তাদের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। এই দৃশ্যে মনে হয় কল্পনা চাকমা পাহাড়ের মতো বিশাল ও উন্নত এক ব্যক্তিত্ব। যিনি সমবেত মানুষ তথা পাহাড়ের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছেন। কল্পনা চাকমার

চোখ দিয়ে যখন ছোট ছোট অসংখ্য পাহাড়-টিলা দেখা যায় তখন ক্যামেরা এঙ্গেলের কারণে মনে হয় তিনি দৃষ্টিগ্রাহ্য সকল পাহাড়ের চাইতেও বিশাল। তিনি এই পাহাড়কে নেতৃত্ব দেন। সমবেত পাহাড়ের উদ্দেশ্যে তিনি দাঁড়িয়ে কিছু বলতে চান। কিন্তু চলচ্চিত্রিক দৃশ্যকল্প বিনির্মাণে পরিচালকের যে নান্দনিক ভাবনাই থাকুক না কেন এর বাইরেও পাহাড়ি ভৌগোলিক প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রত্যক্ষ করা যায়। চলচ্চিত্রটির ২য় পর্যায়ে অর্থাৎ ০৬মি.০২সে. - ০৯মি. ০২ সে. এর দৃশ্যে পাহাড়ে বসবাসরত নৃগোষ্ঠীর ঘর-বসতির দৃশ্য উঠে এসেছে। এখানে বাঁশ ও কাঠ দিয়ে নির্মিত উঁচু ঘর দেখা যায়। দেখা যায় পাহাড়ের সাথে মেঘের মিশ্রণ। মেঘ পাহাড়ের পারস্পরিক মিশ্রণটি পাহাড়ি জনজীবনে কৃষি উৎপাদনে অত্যন্ত সহায়ক। চলচ্চিত্রটির ০৯মি. ৩৩সে. - ০৯মি. ৫৯ সেকেন্ড পর্যন্ত দৃশ্যে পাহাড়ে বসবাসরত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ এবং তাদের কর্ম তৎপরতার পাশাপাশি তাদের আবাস গৃহ উঠে এসেছে। এখানে তাদের সংস্কৃতির কিছু অংশ দৃশ্যমান হয়।

• নৃগোষ্ঠী সংস্কৃতি ও পোশাক

চলচ্চিত্রটির কয়েক জায়গায় পাহাড়ি জনসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান তাদের নিজস্ব পোশাক উঠে এসেছে। উঠে এসেছে তাদের কৃষিকর্মের সাথে যুক্ত বিভিন্ন উপকরণ সামগ্রী। এমনকি অলংকার সমৃদ্ধ একজন উসুই (ত্রিপুরা) পৌঢ়া নারীকে দেখা যায় চলচ্চিত্রে। তার গলায় ব্যবহৃত অলংকার দেখে সহজেই নৃগোষ্ঠী ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিহিত নৃগোষ্ঠী নারী বলে প্রতিয়মান হবে। পাশাপাশি পিনন-হাদি পরিহিত নৃগোষ্ঠী নারীকে দেখা যায়। স্বল্পদৈর্ঘ্য এই চলচ্চিত্রের ০৯ মি.৩৩ সে.- ০৯মি. ৫৯ সেকেন্ড পর্যন্ত দৃশ্যে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষকে দেখানোর জন্য পরিচালক স্ট্যাটিক শটে শ্যালো ডেপথ অফ ফিল্ড এবং ডিপ ডেপথ অফ ফিল্ডের সমন্বয়ে নান্দনিক ও অর্থপূর্ণ দৃশ্য ধারণ করেছেন। এই দৃশ্যেই চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বেশি নৃগোষ্ঠী জীবন চিত্র উঠে এসেছে। যা দেখে অপেক্ষায় থাকা মুক্তিকামী অসহায় মানুষের অসহায়ত্ব প্রকাশ পায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত নৃগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি বিস্তৃভাবে উঠে না আসলেও, এই স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে যে বক্তব্য উপস্থাপনের প্রচেষ্টা পরিচালক গ্রহণ করেছেন, তার মাধ্যমে নৃগোষ্ঠী জীবন সংস্কৃতি, চিন্তাকল্প, রাজনৈতিক চেতনাবোধ ও অধিকার আদয়ের সংগ্রামী চিত্র উঠে এসেছে।

চিত্র ৬: *"Kalpona"..... Not Imagination* চলচ্চিত্রে একজন উসুই (ত্রিপুরা) নারী।

এই চলচ্চিত্রটি পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দা কল্পনা চাকমা অপহরণের বিষয়কে ঘিরে আবর্তিত। প্রাপ্ত তথ্যমতে কল্পনা চাকমা হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। ১৯৯৬ সালের ১১ জুন মধ্যরাতে তার বাড়ি থেকে পরিবারের সদস্যদের সামনে তাকে অপহরণ করা হয় বলে জানা যায়।[২১] বহুবছর কেটে গেলেও এখনো তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। সেই সময় এই অপহরণ বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কল্পনা চাকমার অপহরণ, বিচার না পাওয়া এবং পাহাড়ে সার্বিক রাষ্ট্রনৈতিক সিদ্ধান্তের ফলে সেখানে বসবাসরত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতি অমানবিক ও বিমাতাসুলভ আচরণ তাদেরকে আন্দোলন সংগ্রামের পথ বেছে নিতে বাধ্য করে। এখনো সেই অপহরণের তদন্ত কাজ শেষ হয়নি, শুরু হয়নি বিচারিক প্রক্রিয়া।[২২] পাশাপাশি প্রতিটি তরুণ-তরুণীর পেছনে ধাওয়া করে এক অজানা আতঙ্ক। সেই আতঙ্ক থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের পূর্ণাঙ্গ নাগরিক হিসেবে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তারা কেন হবে না সংগ্রামী, কেন ফিরে যাবে না মাটির কাছে, মানুষের কাছে। কারণ পাহাড়ের প্রতিটি মানুষ স্বাধীন রাষ্ট্রের পূর্ণাঙ্গ নাগরিকের সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে স্বাধীন ভাবে বেঁচে থাকতে চায়। তাদের সেই স্বাধীনতার সুখ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম প্রয়োজন। এমনই যৌক্তিকতা ও ক্ষুরধার বক্তব্য রাজনৈতিক কবিতার ছন্দে প্রকাশের নিমিত্তে এবং সচেতন রাজনৈতিক অবস্থান তুলে ধরার প্রয়াসে ফোর্থ সিনেমা ধারায় নির্মিত হয়েছে এই চলচ্চিত্র।

বাংলাদেশের 'নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্রে' 'নৃগোষ্ঠী' উপস্থাপন কৌশল বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের 'নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্রে' 'নৃগোষ্ঠী' উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যে প্রবণতা বা কৌশল চিহ্নিত করা যায় সেগুলো হলো:

- নৃগোষ্ঠী জনসংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট গল্পে নৃগোষ্ঠী অভিনয়শিল্পী এবং তাদের বহুমাত্রিক সংস্কৃতির উপাদানসমূহ প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের 'নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্রে' 'নৃগোষ্ঠী' উপস্থাপন;
- নৃগোষ্ঠী জনজীবন সম্পর্কিত ঘটনাসমূহ ব্যবহার পূর্বক বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের 'নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্রে' 'নৃগোষ্ঠী' উপস্থাপন;
- বাংলাদেশের 'নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্রে' 'নৃগোষ্ঠী' উপস্থাপন কৌশল হিসেবে চলচ্চিত্রিক শিল্পকৌশল বা চলচ্চিত্রের নন্দনভাষা ও চিহ্নবিজ্ঞানের প্রয়োগ।

নির্বাচিত বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্রদ্বয়ে নৃগোষ্ঠী উপস্থাপনের ক্ষেত্রে উল্লিখিত কৌশল বা প্রবণতাসমূহ মোটা দাগে চিহ্নিত করা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লিখিত কৌশলসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক একটি সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। এমতাবস্থায় উল্লিখিত কৌশলসমূহ বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক।

- **নৃগোষ্ঠী জনসংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট গল্পে নৃগোষ্ঠী অভিনয়শিল্পী এবং তাদের বহুমাত্রিক সংস্কৃতির উপাদানসমূহ প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের 'নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্রে' 'নৃগোষ্ঠী' উপস্থাপন**

পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ধারার চলচ্চিত্র) চাইতে স্বাধীন ধারার স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাতাগণের 'নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্রে' 'নৃগোষ্ঠী' জনসংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট গল্প বা কাহিনি অধিক মাত্রায় উঠে এসেছে।[২৩] বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্বাধীন ধারার চলচ্চিত্র নির্মাতাগণ তাদের চলচ্চিত্রে পাহাড়ে বসবাসরত নৃগোষ্ঠীদের জনজীবন, সংগ্রাম, সংকট, চিন্তা-চেতনা, ইতিহাস,

আন্দোলন ইত্যাদি বহুমাত্রিক বিষয় তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। নৃগোষ্ঠীর প্রকৃতিকেন্দ্রিক যাপিত জীবন ও বেড়ে ওঠার সতেজ স্মৃতি তাদের মননে। যার প্রতিফলন দেখা যায় তাদের চলচ্চিত্রে। এ প্রসঙ্গে *মর ঠেংগাড়ি* (২০১৫), *"Kalpona"..... Not Imagination* (২০১৬) চলচ্চিত্রের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায়। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও জনসংস্কৃতির প্রতি তাদের চিন্তাকল্প উঠে এসেছে এসব চলচ্চিত্রে। তাই সেখানে আরোপিত বা কৃত্রিম কোন সংস্কৃতি বিনির্মাণের প্রয়োজন হয় না। বরং চলচ্চিত্রে শিল্পমান বজায় রেখে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্য উপস্থাপন সেখানে প্রধান্য পায়। যেখানে নৃগোষ্ঠীর জীবন চিত্র এবং তাদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, ভাষা শৈলী, পোশাক ইত্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে উক্ত জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের আলোকে। যা বাংলাদেশের বৃহত্তর চলচ্চিত্র শিল্প পরিসরে সাংস্কৃতিক বহুমাত্রিকতা আনয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেবে বলে ধারণা করা যায়।

- **বাংলাদেশের 'নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্রে' 'নৃগোষ্ঠী' উপস্থাপনে চলচ্চিত্রের নন্দনভাষা ও চিহ্নবিজ্ঞানের প্রয়োগ কৌশল**

সাম্প্রতিক সময়ে স্বাধীন ধারার চলচ্চিত্র নির্মাতাগণ তাদের স্বল্পদৈর্ঘ্য এবং পূর্ণদৈর্ঘ্য 'নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্রে' 'নৃগোষ্ঠী' জনজীবনের গল্প উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নান্দনিক ও চলচ্চিত্রিক শিল্প কৌশল ও চিহ্নবিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। যা 'নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্র' নির্মাণের উল্লেখযোগ্য শিল্পকৌশল হিসিবে বিবেচিত। নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সদস্য কর্তৃক রচিত, অভিনিত এবং পরিচালিত চলচ্চিত্রসমূহকে নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্র অভিধায় চিহ্নিত করা যায়। নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্রসমূহে তাদের নিজস্ব অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ক্যামেরা এঙ্গেল, বিষয় ও বিষয়ী নির্বাচন এবং শিল্পকৌশল প্রত্যক্ষ করা যায়।

সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বাসের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবিশ্বাসের অনুষঙ্গে গৃহীত চিহ্ন বা প্রতীকসমূহ তাদের চলচ্চিত্রে উঠে এসেছে। উদাহরণ হিসেবে এখনে *"Kalpona"..... Not Imagination"* চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত কিছু চলচ্চিত্রিক শিল্পকৌশল এবং চিহ্ন বা প্রতীকের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক। *"Kalpona"..... Not Imagination"* চলচ্চিত্রে প্রতীক হিসেবে উঠে এসেছে যে বিষয়গুলো তা হলো – কালার, প্রাণী, ক্যামেরা এঙ্গেল ও ক্যামেরা মুভমেন্ট, বই, স্বাধীনতা স্তম্ভ ও শিখা চিরন্তন, পোস্টার, দেয়াল লিখন এবং গাণিতিক চিহ্ন

* রঙ (কালার)

চলচ্চিত্রটিতে সাদাকালো এবং রঙিন এই দুটি পৃথক বা কনট্রাস্ট কালার ব্যবহার করা হয়েছে। নাগরিক কোলাহল পূর্ণ ইট-কাঠ-পাথরের নিস্প্রাণ শহর বুঝাতে ঢাকার বিপরীতে প্রাণপ্রাচুর্য ও শিকড়ের নিকটতম অংশ যেখানে অনেক আলো বাতাস এবং নিজের অস্তিত্ব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় এবং স্থানের সৌন্দর্য তুলে ধরতে পরিচালক এই চলচ্চিত্রে বিপরীতধর্মী রঙ বা কালার টোন ব্যবহার করেছেন।

* প্রাণী

"Kalpona"..... Not Imagination" চলচ্চিত্রটিতে হায়েনার বা হিংস্র জানোয়ারের প্রতীক হিসেবে রাগান্বিত বা ক্ষিপ্র কুকুরের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ব্যবহার করেছেন। পাশাপাশি একটি অসহায়,

নিরপরাধ ক্ষুদ্র প্রাণ বোঝাতে কিংবা অদৃশ্য কোন অনুসরণকারী হায়েনার সামনে একটি ক্ষুদ্র প্রাণ বোঝাতে বিড়ালের প্রতীকী ব্যবহার করেছেন পরিচালক।

* ক্যামেরা এঙ্গেল ও ক্যামেরা মুভমেন্ট

"Kalpona"..... Not Imagination" চলচ্চিত্রটিকে ফোর্থ সিনেমার ধারায় নির্মিত নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্র বলে পূর্বেই চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি এই চলচ্চিত্রে বিভিন্ন সময়ে এক্সপ্রেশনিস্ট ক্যামেরা এঙ্গেল প্রত্যক্ষ করা যায়।

* বই

যৌক্তিকভাবে প্রতীক বা চিহ্নবিজ্ঞানের অংশ হিসাবে *"Kalpona"..... Not Imagination* স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে একাধিক বই ব্যবহৃত হয়েছে। বইগুলোর মধ্যে রয়েছে - প্রিয় চে, কাকে বলে ইতিহাস, গ্যাটে থেকে ডাব্লিউটিও এবং কল্পনা চাকমার ডায়েরী। উল্লিখিত বইসমূহের ব্যবহার চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত রাজনৈতিক বক্তব্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক এবং অর্থপূর্ণ বলেই প্রতীয়মান হয়েছে।

* স্বাধীনতা স্তম্ভ ও শিখা চিরন্তন

স্বাধীন বাংলাদেশ এবং সেই দেশের নাগরিক হিসেবে পাহাড়ে বসবাসরত নৃগোষ্ঠীদের সাথে ঘটে চলা আচরণের বাস্তবতা প্রকাশের জন্যে প্রতীক হিসেবে স্বাধীনতা স্তম্ভ এবং শিখা চিরন্তন চলচ্চিত্রের একাধিক শটে, ভিন্ন ভিন্ন ক্যামেরা এঙ্গেলের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন পরিচালক।

* পোস্টার, দেয়াল লিখন এবং গাণিতিক চিহ্ন-

"Kalpona"..... Not Imagination" চলচ্চিত্রে প্রতীক হিসেবে দেয়ালে পোস্টার দেয়াল লিখন এবং গাণিতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে দেখা গেছে। পোস্টারের মধ্যে কল্পনা চাকমা সম্পর্কিত লেখা, চে গুয়েভারার ছবি, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পোস্টার দেখতে পাওয়া যায়। উক্ত পোস্টারগুলো স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লবী চেতনা এবং রাজনৈতিক অবস্থানকে চিহ্নিত করে।

চিত্র ৭: *"Kalpona"... Not Imagination"* চলচ্চিত্রে প্রতীক হিসেবে দেয়ালে পোস্টার।

পাশাপাশি ০২মি. ৪৪সে.-৩ মি. পর্যন্ত দৃশ্যে দরজার উপর ২২৪০ লেখা দেখা যায়। ফ্রেমে এই সংখ্যাটিই ফোকাস পয়েন্ট হওয়াতে চোখ এড়ানো যায় না। গবেষণা চলাকালীন এই চলচ্চিত্রের পরিচালক জনাব সন্তুয়া ত্রিপুরার সঙ্গে মুক্ত সাক্ষাৎকার পর্বে '২২৪০' গাণিতিক সংখ্যাটি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে বলেন - এর একটি গূঢ় অর্থ রয়েছে, তবে তা এখনি প্রকাশ করবেন না বলে তিনি জানান। এছাড়াও সাদা দেয়ালে ANNIHILATE এবং THESE DEMONS শব্দদুটি বিশেষ অর্থপূর্ণ যা এই চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়েছে।

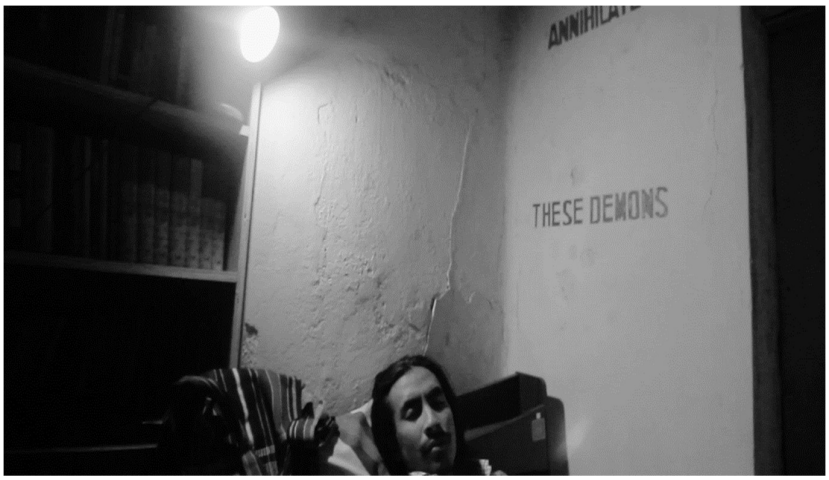

চিত্র ৮: "*Kalpona*".... *Not Imagination*" চলচ্চিত্রে দেয়াল লিখনের মাধ্যমে ননন্দভাষা তৈরির চিত্র।

মর ঠেংগাড়ি চলচ্চিত্রের ৫৪ মি. ২০সে. - ৫৪ মি. ৩৮ সেকেন্ড পর্যন্ত দৃশ্যে একটি এক্সট্রিম ক্লোজ শট দেখানো হয় যেখানে একটি প্লাস্টিকের খেলনা বাঁশি সামরিক বুটের তলায় পিষ্ট হয়। এই পিষ্ট হওয়ার শটের মধ্য দিয়ে অনেক না বলা বক্তব্য উঠে এসেছে। উঠে এসেছে পাহাড়ের আদি বাসিন্দাদের প্রতি বিভিন্ন সময়ে ঘটে চলা প্রশাসনিক বা রাষ্ট্রীয় বিমাতাসুলভ আচরণের চিত্র। অর্থপূর্ণ এবং নান্দনিক এই দৃশ্যের মধ্য দিয়ে নৃগোষ্ঠী জনজীবনের সংগ্রাম, অত্যাচার-নিপীড়ন ও দুর্বিষহ যন্ত্রণার চিত্র পরিচালক উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শাসক কর্তৃক নিপীড়িত হবার চিত্র তাদের নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা। যা এই দৃশ্যের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

পাশাপাশি পরের শটে দেখাযায়, সেই ভাঙ্গা প্লাস্টিকের বাঁশি ডিজল্ভ হয়ে কমলের ভাঙ্গা সাইকেলে মিলিয়ে যাচ্ছে। যার মাধ্যমে পিতা পুত্রের কষ্ট একাকার হয়ে ওঠে। এভাবেই বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে বা বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্রে নৃগোষ্ঠীর সমস্যা ও বক্তব্য উপস্থাপনকল্পে নান্দনিক কৌশল প্রয়োগ করতে দেখা যায়।

চিত্র ৯: *মর ঠেংগাড়ি* (*My Bicycle*) চলচ্চিত্রে চিহ্ন বা প্রতীক ও শটের নান্দনিক ব্যবহার।

যার মাধ্যমে নৃগোষ্ঠীর প্রতি ঘটে চলা নির্দয় আচরণের তথ্য অন্যান্য জনগোষ্ঠীর কাছে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন পরিচালকগণ।

চিত্র ১০: *মর ঠেংগাড়ি* চলচ্চিত্রে প্রতীক ও সম্পাদনার নান্দনিক ব্যবহার।

"বাংলাদেশের 'নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্রে' 'নৃগোষ্ঠী' উপস্থাপন কৌশল বিশ্লেষণ" শীর্ষক আলোচনার মাধ্যমে এদেশে বাঙালি পরিচালক কর্তৃক নির্মিত চলচ্চিত্রে কীভাবে নৃগোষ্ঠী উপস্থাপিত হয়েছে, অপরদিকে 'ফোর্থ সিনেমা' বা 'নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্রে' নৃগোষ্ঠী কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তার একটি তুলনামূলক চিত্র উঠে এসেছে। যেখানে নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্রে নৃগোষ্ঠী উপস্থাপনায় নৃগোষ্ঠীর জীবন সংগ্রাম ও সংস্কৃতির চিত্র যথাযথভাবে ফুটে উঠেছে। এই গবেষণায় আরো প্রতীয়মান হয়েছে যে, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের 'নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্র'সমূহে তাদের গল্প বা কাহিনি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নান্দনিক চলচ্চিত্রিক শিল্পকৌশল নিজস্ব আঙ্গিকের উপস্থাপন শুরু হয়েছে। যা বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্রের নিজস্ব চলচ্চিত্রিক শিল্পকৌশল হিসেবে চিহ্নিত হয়।

উপসংহার

ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা জনগোষ্ঠীর পরিচালকগণ কর্তৃক নির্মিত চলচ্চিত্রে নৃগোষ্ঠী উপস্থাপনের বিপরীতে চ্যালেঞ্জ হিসেবে উঠে আসছে 'নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্র'। এটা সত্য যে 'ফোর্থ সিনেমা'র অগ্রগতি এবং বৃদ্ধি হলো সিনেমার উত্তরাধিকারের অন্তর্গত সাম্রাজ্যিক প্রেরণার প্রতিরোধ। প্রকৃতপক্ষে, এটি দেশীয় চলচ্চিত্রের নতুন আঙ্গিক ও পরিচয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বৃহত্তর সংস্কৃতি এবং চলচ্চিত্রের স্বার্থেই বাংলাদেশে নির্মিত 'নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্র'সমূহকে প্রচারের সুযোগ উন্মুক্ত করে দেয়া প্রয়োজন। এর ফলে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প যেমন বহুমাত্রিকতা ও বৈচিত্র্য অর্জন করবে, তেমনি নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে জনমানুষের মধ্যে ইতিবাচক ও মানবিক ধারণা সৃষ্টি হবে। যা মানবিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের পথে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে 'ক্ষমতা বলয়ের' বাইরে থেকে নিজেদের চলচ্চিত্র নির্মাণের যে প্রচেষ্টা নৃগোষ্ঠীর পরিচালকগণ অব্যাহত রেখেছেন, তার মাধ্যমে একদিন তারা তাদের উপেক্ষিত সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে জীবন্ত করে তুলতে পারবেন। একইভাবে রাষ্ট্রনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। এর মাধ্যমে ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা শাসকগণের কাছে পৌঁছানোর হাতিয়ার হিসেবে চলচ্চিত্রকে সাবলীলভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। যার ফলে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণের পথ সুগম হবে।

প্রবন্ধের শেষাংশে এসে এই প্রতীতি জন্মায় যে, বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্র তুলনামূলক নবীন আঙ্গিকের চলচ্চিত্র প্রচেষ্টা হলেও এখানে নৃগোষ্ঠীর জীবন সংগ্রাম ও সংস্কৃতি উপস্থাপনকল্পে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্র নির্মাণে পরিচালকদের নিজস্ব শিল্পকৌশলের প্রয়োগ নৃগোষ্ঠীসমূহের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ যেমন ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি সাম্প্রতিক সময়ে তাদের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও মতাদর্শ তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে উপস্থাপন করেছেন পরিচালকগণ, যা বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্রের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। বাঙালি পরিচালক কর্তৃক নির্মিত চলচ্চিত্রে নৃগোষ্ঠী উপস্থাপন কৌশলের বিপরীতে নৃগোষ্ঠী পরিচালক কর্তৃক নির্মিত চলচ্চিত্রে 'নৃগোষ্ঠী উপস্থাপন কৌশল' স্বতন্ত্র এবং নিজস্ব নান্দনিকতায় পরিপূর্ণ। ফলে বলা যায় বাংলাদেশের ফোর্থ সিনেমা বা 'নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্রে' 'নৃগোষ্ঠী' উপস্থাপিত হয়েছে যথাযথ চলচ্চিত্রিক শিল্পকৌশল ও নিজস্ব নন্দন শিল্পশৌকর্যের আলোকে। যা বাংলাদেশের মূল ধারার অন্যান্য চলচ্চিত্র থেকে নৃগোষ্ঠী চলচ্চিত্রকে স্বতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. *মেঘের অনেক রং* চলচ্চিত্রের ইউটিউব লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=btLTSFMb-RY (accessed on the 27th June 2022)

২. কবিতা চাকমা, উপস্থাপনায় সার্বভৌমত্ব: বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী চলচ্চিত্র, ২০০২, *রাষ্ট্রচিন্তা* (ব্লগ)। অনুবাদ- ডালিয়া চাকমা। httpst//rashtrochinta.net/blogpost/ / (accessed on the 2 Feb 2022)

৩. *আধিয়ার* চলচ্চিত্রের ইউটিউব লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=Hjhc4C56x10&t=7155s (accessed on the 27th June 2022)

৪. ভারতী কুজুর (৫৬), (আদিবাসী কণ্ঠশিল্পী) এর সাক্ষাৎকার (০৪-০৩-২০২২, মিঠাপুকুর, রংপুর) থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে।

৫. *নাচোলের রানী* চলচ্চিত্রের ইউটিউব লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=REU3gEyipqc (accessed on the 27th June 2022)

৬. মো. অমিত হাসান সোহাগ, '*বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নৃগোষ্ঠী: বহুমাত্রিক সংস্কৃতির উপস্থাপন কৌশল বিশ্লেষণ*' শীর্ষক গবেষণা ফেলোশিপ, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ২০২১-২০২২ অর্থবছর, ৩য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য, পৃ. ১২১

৭. Nancy A and Douglas S. Massey Denton, (1998). Race Relation and Population Diversity, Lecture in the Cabrini College 40th Anniversary series The changing Face of America, Cabrini College, Radnor, PA, October 23

৮. মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য (সম্পাদনা), আদিবাসী জনগোষ্ঠী, '*ভূমিকা*', বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ সংস্কৃতি সমীক্ষামালা, ৫ম খণ্ড, ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. xiv

৯. Jenny Chio, Visual anthropology, In The Open Encyclopedia of Anthropology, edited by Felix Stein. Facsimile of the first edition in The Cambridge Encyclopedia of Anthropology, University of Southern California, Initially published 26 Jul 2021, https://www.anthroencyclopedia.com/entry/visual-anthropology, (accessed on the 9th April 2023)

১০. K. Kris Hirst, *An Introduction to Visual Anthropology: Images and What They Tell Us About People*; https://www.thoughtco.com/visual-anthropology-introduction-4153066 (accessed on the 10th April 2023)

১১. Jennifer Hasty, David G. Lewis, & Marjorie M. Snipes, Visual Anthropology and Ethnographic Film, Social Sciences Library, https://socialsci.libretexts.org/Bookshelves/ (accessed on the 10th April 2023).

১২. Stuart Murray, Images of Dignity: Barry Barclay and Fourth Cinema, Academia, Published 2008, https://www.academia.edu/ , (accessed on the 08th April 2023)

১৩. Barry Barclay, CELEBRATING FOURTH CINEMA, Printed in Illusions Magazine, NZ: July 2003, https://www.academia.edu/ (accessed on the 8th April 2023)

১৪. Stuart Murray, Images of Dignity: Barry Barclay and Fourth Cinema, Academia, Published 2008 https://www.academia.edu/5249443/Images_of_Dignity_Barry_Barclay_and_Fourth_Cinema , (accessed on the 8th April 2023)

১৫. Christina Milligan, Sites of exuberance: BarryBarclay and Fourth Cinema, Ten years on, International Journal of Media & Cultural PoliticsVolume 11 Number 3, https://www.researchgate.net/publication/283684531_Sites_of_exuberance_Barry_Barclay_and_Fourth_Cinema_ten_years_on (accessed on the 27th June 2022)

১৬. প্রশান্ত ত্রিপুরা, '*বহুজাতির বাংলাদেশ: স্বরূপ অন্বেষণ ও অস্বীকৃতির ইতিহাস*', সংবেদ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৪৩

১৭. আফসার আহমদ, *বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী নাট্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১১

১৮. মেজবাহ কামাল ও অন্যান্য (সম্পাদনা), '*আদিবাসী জনগোষ্ঠী*', বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা, ৫ম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ. ৬২

১৯. বঙ্কিমচন্দ্র চাকমা, '*চাকমা সমাজ ও সংস্কৃতি*', উপজাতীয় সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কালচারাল ইন্সটিটিউট), রাঙ্গামাটি, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৯০

২০. সান্তুয়া ত্রিপুরা, "*Kalpona*".... *Not Imagination*" (চলচ্চিত্র)'-এর সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে (০৫-০৪-২০২২, ঢাকা)

২১. কল্পনা চাকমা অপহরণ ও বিচার কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য, https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE_%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BE_%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3 (accessed on the 10th April 2023)

২৩. মো. অমিত হাসান সোহাগ, '*বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নৃগোষ্ঠী : বহুমাত্রিক সংস্কৃতির উপস্থাপন কৌশল বিশ্লেষণ*' শীর্ষক গবেষণা ফেলোশিপ, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ (২০২১-২০২২ অর্থবছর), ঢাকা: চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য, পৃ. ১৮৪

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একচল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০/জুন ২০২৩

১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন ও নারী সমাজ

আনোয়ারা আক্তার*

সারসংক্ষেপ

সামরিক শাসক আইয়ুব খানের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ১৯৬২ সালে পূর্ববাংলায় যে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল, তা আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন নামে পরিচিত। শিক্ষা আন্দোলন হিসেবে পরিচিত হলেও এর রাজনৈতিক গুরুত্বও ছিল অপরিসীম। আইয়ুব খান কর্তৃক সামরিক শাসন জারির মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে পূর্ববাংলার মানুষ ক্ষুব্ধ হলেও তাদের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশের সুযোগ ছিল না। ১৯৫৮-৬১ সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ব্যানারে সরকারের জনবিরোধী কিছু নীতির প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল। ১৯৬২ সালে শরীফ শিক্ষা কমিশনের অগণতান্ত্রিক শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর স্বার্থবিরোধী পদক্ষেপের প্রতিবাদে সংগঠিত শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ববাংলার স্থবির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নতুন গতিবেগ পরিলক্ষিত হয়। সামরিক শাসনকে চ্যালেঞ্জ করে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের সূচনা করেছিল ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন। জাতীয় জীবনের তাৎপর্যবাহী বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনে পূর্ববাংলার ছাত্রদের পাশাপাশি নারী শিক্ষার্থী এবং কর্মীদেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ ছিল। সে-সময়ে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। শুধু শিক্ষা আন্দোলন নয়, ষাটের দশকের অন্যান্য আন্দোলনেও নারী সমাজের লক্ষণীয় অংশগ্রহণ ছিল। আলোচ্য প্রবন্ধে ১৯৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, নারীদের অংশগ্রহণ ও তাদের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে।

চাবি শব্দ: শিক্ষা আন্দোলন, শরীফ শিক্ষা কমিশন, নারীসমাজ, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা সংগ্রাম।

ভূমিকা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে বিশ শতকের ষাটের দশক একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি মানসে যে স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যবোধ জাগ্রত হয়েছিল ষাটের দশকে এর ব্যাপক ব্যাপ্তি ঘটে এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ষাটের দশকেই পূর্ববাংলায় পরিচালিত হয় পাকিস্তানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে অনেক আন্দোলন সংগ্রাম। এসব আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন ছিল অন্যতম। এটি ছিল পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক শাসক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক গঠিত শরীফ শিক্ষা কমিশনের অগণতান্ত্রিক, শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর স্বার্থবিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ পরিচালিত আন্দোলন। ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এ আন্দোলনের সূচনা হয় এবং ১৭ সেপ্টেম্বর এটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। ১৭ সেপ্টেম্বর ৩ জনের শহীদ হওয়ার মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলায় যে চরম উত্তেজনাকর রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাতে সামরিক স্বৈরশাসক আইয়ুব খান নতিস্বীকারে বাধ্য হন। প্রবল আন্দোলনের মুখে শরীফ শিক্ষা কমিশন

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

রিপোর্ট বাস্তবায়ন স্থগিত করা হয়। উল্লেখ্য এটি 'শিক্ষা আন্দোলন' হিসেবে পরিচিত হলেও এ আন্দোলনের রাজনৈতিক গুরুত্বও কম ছিল না। বস্তুত বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে এ শিক্ষা আন্দোলনটি এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিল। পঞ্চাশের দশকের স্বাধিকার আন্দোলন ও ষাটের দশকের শেষ দিকের স্বাধীনতার আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণে যোগসূত্র ও সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করেছিল এ শিক্ষা আন্দোলন। বায়ান্নো'র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ঠিক দশ বছর পরে সংঘটিত বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে যে আন্দোলন পরিচালিত হয় তার সূত্র ধরেই পূর্ববাংলায় স্থবির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল। এ আন্দোলনের পথ ধরেই পূর্ববাংলায় আইয়ুব খানের সামরিক শাসনকে চ্যালেঞ্জ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পুনরায় রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রাম শুরু হয় যা পর্যায়ক্রমিকভাবে ১৯৬৪ সালের ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলন এবং ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করে। এরপর ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। এ বিবেচনায় ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা হিসেবে বিবেচ্য। জাতীয় জীবনে তাৎপর্যবাহী বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনে পূর্ববাংলার ছাত্রদের পাশাপাশি নারী শিক্ষার্থী এবং কর্মীদেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ ছিল। সে-সময়কার স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এ আন্দোলনে উল্লেখযোগ্যহারে অংশগ্রহণ করে। শুধু শিক্ষা আন্দোলন নয়, ষাটের দশকের অন্যান্য আন্দোলনেও নারী সমাজের লক্ষণীয় অংশগ্রহণ ছিল। তবে সামগ্রিকভাবে নারীদের ভূমিকা সম্পর্কিত স্বতন্ত্র অধ্যয়ন সেই অর্থে হয়নি। একই কথা ১৯৬২'র শিক্ষা আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

প্রবন্ধের উপজীব্য ও আলোচনার পরিধি

১৯৬২ সালে শিক্ষা আন্দোলনে নারী সমাজের ভূমিকা আলোচনা-পর্যালোচনার বিশেষ দাবি রাখলেও এখন পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে তা হয়নি। এরূপ বাস্তবতায় উপর্যুক্ত শিরোনামে বর্তমান প্রবন্ধটির অবতারণা। এতে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারি, শরীফ শিক্ষা কমিশন গঠন ও এর প্রতিবেদন সংক্রান্ত আলোচনা প্রাসঙ্গিকভাবে স্থান পেলেও মূল মনোযোগ নিবন্ধ থাকবে ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে নারী সমাজের ভূমিকা আলোচনা-পর্যালোচনার উপরই। উল্লেখ্য, বর্তমান প্রবন্ধে শিক্ষা আন্দোলনে মুখ্যত ছাত্রীদের ভূমিকা নিরূপণ ও মূল্যায়ন করা হলেও শিরোনামে 'ছাত্রী সমাজ' শব্দটি ব্যবহার না করে 'নারী সমাজ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ সংখ্যায় স্বল্প হলেও এ আন্দোলনে সমকালীন বেশ কয়েকজন নারী নেত্রীর কিছু ভূমিকা ছিল। প্রসঙ্গক্রমে তাঁদের ভূমিকাও এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। তাই প্রবন্ধের শিরোনামে 'নারী সমাজ' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, শরীফ শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানেও (যদিও পূর্ব বাংলার তুলনায় ততটা ব্যাপক ছিল না)

আন্দোলন হয়েছে। তবে আলোচনার পরিধি সীমাবদ্ধ রাখার জন্য এ প্রবন্ধে মূলত পূর্ববাংলার শিক্ষা আন্দোলন এবং নারী সমাজের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে।

আইয়ুব খানের জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন

১৯৪৭ সালে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা, ভাষা ও জাতিগত ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় ঐক্যবোধের কারণে মুসলিম প্রধান পূর্ববাংলা একটি প্রদেশ হিসেবে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়। তবে শুরু থেকেই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানদের অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী মানসিকতার কারণে পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। স্বাধীন পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান রচনা করতেই লেগে যায় ৯ বছর। ১৯৫৬ সালে বহুল কাঙ্ক্ষিত সংবিধান গৃহীত হলেও মাত্র দু'বছরের মধ্যেই এ সংবিধান ও সাংবিধানিক সরকারকে উৎখাত ও অকার্যকর করে দিয়ে ১৯৫৮ সালেই পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করা হয়। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মীর্জা (১৮৯৯-১৯৬৯) পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন। পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল মুহম্মদ আইয়ুব খানকে (১৯০৭-১৯৭৪) প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। দায়িত্বভার গ্রহণের মাত্র ২০ দিনের মধ্যেই ২৭শে অক্টোবর উচ্চাভিলাষী আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মীর্জাকে উৎখাত করে নিজে প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ করে পাকিস্তানের নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব কুক্ষিগত করেন।[১]

সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে অসাংবিধানিক পন্থায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারী আইয়ুব খান তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ এবং নিজ চিন্তা-চেতনাপ্রসূত রাষ্ট্র ও সমাজকাঠামো নির্মাণের জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দ্রুত কতগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[২] শিক্ষাক্ষেত্রেও তিনি সংস্কার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে ক্ষমতা দখলের দুই মাস পর তিনি একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন।[৩] প্রেসিডেন্টের নির্দেশে ১৯৫৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদানিন্তন শিক্ষা সচিব এসএম শরীফকে সভাপতি করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট 'The Commission on National Education' বা 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' গঠন করেন। কমিশনের সভাপতির নামানুসারে এই কমিশন 'শরীফ শিক্ষা কমিশন' নামেই সমধিক পরিচিত।[৪] ১৯৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কমিশনের কার্যক্রম উদ্বোধন করার সময়ই এর লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেন। তিনি নির্দেশনা দেন যে, কমিশন যেন এমন একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে, যাতে স্বাধীন পাকিস্তানের অন্তর্জাগতিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ আরো স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় এবং এ শিক্ষা ব্যবস্থা, কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নয়নে সহায়তা করে জাতির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করতে পারে।[৫]

শরীফ শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন : উল্লেখযোগ্য সুপারিশমালা

জাতীয় শিক্ষা কমিশন ফোর্ড ফাউন্ডেশনের[৬] উপদেষ্টা এবং মার্কিন শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় প্রায় আট মাস নিষ্ঠার সাথে কাজ করে ১৯৫৯ সালের ২৬শে আগস্ট অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট

হিসেবে এর সুপারিশ প্রেসিডেন্টের কাছে দাখিল করে।[৭] এ রিপোর্টটি পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা দপ্তর ১৯৬১ সালে বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতে করাচি থেকে ইতোমধ্যে উল্লেখিত শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। এর আগে ১৯৬০ সালে ৮ই জানুয়ারি আইয়ুব খান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের উপর এক বেতার ভাষণ দেন। আইয়ুব খানের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক আদর্শবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর কথা প্রতিফলিত হয়।[৮] জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের আগেই প্রেসিডেন্টের এ বক্তব্য রাষ্ট্রভাষা সংগ্রামের মাধ্যমে গড়ে ওঠা ধর্মনিরপেক্ষ ও উদারনৈতিকতাবাদী ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তায় বিশ্বাসী পূর্ববাংলার মানুষের মধ্যে একরকমের ক্ষোভ তৈরি হয়।

শরীফ কমিশনের রিপোর্ট ছিল শিক্ষার বহুতর বিষয় সংবলিত একটি পরিধিবহুল পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। মুখবন্ধ ও ভূমিকা ছাড়াও এটি ২৭টি অধ্যায় এবং ৩টি পরিশিষ্ট অধ্যায়ে বিন্যস্ত ছিল। শিক্ষাকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর এই তিন স্তরে ভাগ করা হয়। কমিশন রিপোর্টে দক্ষ মানবসম্পদ ও একটি জ্ঞানভিত্তিক নাগরিক সমাজ তৈরির জন্য ৮ বছর মেয়াদি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের সুপারিশসহ শিশুদের কার্যকরীভাবে শিক্ষিত করা, তাদের ব্যক্তিত্বের সার্বিক বিকাশ এবং তাদের মধ্যে শিল্পবোধ ও কৌতূহলী মনোভাব জাগ্রত করার মত সহায়ক পাঠক্রম চালুর সুপারিশ করা হয়।[৯]

শরীফ কমিশন রিপোর্টে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর করার সুপারিশ করা হয়। ভালো কর্মী, ভালো নাগরিক, ভালো ব্যক্তি এবং ভালো দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরির লক্ষ্যে মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম ও বিষয় নির্ধারণ সম্পর্কে কমিশন প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়। কমিশন তার সুপারিশে বলে, এই স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেন একজন শিক্ষার্থী মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনান্তে অন্তত ১০/১২টি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান (preliminary understanding) লাভ করতে পারে।[১০]

কমিশন রিপোর্টে উচ্চশিক্ষাকে Distinct Stage হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ইন্টারমিডিয়েট কোর্স পরিচালনার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত করার সুপারিশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য স্নাতক ডিগ্রি কোর্সের মেয়াদকাল দুই থেকে তিন বছরে এবং স্নাতকোত্তর কোর্সের মেয়াদ দুই বছর করার সুপারিশ করা হয়। [১১]

শরীফ কমিশনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে নারী শিক্ষা বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রতিবেদনে নারী শিক্ষা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সার-সংক্ষেপ আকারে ১০টি সুপারিশ করা হয়।[১২] সুপারিশসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় এর মধ্যেও নারী শিক্ষার ব্যাপারে এক ধরনের সংকীর্ণ ও রক্ষণশীল মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এতে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য নারী শিক্ষার প্রসারের উপর জোর দেয়া হয় বটে, তবে একই সাথে বলা হয়, উপযুক্ত মা ও গৃহিণী হিসেবে নারীকে গড়ে তোলাই হবে নারী শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। এ জন্য মাধ্যমিক স্তরে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠক্রমে অন্যান্য বিষয়ের সাথে গৃহজাতশিল্প (homecraft) সেলাই, বুনন,

রান্না-বান্না এবং গৃহ ও শিশু যত্নের মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়। উচ্চশিক্ষা স্তরে নারীদের জন্য গার্হস্থ্য অর্থনীতি (Home Economic) পাঠের সুযোগ সম্প্রসারণের সুপারিশ করা হয়। [১৩] কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল 'অবৈতনিক শিক্ষার ধারণাকে অবাস্তব বলে' উল্লেখ করা।[১৪]

কমিশন রিপোর্টে স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপর সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষকদের উপর সরকারের তীক্ষ্ণ নজরদারি বৃদ্ধি, তাঁদের দৈনিক কর্মঘণ্টা বৃদ্ধি ইত্যাদির সুপারিশ করা হয়েছিল। প্রতিবেদনে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ছাত্র রাজনীতি থেকে দূরে রাখার জন্য ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয় যে, "The intregrity of Colleges and Universities should be maintained and they should not be permitted to become an areana of Partisan Politics".[১৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শরীফ শিক্ষা কমিশন ধর্মীয় শিক্ষাকে শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গরূপে গণ্য করার প্রস্তাব করেছিল। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরে অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়। উচ্চতর পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষা ঐচ্ছিক হলেও একে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করার সুপারিশ ছিল কমিশন প্রতিবেদনে।[১৬]

শিক্ষানীতির প্রতিক্রিয়া : বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন ও নারী সমাজ

শরীফ কমিশনের সুপারিশমালা পর্যালোচনা করে বলা যায়, এতে পাকিস্তানের শিক্ষা সম্পর্কিত ব্যাপারে বেশ কিছু ইতিবাচক দিক ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সার্বিক দিক বিবেচনায় নিলে এ কথা বলা অসঙ্গত হবে না, এটি ছিল একটি চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও গণবিরোধী শিক্ষানীতি। রিপোর্টে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসহ প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষার স্তর পর্যন্ত সাধারণ, পেশামূলক শিক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী প্রসঙ্গ, শিক্ষার মাধ্যম, পাঠ্যপুস্তক, বর্ণমালা সমস্যা, শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষা ব্যয় সংক্রান্ত যে সব সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়, এতে আইয়ুব সরকারের ধর্মান্ধ, পুঁজিবাদী, রক্ষণশীল, সাম্রাজ্যবাদী ও শিক্ষাসংকোচন নীতির পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছিল। আইয়ুব খান রাষ্ট্রপরিচালানার জন্য রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে রক্ষণশীল অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী মানসিকতা সম্পন্ন নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তারই আলোকে প্রণীত হয়েছিল শরীফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট। এতে শিক্ষাকে ব্যয়বহুল পণ্যের মতো শুধু উচ্চবিত্তের সন্তানদের স্বার্থে সীমিত করার সুপারিশ করা হয় । এর মাধ্যমে সাধারণের জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ একেবারেই সংকুচিত করার ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষার ব্যয়কে পুঁজি বিনিয়োগ হিসেবে দেখা ও শিক্ষার্থীদের উপর তা চাপিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অবৈতনিক শিক্ষা বাংলার একটি সনাতন ও দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। শরীফ কমিশন রিপোর্টে একে 'অবাস্তব কল্পনা' বলে উল্লেখ করা হয়। শিক্ষা-বিষয়ক কমিশনের এ মত থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এর উদ্দেশ্যই ছিল শিক্ষার সংকোচনমূলক নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের উচ্চশ্রেণির উপযোগী শিক্ষা প্রসার। এর দ্বারা

শাসক শ্রেণির সহযোগী হিসেবে একটি এলিট শ্রেণি তৈরি করাও শরীফ কমিশনের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ছিল ।

শরীফ কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা এবং ছাত্র-শিক্ষকদের কার্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার প্রস্তাব করেছিল। শিক্ষকরা যাতে শিক্ষার্থীদের সাথে স্বদেশ, স্বজাতি নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময়ের সুযোগ না পায় সে অপচেষ্টাও করা হয়েছিল। শুধু ক্লাসের মাঝে এক ধ্যানে মনোনিবিষ্ট রেখে তারা রোবোটিক শিক্ষক-ছাত্র তৈরির প্রয়াস নিয়েছিল। পূর্ববাংলার কিছু প্রতিক্রিয়াশীল ও ধর্মান্ধ মানুষ এ শিক্ষানীতির প্রতি সমর্থন জানালেও অধিকাংশ মানুষ বিশেষ করে এদেশের ছাত্র সমাজ এটি মেনে নেয়নি। আইয়ুব খান কর্তৃক সামরিক শাসন জারির মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে এতদিন পূর্ববাংলার মানুষ নানা কারণে ক্ষুব্ধ হলেও তাদের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশের সুযোগ ছিল না। ১৯৫৮-৬১ সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ব্যানারে সরকারের জনবিরোধী কিছু নীতির প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল।[১৭] কিন্তু শরীফ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পরপরই শিক্ষার্থীরা সরকারের সমস্ত বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে আন্দোলন শুরু করে। এমনিতেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা ও বৈষম্যমূলক নীতির কারণে পূর্ববাংলা শিক্ষা ক্ষেত্রে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছিল। তৎকালীন সরকারি পরিসংখ্যান ব্যুরো, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনগুলো পর্যালোচনা করলেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৮]

পূর্ববাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার পশ্চাৎপদ পরিস্থিতিতে ঘোষিত শিক্ষানীতির মধ্যে সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতি, শিক্ষাকে ব্যয়বহুল পণ্যে পরিণত করার মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের পথ রুদ্ধ করা ইত্যাদি পূর্ববাংলার মানুষকে বিশেষ করে ছাত্র সমাজকে ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এ শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদনকে তারা অগ্রহণযোগ্য বিবেচনা করে। কমিশন প্রতিবেদন মোতাবেক সরকার যেন শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন না করে এর দাবিতে শিক্ষার্থীরা ১৯৬২ সালের আগস্ট মাস থেকেই অত্যন্ত সুসংগঠিতভাবে আন্দোলন শুরু করে। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষার্থীরা এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। দুই বছরের পরিবর্তে ডিগ্রি কোর্সকে তিন বছরে রূপান্তরের সুপারিশের প্রতিবাদে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। স্নাতক শিক্ষার্থী এম আই চৌধুরীর নেতৃত্বে শিক্ষার্থীরা সংগঠিত হয়। তাদের এ আন্দোলনে জগন্নাথ কলেজ, কায়েদে আজম কলেজ (বতর্মান সোহরাওয়ার্দী কলেজ) যোগ দেয়। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা আন্দোলনকে সাংগঠনিক রূপ দেয়ার উদ্দেশে 'ডিগ্রি স্টুডেন্টস ফোরাম' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এ সংগঠনের ব্যানারে সূচিত প্রতিবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ঢাকা কলেজের ডিগ্রির ছাত্র এম আই চৌধুরী।[১৯] এক পর্যায়ে আন্দোলনে ইডেন কলেজ ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের শিক্ষার্থীদের যোগদানের মধ্য দিয়ে বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনে নারী সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ সূচিত হয়। উল্লেখ্য, কেবল ডিগ্রির শিক্ষার্থী নয়, ইংরেজি বাধ্যতামূলক করার প্রতিবাদে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরাও আন্দোলনে যুক্ত হয়। তারা ইংরেজি ক্লাস বর্জন

করার মধ্য দিয়ে আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করে। শিক্ষার্থীরা সরকারের গণবিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে উল্লেখিত কলেজসমূহে প্রতিবাদ সভা-সমাবেশ ও বিক্ষোভ অব্যাহত রাখে। এক পর্যায়ে আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যোগ দেয়। কলেজ শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে সংগঠিত ও ব্যাপকভিত্তিক করারা লক্ষ্যে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে কলেজ শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠিত 'ডিগ্রি স্টুডেন্টস ফোরাম'কে 'ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ফোরাম'-এ রূপান্তরিত করা হয়। ছাত্র ইউনিয়ন নেতা কাজী ফারুক ও ছাত্রলীগের ওয়ারেশ ইমামকে এ সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়। পরবর্তী সময়ে এটিকে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'এ পরিণত করা হয়।[২০]

শুধু তিন বছরে ডিগ্রি কোর্স বাতিল বা পাঠক্রম থেকে বাধ্যতামূলক ইংরেজি শিক্ষার বোঝা কমানোই নয়, ঘোষিত শিক্ষানীতি বাতিল করে সর্বজনীন শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ফোরাম' ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে। ৬ আগস্ট থেকে সমগ্র দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অবিরাম ছাত্র ধর্মঘট শুরু হয়। এদিকে আন্দোলনের প্রকৃতি ও বৃহত্তর কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য স্টুডেন্টস ফোরামের একটি বৈঠক ডাকা হয়। এতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের পক্ষে এনায়েতুর রহমান, জামাল আনোয়ার, ঢাকা কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক কাজী ফারুক আহমদ (পরে বেসরকারি শিক্ষক সংগঠনের নেতা) ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে ইডেন কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি মতিয়া চৌধুরী (পরে মন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য) ও সদস্য নাজমা বেগম প্রমুখ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।[২১] আন্দোলনের গুণগত পরিবর্তন আসে ১৯৬২ সালের ১০ই আগস্ট। এদিন ঢাকা কলেজের ক্যান্টিনে ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ছাত্র ইউনিয়নের নেতা কাজী ফারুক আহমদের সভাপতিত্বে স্নাতক ও উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির ছাত্রদের নিয়ে সভা হয়। সেখানে তিনি ছাত্রদের বুঝাতে সক্ষম হন শিক্ষার আন্দোলন ও গণতন্ত্রের আন্দোলন একসূত্রে গাঁথা। কাজেই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য সবাইকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত হতে হবে। এ সভা থেকে ১৫ই আগস্ট প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

১৯৬২ সালের ১১ই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জনাব এনায়েতুর রহমানের সভাপতিত্বে ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শরীফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল করে দেশে সর্বজনীন ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানানো হয়। এ সভায় ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন কলেজের ছাত্রদের পাশাপাশি অনেক নারী শিক্ষার্থীও অংশ নিয়েছিলেন এবং ছাত্র নেতৃবৃন্দের সাথে ইডেন কলেজের জনৈক ছাত্রী শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।[২২]

১৯৬২ সালের ১২ই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার বিভিন্ন কলেজের ছাত্র প্রতিনিধিরা এক বিবৃতির মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল ও জনআকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিসহ পনেরো দফা দাবিনামা পেশ করেন। ১৫ই আগস্ট থেকে আন্দোলন

আরো তীব্ররূপ ধারণ করে। ঐদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কলাভবনের (পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল) সামনে ঐতিহাসিক আমতলায় এক বিরাট ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ছাত্রলীগ নেতা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতা কাজী জাফর আহমেদসহ অনেকেই বক্তব্য রাখেন। সমাবেশের পর প্রায় পঁচিশ হাজার শিক্ষার্থী বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে রাজপথে বেরিয়ে পড়েন। এ বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলে বিপুল সংখ্যক নারী শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিলেন বলে জানা যায়। এমনকি নয় দশ বছরের স্কুলের বালিকা শিক্ষার্থীদের অনেকেই এ মিছিলে সামিল হয়েছিলেন বলে কোনো কোনো সূত্রে উল্লেখ রয়েছে।[২৩] নাসিমুন আরা হক (মিনু) ছিলেন তখন আজিমপুর গার্লস স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। তিনি এ গবেষককে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তিনি এবং তাঁর কয়েকজন সহপাঠী ও সতীর্থ এ কর্মসূচিসহ শিক্ষা আন্দোলনের প্রতিটি কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি আরো জানান, তিনি এবং তাঁর সহপাঠী বন্ধুরা কেন্দ্রীয় সংগঠন কর্তৃক ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে মিছিল-সমাবেশে অংশ নিতেন এবং শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন বাতিলসহ আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দিতেন। তাঁরা মিছিল সমাবেশে কেন্দ্রীয় সংগঠনের বিভিন্ন শ্লোগান সংবলিত প্ল্যাকার্ড বহন করতেন ।[২৪]

দুই বছরের স্নাতক কোর্স পুনঃপ্রবর্তন, সকল স্তরে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ইংরেজি সিলেবাসের বইয়ের সংখ্যা হ্রাস, শিক্ষা খাতে অধিক বরাদ্দ, ছাত্রদের বেতন হ্রাস, সিলেবাসের বিশৃঙ্খলা দূরীকরণ, প্রতি বছর নবম শ্রেণি থেকে ডিগ্রি ক্লাশ পর্যন্ত পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে ১৯৬২ সালের ১৬ই আগস্ট থেকে প্রদেশব্যাপী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট, সভা ও শোভাযাত্রার আহ্বান জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসু ও ঢাকার বিভিন্ন কলেজ সংসদের দশ নেতা সংবাদ পত্রে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় সংসদের ভিপি রফিকুল হক, সাধারণ সম্পাদক এনায়েতুর রহমান এ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী ছাত্রী নেত্রীদের মধ্যে ছিলেন ইডেন গার্লস কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক মিস নাজমা রহমান ও হোম ইকনোমিক কলেজ ছাত্রী সংসদের সম্পাদিকা নাজমা আহমেদ।[২৫]

ছাত্র সমাজের ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ১৯৬২ সালের ১৬ই আগস্টেও শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। এই দিন ইডেন মহিলা কলেজ, সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, সিদ্ধেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়, লালবাগ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পলাশি বালিকা বিদ্যালয়, আজিমপুর বালিকা বিদ্যালয়, বাংলা বাজার বালিকা বিদ্যালয়, আনন্দময়ী বালিকা বিদ্যালয় ও নারী শিক্ষা মন্দিরের ছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় অনুষ্ঠিত সমাবেশ ও সমাবেশ শেষে বের হওয়া শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। ১৭ই আগস্ট *দৈনিক ইত্তেফাক*সহ সকল দৈনিক পত্রিকায় এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।[২৬]

১৬ই আগস্টের ধর্মঘটে শুধু ঢাকায় নয় ঢাকার বাইরেও বিভিন্ন স্থানে ছাত্র ধর্মঘট ও মিছিল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এসব কর্মসূচিতে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ছাড়াও স্কুলের ছাত্রীরাও ব্যাপকভাবে অংশ নেয়, অংশগ্রহণকারীদের ছবির জন্য দেখুন (পরিশিষ্ট-১)।

১৭ই আগস্ট শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবিসহ ছাত্রদের ১৫ দফা দাবি[২৭] আদায়ের জন্য আহুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচিতে গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ও ইডেন মহিলা কলেজের ছাত্রীরা সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন।[২৮] শুধু ঢাকাতে নয়, পার্শ্ববর্তী নারায়ণগঞ্জেরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা এ কর্মসূচিতে অংশ নেয়। শিক্ষা আন্দোলনে ফরিদপুরের শিক্ষার্থীরাও বেশ সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। সেখানকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। যশোরেও ধর্মঘট অব্যাহত থাকে এবং সেখানেও ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীদেরও অংশ নেয়ার কথা জানা যায়। ময়মনসিংহেও ছাত্রীরা শিক্ষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। ময়মনসিংহ গার্লস স্কুলের ছাত্রীদের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা বের করা হয়েছিল।[২৯] রংপুর শহরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করে। এদিন বিভিন্ন বিদ্যায়তনে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসে যোগদানে বিরত থাকে এবং 'বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন চাই', 'বিশ্ববিদ্যালয়ের কালাকানুন বাতিল কর', 'দুই বৎসরের ডিগ্রি কোর্স পুনঃপ্রবর্তন কর' ও 'বছরে বছরে পরীক্ষার নামে অর্থ শোষণ চলবে না' ইত্যাদি শ্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাসমূহ প্রদক্ষিণ করে। পরে তারা স্থানীয় জেলা কাউন্সিলের আমতলায় সমাবেশে মিলিত হয়। ছাত্রনেতা আনিসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশ থেকে ছাত্র সমাজের ১৫ দফা দাবির সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। শরীফ কমিশনের রিপোর্টের আলোকে প্রণীত শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে ভৈরব, নাজিরহাট, ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা এবং চৌমুহনীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। এসব শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও ধর্মঘটে অংশ নেয় এবং ধর্মঘটের সমর্থনে আয়োজিত সমাবেশে যোগ দিয়ে শিক্ষা নীতি বাতিলের দাবি জানায়।[৩০]

চলমান ছাত্র ধর্মঘটের প্রভাব রাজশাহী বিভাগের নওগাঁতেও পড়েছিল। সেখানকার বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাঁদের প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনের পাশাপাশি মিছিল-সমাবেশেরও আয়োজন করে। এসব কর্মসূচিতে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরাও ব্যাপকহারে অংশ নেয় এবং কেন্দ্রীয় সংগঠনের ঘোষিত ১৫ দফার প্রতি সমর্থন জানায়। খুলনা ও পার্শ্ববর্তী দৌলতপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ছাত্র আন্দোলন পরিচালিত হয়। শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে পালিত ধর্মঘট ছাড়াও মিছিল-সমাবেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।[৩১] বন্দর নগর চট্টগ্রামে চলমান শিক্ষা আন্দোলন ক্রমশ ব্যাপকরূপ পরিগ্রহ করেছিল। শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে জে. এম. সেন হলে অনুষ্ঠিত সভায় নারীদের প্রতিনিধিত্ব করেন মেহেরুন্নেসা নামক একজন নেত্রী। চট্টগ্রামে শিক্ষা আন্দোলনে বেগম মুশতারী শফীও অংশ নিয়েছিলেন বলে জানা যায়।[৩২]

শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ও ধর্মঘট চলাকালে এ আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশ এবং শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট পুর্নবিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশের চাহিদার সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গতি বিধানের জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানিয়ে ঢাকার আটজন নেতৃস্থানীয় নারী একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, 'সার্বজনীনভাবে শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করার পরিবর্তে শুধুমাত্র সংস্কারের ব্যবস্থা করা হইলে শিক্ষার অঙ্গন আরও অধিকতর নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত হইয়া পড়িবে।' বিবৃতিদাতারা বলেন যে, 'জাতির ভবিষ্যৎ অপরিহার্যভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত সম্পৃক্ত।' এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা নব পর্যায়ে সমস্যার মূলানুসন্ধান এবং জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা ও জাতীয় স্বার্থের আলোকে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি নতুন শিক্ষা কমিশন নিয়োগের দাবি জানান। উক্ত বিবৃতিতে আরো বলা হয় যে, 'কমিশনের রিপোর্টে প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয় নাই এবং রিপোর্টে শিক্ষা ফি যেভাবে বৃদ্ধির কথা বলা হইয়াছে উহাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছেলে-মেয়েদের প্রেরণের সুযোগ হইতে জনসাধারণের বিরাট অংশকে বঞ্চিত করা হইবে।'[৩৩] বিবৃতিতে স্বাক্ষরদানকারী ৮ জন নারীনেত্রী ছিলেন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য বেগম রোকাইয়া আনোয়ার, বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯), বেগম হাজেরা মাহমুদ, বদরুন্নেসা আহমদ (১৯২৪-১৯৭৪), বেগম নূরজাহান মোর্শেদ (১৯২৪-২০০৩), মিসেস আমেনা বেগম, বেগম কামরুন্নাহার লাইলী ও বেগম রায়সা হারুন।

আগস্ট মাসের শেষ থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন কিছুটা মন্থর হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে পুনরায় পূর্ববাংলায় প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট শুরু হয়। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবীতে ছাত্র ধর্মঘটের সমর্থনে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জসহ প্রদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালন করা হয়। ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, কায়েদে আজম কলেজের শিক্ষার্থীরা পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে। ঢাকার গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ও ইডেন গার্লস কলেজের ছাত্রীরাও ক্লাস বর্জন করে ধর্মঘট পালন করে।[৩৪] ঢাকার বাইরেও প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র ধর্মঘট ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে যশোরে তারাপ্রসন্ন বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা একটি মিছিল বের করেছিলেন। এ মিছিলে সেখানকার মোমেনশাহী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও অংশ নিয়েছিলেন। ঝিনাইদহেও ধর্মঘট পালিত হয়। এ উপলক্ষে ঝিনাইদহ ডাক বাংলোর সামনে ঝিনাইদহ মহকুমা ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঝিনাইদহ কলেজের ছাত্রী মিস বদরুন্নেসা এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। সম্মেলনে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল ও বর্তমান ব্যয়বহুল শিক্ষা পদ্ধতির নিন্দা করে কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল।[৩৫]

১৯৬২ সালের ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে শিক্ষা কমিশন বিরোধী ছাত্রদের আন্দোলন ও বিক্ষোভ সর্বাত্মক রূপ লাভ করে। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আন্দোলনের মূল কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছিল। প্রায় প্রতিদিনই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিলসহ নানা কর্মসূচি পালিত হচ্ছিল। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কলাভবনের আমতলায় অনেকগুলো ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এসব সভা ও সভা শেষে পরিচালিত বিক্ষোভ মিছিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছাড়াও ঢাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী যোগ দিতেন। এসব শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইডেন কলেজ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের ছাত্রী নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সাধারণ ছাত্রীরাও অংশ নিতেন। এদের মধ্যে ইডেন কলেজের নেত্রী মতিয়া চৌধুরী, জিএস মিস নাজমা রহমান এবং গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের নাজমা আহমদের কথা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এদের বাইরেও আরো কয়েকজনের ছাত্রীর সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা জানা যায়। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মমতাজ বেগম (১৯৪৬-২০২০)। শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে পরিচালিত আন্দোলনে তিনিও সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন।[৩৬] তিনি বলেন, কলেজ কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মতিয়া চৌধুরীর নেতৃত্বে পরিচালিত ইডেন কলেজের শিক্ষার্থীদের মিছিল মিটিং-এ তিনি নিয়মিত অংশ নিয়েছেন। এ সময় তিনি ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। মূলত শেখ ফজলুল হক মনি ও ভিপি এনায়েতুর রহমানের উৎসাহেই তিনি ছাত্রলীগের রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছিলেন বলে জানান। ছাত্রলীগের একজন কর্মী হিসেবে বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনে অংশ নিতে যেয়ে তিনি সে-বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেননি। পরে তিনি কুমিল্লা মহিলা কলেজ থেকে এইচএসসি ও স্নাতক সম্পন্ন করেন।[৩৭] তবে মমতাজ বেগম তাঁর সাক্ষাৎকার প্রদানের সময় বার বার 'হামদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের' বিরুদ্ধে শিক্ষা আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন। এমনকি তাঁর নিজের রচিত গ্রন্থেও ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন হামদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৮] এ শিক্ষা আন্দোলনে যুক্ত হওয়া আরেক নারী হলেন রওশন আরা বেগম।[৩৯] তিনি আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছাত্রনেতা আবদুর রাজ্জাকের উৎসাহে ছাত্রলীগে যোগ দিয়েছিলেন। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইডেন কলেজের ভেতর মিছিল মিটিং আহ্বান করলে রওশন আরা বেগম তাতে নিয়মিত অংশ নিতেন। শিক্ষা আন্দোলনের সময় তিনি ইডেন কলেজের ছাত্রী মাহফুজা খানম, হোসনে আরা বেবী ও লুৎফুন্নেসাসহ অনেকের সাথে কাজ করতেন।[৪০]

ডাকসুর সাবেক ভিপি (১৯৬৬-১৯৬৭) এবং শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মাহফুজা খানম স্বনামেই পরিচিত। গবেষককে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক মাহফুজা খানম জানান ১৯৬২ সালে তিনি ইডেন কলেজের উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিলেন। এর আগে তিনি বাংলাবাজার গার্লস স্কুলে লেখাপড়া করেন এবং ১৯৬১ সালে সে-স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। তিনি জানান, বাংলা বাজার গার্লস স্কুলে পড়ার সময়ই তিনি ছাত্র রাজনীতির প্রতি উৎসাহিত হন এবং ইডেন কলেজে ভর্তি হয়েই ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দেন। তিনি ইডেন কলেজে মতিয়া চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন ছাত্র ইউনিয়ন প্যানেল থেকে কলেজ সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন। মাহফুজা খানমও ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। শিক্ষা আন্দোলনের সকল কর্মসূচিতে তিনি অংশ নিতেন। তিনি তাঁর গ্রন্থেও লিখেছেন 'সভা, সমাবেশ ও মিছিলে কলেজ থেকে যাওয়া শুরু করলাম মতিয়া চৌধুরীর নেতৃত্বে। তখন সভা হতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় (যা এখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অংশ)।'[৪১] মিছিলে অংশ নিয়ে পুলিশের লাঠিচার্জে

মাহফুজা খানমের ডান হাত ভেঙ্গে গিয়েছিল। মাহফুজা খানম পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৬৬-৬৭ সালে ছাত্র ইউনিয়নের প্রার্থী হিসেবে ডাকসু নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ভিপি নির্বাচিত হন।

ইডেন কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী আরেকজন ছিলেন কাজী তামান্না। এছাড়া ছিলেন নোয়াখালী রামগঞ্জের মেয়ে এডলিন মালাকার, যিনি চারু ও কারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্রী, তিনি বাংলাদেশের একজন প্রগতিশীল নারী নেত্রী হিসেবেও সুপরিচিত। এ সময় ছাত্রনেতা ও কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী গোপেশ মালাকারের সাথে তাঁর বিয়ে হয় এবং স্বামীর উৎসাহে তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত হন। ১৯৬২ সালের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে শিক্ষা আন্দোলনের সকল কর্মসূচিতে অংশ তিনি নিয়েছিলেন।[৪২] এ প্রসঙ্গে ইডেন কলেজের ছাত্রী মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্তের কথাও স্মরণ করা যায়। তাঁর প্রকৃত নাম মঞ্জুশ্রী নিয়োগী। পৈত্রিক নিবাস ময়মনসিংহের শেরপুরে। তাঁর মা জোৎস্না নিয়োগী ছিলেন তেভাগা, টংক ও ভাওয়ালী আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় সংগঠক ও নেত্রী। প্রগতিশীল সংস্কৃতিকর্মী আশোক দাসগুপ্তের সাথে পরিণয়সূত্রে তিনি মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্তা নামে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৬২ সালে মঞ্জুশ্রী ইডেন কলেজের উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। তিনি একজন সংস্কৃতি কর্মী হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। বুলবুল ললিতকলা একাডেমিতে তিনি সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে ইডেন কলেজে তাঁর সহপাঠী কাজী তামান্নাসহ তিনি শিক্ষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। তিনি আন্দোলন কর্মসূচির মিছিল সমাবেশে নিয়মিত অংশ নিতেন। তাছাড়াও একজন সংস্কৃতি কর্মী হিসেবে আন্দোলনকে উদ্দীপ্ত করার জন্য আয়োজিত প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও তিনি অংশগ্রহণ করতেন।[৪৩] ইডেন কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে এ আন্দোলনে অংশ নেয়া আরেকজন ছিলেন আইভি রহমান। প্রকৃত নাম জেবুন নাহার আইভি বাংলাদেশের খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ ও প্রয়াত সাবেক রাষ্ট্রপতি এডভোকেট জিল্লুর রহমানের সাথে বিয়ে হওয়ায় তিনি আইভি রহমান নামে পরিচিতি লাভ করেন। আইভি রহমান নিজেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে সুপরিচিত জন। তিনি বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রীসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। ১৯৬১ সালে তিনি ইডেন কলেজে ভর্তি হন এবং একজন সক্রিয় নারী কর্মী হিসেবে বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনে অংশ নেন।[৪৪] শিক্ষা আন্দোলনে অংশ নেয়া ইডেন কলেজের একজন ছাত্রী নেত্রীর নাম ছিল লিলি রহমান। মতিয়া চৌধুরীর সাথে তিনিও সকল কর্মসূচিতে অংশ নিতেন এবং আন্দোলনকে উজ্জীবিতকরণে ভূমিকা রাখেন।[৪৫]

শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে ঢাকার বাইরে পরিচালিত আন্দোলনে নারী শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের কথা জানা যায়। বরিশালে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় একজন ছিলেন উষারাণী চক্রবর্তী। তিনি শুধু ছাত্রসমাজের আহুত বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেননি। ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের সপক্ষে সংগঠিত করার জন্য প্রচার কাজও করেছিলেন। এ কাজে তৎপর আরেকজন ছিলেন অঞ্জু গাঙ্গুলী। তিনি ছিলেন বরিশাল অঞ্চলের কিংবদন্তী নেত্রী চারুবালা গাঙ্গুলীর জ্যেষ্ঠ্য কন্যা। মা-বাবা ছাড়াও তিনি মনোরমা বসু, জীবনপ্রভা বিশ্বাস এবং

পূর্বোক্ত উষারাণী চক্রবর্তী প্রমুখ নারী নেত্রীদের সাহচর্য পেয়েছিলেন। তিনি বরিশাল সদর গার্লস স্কুলে অধ্যয়নকালীন সময়েই ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সাথে যুক্ত হন এবং এ সংগঠনের একজন কর্মী হিসেবেই বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট হন। তিনি এ আন্দোলনে একজন সংগঠক হিসেবে কাজ করেছিলেন। শিক্ষা আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ছাড়াও ছাত্র ইউনিয়নের হয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন এ নারী।[৪৬] বরিশালে পরিচালিত শিক্ষা আন্দোলনের আরেক পরিচিত মুখ ছিলেন শিশিরকণা ভদ্র। পারিবারিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা শিশিরকণা নিজেও ছিলেন একজন পরিচিত সংস্কৃতি কর্মী। ১৯৬২ সালে তিনি বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন এবং কলেজ শাখা ছাত্র ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক সম্পাদকও ছিলেন। শিক্ষা আন্দোলনের অংশ হিসেবে শিশিরকণা রাস্তার পাশে, ক্লাব বা বাড়ীর ছাদে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশ নিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে সংগঠিত করার দায়িত্ব পালন করতেন। শুধু তাই নয়, তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জাগরণমূলক গান পরিবেশন করে আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতেন। একাজে তাঁর সহযোগী নারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নূরজাহান, সুলতানা রেবু, দেবী শর্মা, সুফিয়া ইসলাম প্রমুখ।[৪৭]

বরিশালে শিক্ষা আন্দোলনে অংশ নেয়া পূর্বোক্ত নারী সদস্যদের মধ্যে সুলতানা রেবু পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র নির্দেশনা দপ্তরের উপ-পরিচালক হয়েছিলেন। তিনি একজন নাট্যাভিনেত্রী হিসেবে মঞ্চ ও টেলিভিশনে অভিনয় করতেন। সুফিয়া ইসলাম ছিলেন বরিশালের কিংবদন্তী নারীনেত্রী মনোরমা বসুর (মাসিমা) শিষ্য। তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজে পড়ার সময়ই তিনি শিক্ষা আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন এবং আন্দোলনের সব ধরনের কর্মসূচিতে অংশ নেন। '৬২ সালের আন্দোলনের সময় তাঁকে ১১ মাসের শিশু সন্তানসহ গ্রেফতার করা হয়েছিল। অবশ্য কিছু দিন পর তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়।[৪৮]

টাঙ্গাইলেও শিক্ষা আন্দোলনের ব্যাপ্তি ঘটে ছিল। টাঙ্গাইলে পরিচালিত এ আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছিল ছাত্র ইউনিয়ন। এ সংগঠনের ফজলুর রহমান মিঠু, বরুণ রায়, নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস, বুলবুল খান মাহবুব ও আতিকুর রহমান প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দ শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনায় নেতৃত্ব দেন। তাঁদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন কুমুদিনী মহিলা কলেজের ছাত্রী শেফালী দাস। তিনি ছাত্র ইউনিয়নের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবেই এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি কেবল নিজে শিক্ষা আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিতেন না বরং তাঁর সহপাঠী মেয়েদেরও সংগঠিত করে মিছিল ও সমাবেশে নিয়ে যেতেন।[৪৯] টাঙ্গাইলে শিক্ষা আন্দোলনে অংশ নেয়া আরেকজনের কথা জানা যায়, তিনি হলেন রাফিয়া আখতার ডলি। তিনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে একজন পরিচিত মুখ। বীর মুক্তিযোদ্ধা রাফিয়া আখতার ডলি ১৯৭০ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন জাতীয় পরিষদের বয়োকনিষ্ঠ সদস্য। বর্তমান গবেষককে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে মিসেস রাফিয়া আখতার ডলি জানান, ১৯৬২ সালে তিনি

টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী স্কুলে দশম শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। দেশব্যাপী শিক্ষা আন্দোলন শুরু হলে তিনিও এর সাথে যুক্ত হন এবং নিজে নেতৃত্ব দিয়ে বিন্দুবাসিনী স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষা আন্দোলনের মিছিল সমাবেশসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেন। শুধু তাই নয়, শিক্ষা আন্দোলনের সমর্থনে টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সমাবেশে রাফিয়া আখতার ডলি তাঁর স্কুলের ছাত্রীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য দিতেন বলেও তিনি তাঁর সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেন।[৫০] বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনে অংশ নেয়া টাঙ্গাইলের আরেকজন ছাত্রী ছিলেন নাজমি আরা খন্দকার রুবী। তিনি আন্দোলনের কর্মসূচিতে অংশ নেয়া ছাড়াও পোস্টার লাগানো এবং আন্দোলনে সম্পৃক্ত হতে নারী শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধকরণের কাজ করতেন বলে জানা যায়।[৫১]

দিনাজপুরে পরিচালিত শিক্ষা আন্দোলনে অংশ নেয়া একজন নেতৃস্থানীয় নারী কর্মীর কথা জানা যায়। তিনি হলেন আজাদী হাই। ১৯৬২ সালে দিনাজপুর এন এস কলেজের ছাত্রী থাকা অবস্থায় তিনি এ আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি আন্দোলনের সব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ছাড়াও শিক্ষা আন্দোলনের কারণে যেসব শিক্ষার্থীদের গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁদের মুক্তির জন্যও কাজ করেছিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি ফেরদৌসী ছদ্মনাম নিয়ে বিভিন্ন মহল্লায় গিয়ে অর্থ সংগ্রহের কাজ করেছেন। তাছাড়াও প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি কবিতা আবৃত্তি করতেন।[৫২] উল্লেখ্য শিক্ষা আন্দোলনে আজাদী হাইয়ের সাথে তাঁর আরো ১০/১২ জন সহপাঠী নারী শিক্ষার্থী যুক্ত ছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মম এবং মঞ্জু।

ময়মনসিংহের নেত্রকোনায়ও শিক্ষা আন্দোলনের ঢেউ লেগেছিলো। নেত্রকোনা উচ্চ-বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সৈয়দা মনিরা আক্তার খাতুন ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে অংশ নেন এবং বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগদান করেন। তিনি শিক্ষা আন্দোলনের পক্ষে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করাসহ আন্দোলনের পোস্টার লাগানো, ছাত্রীদের মধ্যে প্রচারপত্র বিলি করার দায়িত্ব পালন করেন।[৫৩] এছাড়াও এ বিদ্যালয়েরই নবম শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন আয়েশা খানম। তিনি অল্প বয়সেই ছাত্ররাজনীতির সাথে যুক্ত হন এবং বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনে অংশ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আয়েশা খানম নিয়মিত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ছাড়াও আন্দোলনের পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড লেখা ও আন্দোলনে অংশ নেয়ার জন্য ছাত্রীদের সংগঠিত করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[৫৪] নেত্রকোনায় শিক্ষা আন্দোলনে অংশ নেয়া আর যেসব ছাত্রীর নাম পাওয়া যায় তাদের মধ্যে দিপালী চক্রবর্তী ও গৌরী বিশ্বাস অন্যতম।[৫৫] যশোর এবং বগুড়াতেও এ আন্দোলনে নারী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ছিল। বগুড়ার আন্দোলনে সক্রিয় একজন নারী শিক্ষার্থী ছিলেন বেগম মমতা হেনা। অন্যদিকে যশোরে নেতৃত্বস্থানীয় নারী আন্দেলনকারীর নাম ছিল রওশন জাহান সাথী।[৫৬]

১৭ সেপ্টেম্বর কর্মসূচি : বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়

১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শুরু থেকেই শরীফ কমিশনের সুপারিশকৃত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন জোরদার হতে শুরু করে। এসময় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সাড়া

দিয়ে সারা প্রদেশ এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও আন্দোলন কর্মসূচি পালিত হয়। এসব আন্দোলনের কিছু দৃষ্টান্ত উপরে আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ ১০ই সেপ্টেম্বর সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল। তবে সরকার ঐদিন সবিচালয় এলাকায় ১৪৪ ধারা জারিসহ এক প্রেসনোটের মাধ্যমে কর্মসূচি প্রত্যাহারের আবেদন জানায়। অন্যথায় পরিস্থিতি মারাত্মক হবে বলে হুমকি দেয়।[৫৭] উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সংঘাত এড়ানোর লক্ষ্যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১০ই সেপ্টেম্বরের কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেয়, তবে ১৭ই সেপ্টেম্বর পূর্ববাংলায় এক সর্বাত্মক হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করে। কর্মসূচি সফল করার জন্য প্রতিদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে খণ্ড মিছিল, পথসভাসহ কর্মসূচিতে ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশাজীবীদের সমর্থন আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এসব কর্মসূচিতে ইডেন কলেজসহ ঢাকা ও ঢাকার বাইরের বালিকা বিদ্যালয় ও মহিলা কলেজসমূহ ভূমিকা রেখেছিল। হরতাল কর্মসূচিকে সফল করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ১৬ই সেপ্টেম্বর রাতে ডাকসু অফিসে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ডাকসু নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এখানে অংশ নিয়েছিলেন। এর মধ্যে ইডেন কলেজের ছাত্রী সংসদের ভিপি ছাত্র ইউনিয়ন নেত্রী মতিয়া চৌধুরী ও জিএস নাজমা বেগমও উপস্থিত ছিলেন।[৫৮]

পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৭ই সেপ্টেম্বর খুব ভোরেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এসে জমায়েত হতে শুরু করে এবং সকাল ৯টার মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা লোকারণ্য হয়ে যায়। সকাল ১০টায় একটি সমাবেশের মাধ্যমে কর্মসূচি শুরু হওয়ার কথা থাকলেও এর আগেই ক্যাম্পাসে খবর আসে যে নবাবপুর এলাকায় পুলিশ মিছিলে গুলি চালিয়েছে এবং একজন শাহাদাৎ বরণ করেছেন। ফলে উপস্থিত শিক্ষার্থীরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। উত্তেজনার মধ্যেই ছাত্র ইউনিয়নের কাজী জাফর আহমেদ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। পরে শুরু হয় বিক্ষোভ মিছিল। কাজী জাফর আহমেদ, সিরাজুল আলম খান, মফিজুর রহমান, মহিউদ্দিন আহমেদ, হায়দার আকবর খান রনো, রাশেদ খান মেনন, আইয়ুব রেজা চৌধুরী, রেজা আলী প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে মিছিলসহ নবাবপুরের দিকে অগ্রসর হন। আবদুল গণি রোড ধরে মিছিলটি অগ্রসর হওয়ার সময় হাইকোর্ট ভবনের সামনে অবস্থান নেয়া পুলিশ বাহিনী পিছন থেকে মিছিলের উপর গুলি চালায়। এ কর্মসূচিতে অন্য নারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে অংশ নিয়েছিলেন বিশিষ্ট নারী নেত্রী ড. মালেকা বেগম। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সম্মান শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। ইডেন কলেজে অধ্যয়নের সময় থেকেই তিনি ছাত্রদের আন্দোলন সংগ্রামে সক্রিয় ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পর তিনি ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনের ১৭ সেপ্টেম্বর কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:

> ছাত্র সংগঠনের ডাকে শিক্ষাদিবসে প্রতিবাদ মিছিলে যোগে দেয়ার প্রথম অভিজ্ঞতা আজও মনে আছে। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ সালে সশস্ত্র পুলিশ ও ছাত্রীরা মুখোমুখি, পেছনে ছাত্র নেতারা আক্রমণের মুখে সকলেই পিছু হটলেন। আমি অনভিজ্ঞ, পিছু হটার কথা মোটেও ভাবিনি । হঠাৎ শুনি 'পালাও পালাও' এবং একটানে

> একজন আমাকে নিয়ে চলে গেলেন পথের ধারে বড় ড্রেনের আবডালে। ময়লা পানি, কাচে পা কেটে রক্ত পড়ছে, সেই অবস্থায় দেখি যিনি আমাকে টেনে এনেছেন তিনি সাংবাদিক-লেখক ফয়েজ আহমেদ।[৫৯]

১৭ই সেপ্টেম্বর পুলিশের সাথে ব্যাপক সংঘর্ষে বহু লোক হতাহত হয়েছিল। সরকারি প্রেসনোটে ১ জন নিহত, ৭৩ জন আহত এবং ৪৯ জন আন্দোলনকারীর গ্রেপ্তারের কথা বলা হয়েছিল।[৬০] আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে বাবুল, বাস কন্ডাক্টর গোলাম মোস্তফা এবং গৃহভৃত্য ওয়াজিউল্লাহ এই তিনজনের শাহাদাৎ বরণের কথা এবং প্রায় আড়াই'শ জনের আহত হওয়ার দাবি করা হয়। ঢাকার বাইরে যশোর ও চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জেলা শহরেও ব্যাপক প্রতিরোধ কর্মসূচি পালিত হয়। *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ১৭ই সেপ্টেম্বর বিভিন্ন জেলায় ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করে। কুষ্টিয়ায় শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মঘট পালন করা হয়। রাস্তাঘাটে কোন যানবাহন দেখা যায়নি। ময়মনসিংহে ছাত্র ও জনসাধারণ হরতাল পালন করে। ছাত্র ও জনসাধারণ আনন্দমোহন কলেজ হতে ১০ হাজার ছাত্র ও জনসাধারণ মিছিলে অংশগ্রহণ করে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ছাত্রীরা প্রথমে মিছিলে যোগদান করে। তাছাড়া দিনাজপুর, ফরিদপুর, রাজশাহী, পিরোজপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাবনায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালিত হয়। মেহেরপুরে বহুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এক শোভাযাত্রা বের করে। ছাত্ররা তাদের দাবির সমর্থনে শোভাযাত্রায় বিভিন্ন ধ্বনি দিতে দিতে শহর প্রদক্ষিণ করে। ছাত্ররা স্থানীয় পরিষদ সদস্য জনাব আবুল হায়াতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে ছাত্রদের দাবি সমর্থন করবেন বলে তাদের আশ্বাস দেন। শোভাযাত্রার পর জনাব আকবর আলীর সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মোসাম্মৎ রোকসানা খাতুন, সিরাজুল ইসলাম ও অপরাপর ছাত্র নেতা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের তীব্র নিন্দা করে বক্তব্য রাখেন।[৬১]

১৭ই সেপ্টেম্বরের হত্যাকাণ্ড ও সরকারি নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ প্রদেশব্যাপী তিন দিনের শোকপালন কর্মসূচি ঘোষণা করে। ১৮ই সেপ্টেম্বর সকালে সলিমুল্লাহ হলে নিহতদের গায়েবানা জানাজা আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়।

নগ্নপায়ে শোকর্যালিতে ছাত্রীদের অংশগ্রহণের একটি আলোকচিত্র ১৯ সেপ্টেম্বর *The Pakistan Observer* ও *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সরকারি নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে বিবৃতি দেন পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য তোফাতুন্নেসা আজিম। এ ঘটনার প্রতিবাদে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাও একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। বিবৃতিতে এ ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি প্রদান এবং আহত ও নিহতদের পরিবারের সদস্যদের যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানানো হয়। বিবৃতিদাতাগণ অবিলম্বে সরকারকে ছাত্র ও অভিভাবকদের ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, অন্যথায় পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে।[৬২]

ঢাকা ও পূর্ব বাংলার অন্যান্য স্থানে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ, কয়েকজনকে হত্যার প্রতিবাদ এবং শরীফ কমিশন শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি ও অন্যান্য শহরে ছাত্র বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ ও ১৯শে সেপ্টেম্বর বিখ্যাত *Dawn* পত্রিকায় এ বিষয়ে গুরুত্বের সাথে সচিত্র সংবাদ ছাপা হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর ইডেন কলেজের শিক্ষার্থীরা কলেজ গেইটে কালো পতাকা উত্তোলন এবং কালো ব্যাজ ধারণ করে নগ্নপদে কলেজ আসে এবং বিক্ষোভ মিছিল করে।[৬৩] ১৭ই সেপ্টেম্বরের পুলিশী নিপীড়নের প্রতিবাদে ১৯শে সেপ্টেম্বর বিকালে রাজধানী ঢাকার পুরানা পল্টনে কবি বেগম সুফিয়া কামালের সভাপতিত্বে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গত মঙ্গলবার ছাত্র সাধারণের শান্তিপূর্ণ মিছিলে অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের উপর নির্যাতন এবং তাদের প্রতি মিলিটারির দুর্ব্যবহারে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। সভায় অপর প্রস্তাবে সরকারের নিকট সমগ্র পরিস্থিতির নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করে, শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং আহত নিহতদের ক্ষতিপূরণ দাবিসহ তাদের পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি জানান।[৬৪]

১৭ তারিখের ঘটনার প্রতিবাদে ২০শে সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহে এক শোক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এতে প্রায় ৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রী অংশ নিয়েছিল। *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, এতে বহুসংখ্যক ছাত্রী যোগদান করে। শোভাযাত্রা শেষে এক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ছাত্রীরাও উপস্থিত হয়। মোমেনশাহীতে এই প্রথম ছাত্রীরা শোভাযাত্রা এবং ছাত্রসভায় অংশগ্রহণ করে। কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট হাবিবুল আলম ও ছাত্রীদের কমনরুম সেক্রেটারী হাবিবা বেগম সভায় বক্তৃতা করেন। তাছাড়া রংপুর ও নারায়ণগঞ্জেও ঐদিন প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে *আজাদ* পত্রিকার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।[৬৫]

২১শে সেপ্টেম্বরও দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ২২শে সেপ্টেম্বর ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী পাঞ্জাবী লেন গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন মেহেরুন্নেসা, আসমা খাতুন, রুনু, শিরিন, মিনু প্রমুখ ছাত্রী নেত্রী।[৬৬] তাছাড়া ঢাকায় সংগঠিত ১৭ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে খুলনার ছাত্রদের মাঝেও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। ছাত্ররা খুলনার মহিলা কলেজের ছাত্রীদের ক্লাশ বর্জন করে মিছিলে অংশ নেয়ার আহ্বান জানালে কাজী মমতা হেনা (আই. এ. ক্লাশের ছাত্রী) তাতে সাড়া দেন এবং অধ্যক্ষের নিষেধ অমান্য করে ছাত্রীদের নিয়ে প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেন। খুলনা পিটিআই স্কুলের ছাত্রী কৃষ্ণা দাশও প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নেন।[৬৭] এছাড়াও এদিন ঢাকার বাইরে বগুড়া, কুড়িগ্রাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা এবং কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। শাহজাদপুরে ছাত্রনেতাদের আহ্বানে শত শত ছাত্র-ছাত্রী স্কুল ত্যাগ করে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল কর, ছাত্র বহিষ্কার আদেশ বাতিল কর, দুই বৎসরের ডিগ্রি কোর্স চালু কর প্রভৃতি ধ্বনি সহকারে রাস্তা প্রদক্ষিণ করে আবুল মনসুর খানের সভাপতিত্বে এক সভায় মিলিত হয়ে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল, কুমিল্লার ৫ জন ছাত্রী ও করাচীর ১২ জন ছাত্রের উপর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।[৬৮] ঢাকায় শিক্ষার্থীদের আন্দোলন কর্মসূচিতে

গুলীবর্ষণ ও হতাহতের ঘটনার প্রতিবাদে ২২শে সেপ্টেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানে সাধারণ ছাত্রধর্মঘট পালিত হয়। এদিন রাজধানী করাচি, পিন্ডি ও অন্যান্য শহরে ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। এসব সমাবেশ থেকে ঢাকার ঘটনায় নিন্দা জানানো হয় এবং শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবি জানানো হয়। করাচির ৮ জন প্রতিনিধি শিক্ষা ও তথ্যমন্ত্রী ফজলুল কাদের চৌধুরীর সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া তুলে ধরে।[৬৯]

১৯৬২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা পল্টন ময়দানে এক ছাত্র সমাবেশ আহ্বান করে। আহুত এ সমাবেশ থেকে আইয়ুব খানের শিক্ষা নীতি বাতিল ও হত্যার বিচারসহ আরো কিছু দাবি মানার জন্য সরকারের উদ্দেশ্যে চরমপত্র জারি করে।

২৪শে সেপ্টেম্বর পল্টন ময়দানের উপর্যুক্ত ছাত্রসভায় প্রদত্ত চরমপত্রের মাধ্যমেই প্রকৃতপক্ষে ছাত্রসমাজের শিক্ষা আন্দোলনের আপাতত সমাপ্তি ঘটেছিল। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর গোলাম ফারুকের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। তাঁরই পরামর্শে সরকার শরীফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন স্থগিত রাখার ঘোষণা দেয়। একই সাথে ১৯৬৩ সালে সকল ছাত্র স্নাতক পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা না নিয়েই ডিগ্রি দেয়ার কথা ঘোষণা করে। এভাবে আংশিক বিজয়ের মাধ্যমে ১৯৬২-র ছাত্র আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

উপসংহার

১৯৪৭-১৯৭১ পর্যন্ত পশ্চিমা স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার পরিচালিত আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যবাহী ঘটনা। বস্তুত, শরীফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টটি ছিল প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও তাঁর সহযোগী পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক চেতনাসঞ্জাত বাঙালির জাতীয় স্বার্থ বিরোধী। এক কথায় বলতে গেলে শরীফ কমিশনের সুপারিশমালা ছিল শিক্ষার সর্বজনীন অধিকার পরিপন্থি ও প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতার পরিচায়ক। শিক্ষাকে পণ্য বা সামাজিক পুঁজি হিসেবে বিবেচনা করে কমিশন। আলোচ্য শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনার কৌশল হিসেবে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার অপচেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু পূর্ববাংলার মানুষ বিশেষ করে সচেতন ছাত্রসমাজ আইয়ুব খানের এ প্রতিক্রিয়াশীল, গণবিরোধী ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী শিক্ষানীতি মেনে নেয়নি। গণবিরোধী শিক্ষানীতি বাতিল করে সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ প্রতিষ্ঠা এবং একটি গণমুখী বিজ্ঞানমনস্ক অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সহজলভ্য আধুনিক শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা অর্জনের লক্ষ্যে ছাত্র সমাজ দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। প্রবল ছাত্র আন্দোলন ও প্রতিরোধের মুখে শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তাঁর শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন স্থগিত করতে বাধ্য হন।

১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পূর্ববাংলার প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে নারী সমাজের উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ ছিল। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনও এর

ব্যতিক্রম নয়। তবে অন্যান্য ঘটনার মতো শিক্ষা আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টিও ইতিহাসবিদদের রচনায় বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। ফলে এ আন্দোলন কর্মসূচিতে নারী সমাজের অংশগ্রহণের সার্বিক চিত্র ও প্রকৃতি নির্ণয় কঠিন। যেসব সূত্রে নারীদের অংশগ্রহণের কথা পাওয়া যায় সেখানেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে অংশগ্রহণকারী নারীদের পরিচয় ও ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়নি। তদানিন্তন ছাত্র ইউনিয়ন নেত্রী এবং ইডেন কলেজের ভিপি মতিয়া চৌধুরীর কথা পুনশ্চ উল্লেখ করা যেতে পারে। আলোচ্য শিক্ষা আন্দোলনে তিনি ছিলেন অন্যতম সম্মুখসারির যোদ্ধা। অগ্নিকন্যা[৭০] নামে খ্যাত মতিয়া চৌধুরী ছিলেন একজন তুখোড় ও অনলবর্ষী বক্তা। একজন সাহসী ও সুদক্ষ সংগঠক হিসেবেও তিনি ছিলেন সুপরিচিত। তাঁর সাংগঠনিক তৎপরতা ও ক্যারিশমাটিক নেতৃত্ব দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শুধু ইডেন কলেজ নয়, ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরাও শিক্ষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেকেই প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথেও যুক্ত হয়েছিলেন। ঢাকার বাইরেও নারী শিক্ষার্থীরা এ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং এদের অনেকেই পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের মধ্যে যেমন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্রী ছিলেন, তেমনি মাধ্যমিক ও স্কুলের ছাত্রীদেরও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখা যায়। প্রসঙ্গত বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯৬২ সালে আজিমপুর গার্লস স্কুলে অধ্যয়নের সময় তিনি তাঁর সহপাঠীদের সাথে মিছিলসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে শিক্ষা আন্দোলনের কর্মসূচিতে যোগ দিতেন। ১৯৯৯ সালে ১৮ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চল্লিশতম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক ডক্টর অব ল' ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতাদানকালে প্রধানমন্ত্রী ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে স্কুল ছাত্রী হিসেবে তাঁর যোগদানের কথা উল্লেখ করেছেন।[৭১] তবে এ কথা বলা যায় যে, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনে নারী শিক্ষার্থীদের ভূমিকা ছাত্রদের মতোই বহুমাত্রিক ছিল। এ আন্দোলনে মতিয়া চৌধুরী, নাজমা আহমদ, নাজমা রহমান প্রমুখ ঢাকায় যেমন সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছেন, ঢাকার বাইরেও কোন কোন জায়গায় নারী শিক্ষার্থীদের এ আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় সংগঠকের ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ বা স্থানীয় পর্যায়ের সংগঠন কর্তৃক আহুত বিভিন্ন মিছিল-সমাবেশে অংশ নিতেন। তারাও ছাত্রদের মতো প্ল্যাকার্ড বহন এবং আন্দোলনে ব্যবহৃত প্রতিবাদী শ্লোগান দিতেন। প্রতিবাদী প্ল্যাকার্ড ও পোস্টার লেখা, পোস্টার লাগানো, আন্দোলনের জন্য অর্থসংগ্রহ এবং প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে কবিতা আবৃত্তি এবং জাগরণীমূলক সংগীত পরিবেশন ইত্যাদি কাজেও নারী শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের তথ্য পাওয়া যায়। আর এসব কাজ করতে গিয়ে সংখ্যায় কম হলেও নারী শিক্ষার্থীদের পুলিশী নির্যাতনে আহত হওয়া এবং গ্রেফতার বরণের মতো পরিস্থিতিও মোকাবিলা করতে হয়েছে। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে তৎকালীন জাতীয় রাজনীতিতে অংশ নেয়া নারীদের উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা দেখা যায় না। ৮ জন বিশিষ্ট নারী নেত্রীর একটি বিবৃতি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঘটনার পর প্রাদেশিক পরিষদের একজন নারী সদস্যের বিবৃতি এবং কবি সুফিয়া কামালের সভাপতিত্বে একটি প্রতিবাদী সমাবেশ ছাড়া তাঁদের আর তেমন কোনো তৎপরতার কথা জানা যায় না। অবশ্য একই

কথা পুরুষ জাতীয় নেতাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বস্তুত, চার বছর ধরে চলমান আইয়ুব খানের সামরিক শাসনাধীনে আরোপিত বিধিনিষেধের বেড়াজাল মুক্ত হয়ে তখনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মতো পরিবেশ জাতীয় রাজনীতিবিদদের জন্য তৈরি হয়নি। তাই এ আন্দোলনের প্রতি তাঁদের অনেকের মৌন সমর্থন থাকলেও তাঁরা ছাত্রদের পাশে এসে প্রকাশ্যে দাঁড়াতে পারেননি।

সার্বিকভাবে বলা যায়, এটি শিক্ষা আন্দোলন হিসেবে পরিচালিত হলেও আমাদের জাতীয় ইতিহাসে বাষট্টির এ ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক গুরুত্ব কোনোভাবেই উপেক্ষণীয় নয়। ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন ছিল আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারির পর প্রথম গণআন্দোলন। এ আন্দোলনের মাধ্যমে আইয়ুব খানের রক্তচক্ষুর প্রতি বাঙালির ভয় ও আতঙ্কের অবসান ঘটে। রাজনৈতিক স্থবিরতা কেটে যায়, পূর্ববাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে চাঙ্গাভাব জাগ্রত হয়। এর মাধ্যমে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর গণআন্দোলনের দ্বার উন্মুক্ত হয়। একটি শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে যে এত ব্যাপক ও বিশাল ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে, তা অনেকের কাছেই অকল্পনীয় ছিল। পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজ প্রমাণ করে দেয় জাতীয় স্বার্থরক্ষায় তারা কতটা আপোষহীন ও সংগঠিত হতে পারে। শুরুতে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনটির রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে, তবে এটি যে কালক্রমিক ধারায় রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। এ কারণেই ছাত্রদের আন্দোলন আর নিছক শিক্ষার দাবিতেও সীমাবদ্ধ ছিল না। এই আন্দোলন জাতিগত নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল। এর পরবর্তী পর্যায়ে ইতিহাসের নানা বাঁক ঘুরে ১৯৭০-এর নির্বাচন এবং একটি রক্তস্নাত মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে পূর্ব বাংলার নারী শিক্ষার্থীরা যে ভূমিকা পালন করেছিল তা পরে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে তাদের জন্য আরো বৃহত্তর অবদানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। আজকের বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের যে গৌরবময় অবস্থান এর পেছনেও বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনে নারীদের ভূমিকার যোগসূত্র অস্বীকার করার অবকাশ নেই।

তথ্যনির্দেশ

১. S A Akhand, "The 1962 Constitution of Pakistan and the Reaction of the People of Bangladesh", *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies,* Vol. III, 1978, p.71

২. আইয়ুব খানের গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছিল ১৯৫৯ সালে Elective Bodies Disqualification Order 1959 (EBDO) এবং Public Office Disqualification Order (PODO) নামক দু'টি নির্বতনমূলক আইন প্রণয়ন করেন। এছাড়াও তিনি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে জমিদারদের জন্য সিলিং নির্ধারণ, বিনা ক্ষতিপূরণে জায়গিরদারি ব্যবস্থা বাতিল, মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১, প্রণয়ন করেন। তবে তাঁর প্রবর্তিত ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত-সমালোচিত ছিল 'মৌলিক গণতন্ত্র' (Basic Democracy) নামক এক উদ্ভট গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন।

৩. উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানে প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালে। এ কমিশনের প্রধান ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এবং এটি Maulana Akram Khan Committee on Education নামে পরিচিত। দ্বিতীয় শিক্ষা কমিশনটি গঠন করেছিল পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকার। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে আতাউর রহমান খানকে চেয়ারম্যান করে এ শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। এই কমিশন প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরে কতিপয় সংস্কারের সুপারিশসহ ১৯৫৭ সালে রিপোর্ট পেশ করেছিল।

৪. জাতীয় শিক্ষা কমিশনের অন্য সদস্যরা ছিলেন: (১) রমিজউদ্দিন সিদ্দিকী, সদস্য, পাকিস্তান আনবিক শক্তি কমিশন; (২) কর্নেল এম কে আফ্রিদি, উপাচার্য, পেশওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, (৩) বি.এ. হাসমী, উপাচার্য, করাচি বিশ্ববিদ্যালয়, (৪) ড. মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, (৫) ড. এ এফ এম আব্দুল হক, চেয়ারম্যান, ঢাকা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, (৬) ড. এ এফ আতোয়ার হোসেন, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (৭) ড. এ রশিদ, অধ্যক্ষ, ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, (৮) আর. এম. ইউইং, অধ্যক্ষ, ফরমান খ্রীস্টান কলেজ, লাহোর, (৯) কর্নেল হামিদ খান, পরিচালক, সামরিক শিক্ষা, এবং (১০) বিগ্রেডিয়ার এম, হামিদ শাহ, ডাইরেক্টর অব অরগানাইজেশন, জেনারেল হেড কোয়ার্টার। Ministry of Education Resolution, Karachi, 30th December, 1958 in *Report of the Commission on National Education,* 1959, Govenment of Pakistan, Ministry of Education, Karachi, 1961, p. 347

৫. *Summary Report of the Commission on National Education, 1959,* available at: https://www.academia.edu/27668516/Commission_on_National_Education_1959, cited on 15.7. 2002

৬. ফোর্ড ফাউন্ডেশন (The Ford Foundation) হলো একটি আমেরিকান বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। মানব কল্যাণের অগ্রগতি সাধনে কাজ করার লক্ষ্য নিয়ে এডসেল ফোর্ড (Edsel Ford) এবং তার বাবা হেনরি ফোর্ড (Henry Ford) ১৯৩৬ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

৭. কমিশন রিপোর্ট প্রণয়নে সহায়তাকারী মার্কিন শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন ব্রমিটন ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ড. হারম্যান বি ওয়েলস, টিসারবার্গ কার্নেগী ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট ড. জন সি ওয়ার্ণার। *Report of the Commission on National Education,* 1959, Govenment Pakistan, Ministry of Education, Karachi, 1961, p. 2

৮. *The Pakistan Observer*, 09 January, 1960

৯. *Report of the Commission on National Education, 1959, op.cit.* p.175

১০. *Ibid,* pp. 13-15, 123

১১. *Report of the Commission on National Education, 1959, op.cit.* p. 20

১২. *Ibid,* pp. 195-196

১৩. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, *Report of the Commission on National Education, 1959, op.cit.* pp. 191-193

১৪. *Ibid .,* p. 9

১৫. *Government Resolation on the Report of the Commission on National Education*, Government of Pakistan, Karachi, 1960; *জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট*, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩৯-৪০

১৬. *Report of the Commission on National Education, 1959, op.cit.* p. 215

১৭. যেমন ১৯৫৯ সালে রোমান হরফে বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের সরকারি উদ্যোগের প্রতিবাদ, কবি নজরুল ইসলামের কিছু কবিতার শব্দকে পরিবর্তন করে তথাকথিত মুসলমানি রূপ দেয়ার অপচেষ্টার প্রতিবাদ, সরকারের রবীন্দ্র-বিদ্বেষ এবং কবির জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পূর্ববাংলায় রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপন। এসময় সরকারের বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি বিরোধী তৎপরতার প্রতিবাদে ড. সন্‌জীদা খাতুনের নেতৃত্বে "ছায়ানট"সহ বিভিন্ন সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

১৮. এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য: *Education for All, East Pakistan Education Week, 1966-67*, p. 54; *Report of the Commission on the Students problem and welfare*, Ministry of Education, Pakistan, 1966, p. 54

১৯. মাহবুব উল্লাহ, *ষাটের দশকে ছাত্র রাজনীতি*, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা ২০০১, পৃ. ১৩

২০. নিতাই দাস, *বাংলাদেশে শিক্ষা আন্দোলন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৭৭

২১. মাহমুদুর রহমান মান্না, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১
২২. ১৩ আগস্ট ১৯৬২ সালের *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্যে জনৈক ইডেন কলেজের ছাত্রী কথাটি উল্লেখ রয়েছে। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ আগস্ট, ১৯৬২
২৩. মোহাম্মদ হান্নান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫১-৫২
২৪. নাসিমুন আরা হক (মিনু)-এর নিজের দেয়া তথ্য। বর্তমান গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ। তারিখ: ৩০.০৮.২০১৯ ইং
২৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ আগস্ট, ১৯৬২
২৬. প্রতিবেদনটি বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ আগস্ট, ১৯৬২
২৭. ছাত্রদের ১৫ দফা দাবি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ আগস্ট ১৯৬২
২৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ আগস্ট ১৯৬২
২৯. *ঐ*
৩০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ আগস্ট ১৯৬২
৩১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ আগস্ট ১৯৬২
৩২. শাহনাজ পারভিন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীর অবদান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩৯
৩৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ আগস্ট ১৯৬২
৩৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬২
৩৫. *ঐ*
৩৬. অধ্যাপক মমতাজ বেগম ছিলেন একজন সুপরিচিত রাজনীতিবিদ। তিনি কমিল্লা মহিলা কলেজের প্রথম নির্বাচিত ভিপি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হলের ছাত্রলীগের প্রথম সভাপতি ছিলেন। তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। ১৯৭০ সালে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের এমএনএ নির্বাচিত হন। তাঁর সম্পর্কে আরো বিস্তারিত দ্রষ্টব্য অধ্যাপক মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, *স্বাধীনতাযুদ্ধে বাংলার নারী*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৬০-৬৬
৩৭. গবেষককে দেয়া মমতাজ বেগমের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১৯.০৬.২০১৯
৩৮. অধ্যাপক মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬০, ৬১
৩৯. রওশন আরা বেগমের পৈত্রিক নিবাস মাদারিপুর জেলার কালকিনীতে। ইডেন কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে ভর্তি হন এবং এম এ পাস করেন। তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তিনি প্রথমে ঢাকা টিএন্ডটি কলেজ এবং পরে শহীদ স্মরণী কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর এ মুজিবভক্ত মহিয়সী নারীর জীবনে চরম দুর্যোগ নেমে আসে। তাঁকে চাকুরিচ্যুত করা হয়। পরবর্তী সময়ে বিএডিসির ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন বিভাগে চাকুরি করেন। তিনি নারী মুক্তিযোদ্ধা, সংসদের সদস্য ও একজন সক্রীয় নারী নেত্রী হিসেবে সুপরিচিত। আরো তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য: সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ১৯৯৯, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫-১২৭
৪০. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫
৪১. মাহফুজা খানমের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১৯.০৮.২০১৯ এবং মাহফুজা খানম রচিত গ্রন্থ, *ছাত্র রাজনীতি: মুক্তিযুদ্ধ আগে ও পরে*, আগামী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃ. ৩৭
৪২. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০
৪৩. *ঐ*, পৃ. ১৩২
৪৪. মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭২। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউ-এ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জনসভায় ভয়াবহ গ্রেনেড হামলার ঘটনায় তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন এবং পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।
৪৫. শাহনাজ পারভিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৯
৪৬. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৩

৪৭. *ঐ*, পৃ. ১৪৩

৪৮. *ঐ*, পৃ. ১০৭

৪৯. টাঙ্গাইল সদরের এক সাংস্কৃতিক পরিবারে শেফালী দাসের জন্ম । কলেজ জীবনে তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় হন এবং ১৯৬২ সালে শিক্ষা আন্দোলনসহ পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বিভিন্ন কর্মসূচিতে যুক্ত ছিলেন। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে তিনি সংবাদ পর্যালোচনা পাঠ ও বিপ্লবী কবিতা ও শ্লোগান পাঠ করতেন। তিনি টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫১

৫০. গবেষকের গৃহীত রাফিয়া আখতার ডলির সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১৮.১০.২০২০ ইং

৫১. শাহনাজ পারভিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০

৫২. আজাদী হাই দিনাজপুরের প্রগতিশীল নারী আন্দোলনের এক পরিচিত মুখ। কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে যুক্ত আজাদী হাই ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানেও সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ না নিলেও এর সংগঠনে তিনি নানাভাবে ভূমিকা রাখেন। তাঁর স্বামী দিনাজপুরের বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কালাম আজাদ। সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫১ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৮-১৩৯

৫৩. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২২

৫৪. আয়েশা খানম বাংলাদেশের নারী প্রগতি আন্দোলনের একজন অগ্রসেনানী। মুক্তিযোদ্ধা আয়েশা খানম বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ছিলেন তিনি। এছাড়া রোকেয়া হলের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ও সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতিও ছিলেন।

৫৫. শাহনাজ পারভীন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৯

৫৬. *ঐ*

৫৭. মোহাম্মদ হাননান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫১

৫৮. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৯

৫৯. মালেকা বেগম, *নারী আন্দোলনের পাঁচ দশক*, অন্য প্রকাশ, ২০০২, পৃ. ৩৮

৬০. *The Pakistan Observer,* September 18, 1962

৬১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

৬২. ১৮ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এ বিবৃতিতে স্বাক্ষকারীদের মধ্যে আরো ছিলেন–নূরুল আমীন, আতাউর রহমান খান, আবু হোসেন সরকার, শেখ মুজিবুর রহমান, ইউসুফ আলী চৌধুরী মোহন মিয়া, মাহমুদ আলী, মোহসীনউদ্দীন দুদু মিয়া, আজিজুল হক নান্না মিয়া ও শাহ আজিজুর রহমান প্রমুখ। *দৈনিক আজাদ*, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬২

৬৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২; *The Pakistan Observer,* 20 September, 1962

৬৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

৬৫. দৈনিক আজাদ, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

৬৬. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০

৬৭. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯০

৬৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

৬৯. *দৈনিক আজাদ*, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

৭০. সাহসী নেতৃত্ব, তেজস্বিতা ও তুখোড় ও অনলবর্ষী বক্তৃতার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন ছাত্র ইউনিয়ন নেত্রী ও ডাকসুর জিএস মতিয়া চৌধুরীকে এ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল এবং তিনি সকলের কাছে এ নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

৭১. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পূর্ণাঙ্গ ভাষণটির জন্য দেখুন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের *৪১তম সমাবর্তন স্মরণিকা*, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৮৩-৮৫

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একচল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০/জুন ২০২৩

দেশভাগভিত্তিক কথাসাহিত্যে বিহারিদের আত্মপরিচয় সংকট

মিনু আক্তার*

সারসংক্ষেপ

১৯৪৭ সালের দেশভাগের নির্মম শিকার বিহারিদের জীবনের নানা সংকট নিয়ে দেশভাগভিত্তিক কথাসাহিত্যে পৃথকভাবে যাঁরা আখ্যান রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রফুল্ল রায় ও হরিপদ দত্ত অন্যতম। প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্প 'অনুপ্রবেশ' ও হরিপদ দত্তের উপন্যাস 'মোহাজের' বিহারিদের আত্মপরিচয় সংকট বিষয়ে বিশিষ্ট রচনা। এসব রচনায় দেশভাগের পর বিহারিদের প্রথমবার দেশহীন হয়ে পাকিস্তানে আশ্রয়গ্রহণ, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে শাসকদের ক্রীড়নক হয়ে বাঙালিদের বিরুদ্ধে অবস্থান, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বিহারিদের দ্বিতীয়বার দেশহীন হওয়া, আটকে পড়া পাকিস্তানি হিসেবে ক্যাম্পের মানবেতর জীবনযাপনসহ বিহারিদের জীবনের নানা সংকটের চিত্র শিল্পিত হয়েছে।

চাবি শব্দ: দেশভাগ, বিহারি, আটকে পড়া পাকিস্তানি, আত্মপরিচয় সংকট।

১. ভূমিকা

দ্বিজাতিতত্ত্ব তথা ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের ফলে পাকিস্তান ও ভারতের সংখ্যালঘু হিন্দু-মুসলমানের জীবনে নেমে আসে আতঙ্ক, অনিরাপত্তা, অনিশ্চয়তাসহ নানা সংকট। লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘরবাড়ি ফেলে অস্তিত্ব রক্ষা ও নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে যাত্রা করে নিজ নিজ ধর্মের দেশে। সৃষ্টি হয় এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়। দেশভাগের শিকার এমন একটি উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠী হলে উর্দুভাষী অবাঙালি বিহারি। তারা পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন করেছে, দাঙ্গায় প্রাণ দিয়েছে, দেশভাগের পর প্রথমবার দেশহীন হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে এসেছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হলে দ্বিতীয়বার দেশহীন হয়েছে। পাকিস্তানে যেতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু পাকিস্তান সরকার তাদের গ্রহণ না করায় বাধ্য হয়েছে ক্যাম্পের মানবেতর জীবন গ্রহণ করতে। বিহারিদের জীবনের এই দুর্দশা দেশভাগের নির্মম সত্য। সাহিত্য যেহেতু সময় ও সমাজের দর্পণ, তাই বাংলা সাহিত্যে দেশভাগজনিত নানা সংকটের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কেননা, এই অগণিত বাস্তুচ্যুত মানুষের অভিজ্ঞতা ইতিহাসের পাতায় সেভাবে পাওয়া সম্ভব নয়, যেভাবে সাহিত্যের অঙ্গনে পাওয়া সম্ভব।[১] দেশভাগ-উত্তর সময় থেকেই বাংলাসাহিত্যে দেশভাগের প্রতিফলন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আর সাতচল্লিশের দেশভাগ এবং দেশভাগজনিত নানা সংকটকে সবচেয়ে বেশি ধারণ করে আছে কথাসাহিত্য। তার অন্যতম কারণ, কথাসাহিত্যের প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য। দেশভাগভিত্তিক কথাসাহিত্যে বিহারিদের জীবনসংকট বিষয়ে যেসব রচনার নিদর্শন

* পিএইচডি গবেষক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রফুল্ল রায়ের (জ. ১৯৩৪) ছোটগল্প 'অনুপ্রবেশ' ও হরিপদ দত্তের (জ. ১৯৪৭) উপন্যাস *মোহাজের* (২০০৬) অন্যতম। এসব রচনায় বাস্তুচ্যুত অবাঙালি উর্দুভাষী বিহারিদের জীবনের সমস্যা, আত্মপরিচয় সংকট ও ছিন্নমূল হওয়ার বেদনা কতটুকু বাস্তবতা নিয়ে উঠে এসেছে কিংবা তাদের দেশহীন হওয়ার বেদনাময় আলেখ্য দেশভাগভিত্তিক আখ্যানে স্থান পেয়েছে কি না তা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।

২. বিহারি সংকট

দেশভাগের প্রভাব বাংলার পশ্চিম অংশের তুলনায় পূর্ব অংশে কম– এই বক্তব্য বেশ প্রচলিত।[২] উদ্বাস্তু সংকটের কথা ধরে নিলে তা যথার্থও। তবে, দেশভাগের ফলে পূর্ব বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশ) উদ্বাস্তু সংকটের মাত্রা কিছুটা কম থাকলেও এখানকার সমস্যাগুলো ছিলো ভিন্ন প্রকৃতির। কেননা, একটি বিরাট সামাজিক সংকটের মধ্য দিয়ে দেশ ভাগ হয়ে জন্ম হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের, আর জন্মের পর রাষ্ট্রটি নিজেই হয়ে ওঠে নতুন নতুন সংকটের কেন্দ্রস্থল।[৩] ধর্ম, ভাষা ও জাতীয়তার প্রশ্নে নানা সংকটের মুখোমুখি হতে হয় মানুষকে। পূর্ব বাংলার মানুষকে দেশভাগের মূল্য দিতে হয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে। এখানকার মানুষের জীবনে দেশভাগের সংকটগুলি ছিলো বহুমাত্রিক, জটিল, দীর্ঘমেয়াদি ও প্রজন্মান্তরে প্রবহমাণ। যে সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে এখানকার মানুষকে পুনরায় দেশভাগের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিলো। ১৯৫২ সালে ভাষার জন্য আন্দোলন করতে হয়েছিলো। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছিলো। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ও কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।[৪] দেশভাগের ফলে পূর্ব বাংলায় যে বহুমাত্রিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছিলো তার মধ্যে একটি প্রধান সংকট অবাঙালি বিহারিদের ধর্মীয় উন্মাদনা ও পাকিস্তানি শাসকদের ক্রীড়নক হয়ে বাঙালিদের বিরুদ্ধে অবস্থান এবং পরিণামে বিহারিদের অস্তিত্ব সংকট। দেশভাগের পঁচাত্তর বছর পরও বিহারিদের সংকটটি রয়ে গেছে দেশভাগের জীবন্ত ক্ষত হয়ে।

দেশভাগের প্রেক্ষাপটে ১৯৪৬ সাল থেকে সংঘটিত বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের পরে অনেক মুসলমান ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে (পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান) আশ্রয় গ্রহণ করে। পাকিস্তানে তারা পরিচিতি পায় মোহাজের নামে। পূর্ব পাকিস্তানে আগত মোহাজেরদের অধিকাংশই ছিলো উর্দুভাষী অবাঙালি মুসলমান। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ভারত থেকে যে ৬,৯৯,৭৭৯ জন মুসলমান শরণার্থী পূর্ব বাংলায় আসে তাদের মধ্যে ৩,২৮,৪৩৩ জন ছিলো অবাঙালি উর্দুভাষী।[৫] ১৯৬১ সালের হিসাব অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ৬,৭১,৮৪৪ জন।[৬] এই বিপুল সংখ্যক উর্দুভাষী অবাঙালি মুসলমানের অধিকাংশই বিহার ও তার আশেপাশের অঞ্চল থেকে আগত। তাই সকল উর্দুভাষীই এখানে বিহারি হিসেবে পরিচিতি পায়। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই বিহারি জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিলো প্রায় দশ লাখ। শুরু থেকেই তারা বাঙালিদের সাথে তারা একাত্ম হতে পারেনি। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত হয়। পাকিস্তান সরকার তাদের কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসের ব্যবস্থা করে এবং পূর্ববঙ্গের মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে।[৭] বিহারিদের ভাষাগত ও ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ব্যবহার করে বাঙালিদের দমন

করতে। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে তারা প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা করে।[৮] ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ও ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে তারা মুসলিম লীগকে সমর্থন করে।[৯] ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। এসব ভূমিকা বিহারিদের প্রতি বাঙালিদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে এবং পাকিস্তানি বাহিনীর পাশাপাশি তাদের উপরও বাঙালির ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী বাঙালির ক্রোধের মুখে তারা ঘরবাড়ি, সম্পত্তি, কর্মস্থল ছেড়ে আন্তর্জাতিক রেডক্রস সংস্থার ক্যাম্পগুলোতে আশ্রয় নেয় এবং পাকিস্তান যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। বাংলাদেশে তারা পরিচিতি পায় 'আটকেপড়া পাকিস্তানি' নামে। পাঁচ দশক ধরে ক্যাম্পে মানবেতর জীবন যাপন করছে বিহারিরা। তাদেরকে দুইবার দেশহীন হতে হয়েছে। একবার ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টির পর, আরেকবার ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভাগ হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির পর। যে পাকিস্তানের জন্য তারা আন্দোলন করেছে, দাঙ্গায় প্রাণ দিয়েছে সে-পাকিস্তান তাদেরকে মুক্তি দিতে পারেনি বরং দুই দফায় রিক্ত করেছে।[১০] নেতৃত্বশূন্য বিহারিদের হঠকারী সিদ্ধান্তের জন্য বাংলাদেশের মানুষ তাদের প্রতি সংবেদনশীল হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালিদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর আচরণ তাদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত করেছে। বাংলাদেশে তারা নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার পেলেও বাঙালিরা আজও তাদের ভালো চোখে দেখে না। মানবিক বিপর্যয়ের জাঁতাকলে প্রতিনিয়ত পিষ্ট হচ্ছে তারা।

৩. দেশভাগভিত্তিক উপন্যাসে বিহারিদের আত্মপরিচয় সংকট

কথাসাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধারা উপন্যাস। ব্যক্তি ও সমাজজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, দেশ, কাল, ইতিহাস সবকিছুই রূপায়িত হতে পারে উপন্যাসে। তাই উপন্যাসকে বলা যেতে পারে "আধুনিক পৃথিবীর মানুষের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা-বেদনার সাহিত্যরূপ।"[১১] বাংলা সাহিত্যে দেশভাগের পটভূমিতে বহু উপন্যাস রচিত হয়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *পূর্ব-পশ্চিম* (১৯৮৯), প্রফুল্ল রায়ের *কেয়া পাতার নৌকো* (১৯৬৩), হাসান আজিজুল হকের *আগুনপাখি* (২০০৬), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে* (১৯৭১) ইত্যাদি দেশভাগ নিয়ে রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস– যেখানে উঠে এসেছে দেশভাগের যন্ত্রণা ও দেশভাগজনিত নানা সংকট। তবে দেশভাগের নির্মম শিকার বিহারিদের জীবনের ট্রাজেডির প্রতিফলন এসব উপন্যাসে তেমন লক্ষ করা যায় না। বিহারিদের জীবন সংকট বিষয়ে ২০০৬ সালে প্রথম হরিপদ দত্ত রচনা করেন তাঁর *মোহাজের* উপন্যাস। এ বিষয়ে এটিই উপন্যাসের বৃহৎ পরিসরে প্রথম প্রচেষ্টা। এ প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য– "কোনো লেখকই যখন লিখল না ছিন্নমূল বিহারি উদ্বাস্তুদের নিয়ে, আমিই তার দায় গ্রহণ করলাম।"[১২] উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক বিহারিদের প্রসঙ্গে বলেছেন:

> রাষ্ট্রহীন এক জনগোষ্ঠী। দেশ নেই। শেকড় নেই। সভ্যতাবিচ্ছিন্ন। রাষ্ট্র থেকে হারিয়ে যাওয়া একদল মানুষ। ধর্মে ইসলাম। জাতিতে বিহারি। ভাষা উর্দু। বাংলাদেশে ওরা আটকে-পড়া পাকিস্তানি। বাঙালির স্বাধীনতাযুদ্ধ ওদের ছিন্ন করে দিয়েছে নাগরিকত্ব। বিশ্বের ২ কোটি রাষ্ট্রহীন মানুষেরই অংশ ওরা। ১৯৪৭ সালে ধর্মরাষ্ট্রের দাবানলে পুড়ে গেছে ওদের মাতৃভূমির ঠিকানা। আত্মপরিচয় এবং ঠিকানাহীন হবার আশঙ্কায় বাঙালির যুদ্ধেও প্রতিপক্ষ বনে যায় তারা। ইতিহাসের নির্মমতায় পরাজিত এই জনগোষ্ঠীকে পরিত্যাগ করে যেমনি

> পাকিস্তানিরা তেমনি বাঙালিরা। পুনরায় উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে ওরা এবং পাকিস্তানে ফেরার প্রত্যাশায় নিষ্ঠুর বন্দিত্ব গ্রহণ করে শরণার্থী শিবিরের নরকে।[১৩]

ঔপন্যাসিক বিহারিদের জীবনের এই দুর্দশা ও আত্মপরিচয় সংকটকে নানা ঘটনা ও চরিত্রের মাধ্যমে বাস্তবসম্মত করে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন *মোহাজের* উপন্যাসে। আবু-আল-মোতালেব, পিতা আবু-আল-সাঈদ এবং মোতালেবের সন্তান আবিদ, জাহিদ ও শাহজাদী এই তিন প্রজন্মের ট্রাজেডি উঠে এসেছে উপন্যাসে। উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয়েছে হিন্দু অধ্যুষিত বিহারের অধিবাসী আবু-আল-সাইদ ও আবু-আল-মোতালেবের পাকিস্তানের স্বপ্ন, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশত্যাগ ইত্যাদি বিষয় বর্ণনার মধ্য দিয়ে।

দেশভাগের পর জন্মভূমি ভারত ত্যাগের মধ্য দিয়ে বিহারিদের জীবনের সংকটের সূচনা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার ভয় ছাড়াও বিহারিদের দেশত্যাগের একটি অন্যতম কারণ পাকিস্তানের মোহ। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর থেকে মুসলিম লীগ পাকিস্তান অর্জনকেই চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে।[১৪] এই প্রস্তাব মুসলমানদের মনে আশা জাগায় এবং ভারতের মুসলমানরা একটি আদর্শের প্রেরণা থেকে পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করে। তখন ভারতের অধিকাংশ মুসলমানের কাছে পাকিস্তান হয়ে ওঠে একটি ধর্মীয় আদর্শ, একটি দার-উল-ইসলামের স্বপ্ন, একটি প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ভূমি যেখানে ইসলাম তার মর্যাদা পুনরুদ্ধার করে বিকশিত হবে।[১৫] কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের পর ভারতের হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলের সংখ্যালঘু মুসলমানদের জীবনে দেখা দেয় চরম অনিশ্চয়তা আর অনিরাপত্তা। তখন অনেকে স্বেচ্ছায় এবং অনেকে বাধ্য হয়ে ভারত ত্যাগ করে উদ্বাস্তু হয়ে পাড়ি জমায় পাকিস্তানে। যোগাযোগের সুবিধার কারণে ভাষাগত পার্থক্য সত্ত্বেও বিহারের অনেক উর্দুভাষী মুসলমান চলে আসে পূর্ব বাংলায়। ভারতের বিহারের মুসলমানদের পাকিস্তানের মোহ, দেশত্যাগ এবং উদ্বাস্তু জীবন গ্রহণের নির্মম বাস্তবতাটিকে লেখক তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন উপন্যাসে আবু-আল-সাঈদের পরিবারসহ দেশত্যাগের ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে। বিহারের ইমামপুরা গ্রামের আবু-আল-সাঈদের পুত্র আবু-আল-মোতালেব দেশভাগের আগে বিহার যেন পাকিস্তানের অংশ হয় এই আশায় মুসলমানদের সতর্ক করতে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছে, পাকিস্তানের পক্ষে স্লোগান দিয়েছে। কিন্তু দেশভাগের পর বিহার পাকিস্তানে না পড়ায় তারা সেখানে হয়ে যায় সংখ্যালঘু। তাদের জীবনে নেমে আসে আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা একের পর এক গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে থাকলে নিরাপদ জীবনের প্রত্যাশায় অনেক স্বপ্ন আর আবেগ নিয়ে আবু-আল-সাঈদ ও তার পরিবার চলে আসে পাকিস্তানে। পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে তাদের এই স্বপ্নযাত্রাকে লেখক বলেছেন, "এ যেন হাসরের ময়দানে বিচার শেষে নেকবানদের বেহেশতের পথে হাঁটা। ... দূরে নিরাপদ সুস্বাদু শস্যপূর্ণ আর বেহেশতি দরিয়ার মতো শীতল পানির নয়া দেশ পাকিস্তান।"[১৬] আবু সাঈদের যুবক পুত্র মোতালেবও অনাগত সুখময় জীবনের কল্পনায় বিভোর। ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তানের ছবি ঝলমল করতে থাকে আবু-আল-সাইদের চোখে। সে ভাবে– "তার সংসারের মানুষগুলোর ঠিকানার খোঁজে যেখানে যাচ্ছে, নিশ্চয়ই সেখানে রয়েছে আল্লাহ্‌র অশেষ নেয়ামত। ... নিশ্চয়ই সামনে সুখ, অফুরান শান্তি।"[১৭]

দেশভাগের প্রেক্ষাপটে যে বিপুল সংখ্যক অবাঙালি উর্দুভাষী মোহাজের অনেক স্বপ্ন নিয়ে পাকিস্তানে (পূর্ব পাকিস্তানে) চলে আসে, তাদের স্বপ্নে প্রথমেই ধাক্কা লাগে যখন তারা পর্যাপ্ত খাদ্য ও বাসস্থান পায় না। দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যাওয়া সংখ্যালঘু হিন্দুদের পরিত্যক্ত বাড়িগুলো দখল করে তখন অনেক মোহাজের সেখানে আশ্রয় নেয়।[১৮] এমনকি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের পরবর্তী পরিস্থিতিতে সরকার আদেশ জারি করে খালি হিন্দু বাড়িগুলোতে রিফিউজিদের আশ্রয় দেয়।[১৯] এই গোলযোগে অনেক স্থানীয় মুসলমান ও প্রভাবশালী মোহাজের জোরপূর্বক অনেক হিন্দুর ঘরবাড়িও দখল করে নেয়। বিহারিদের পাকিস্তানের মোহ ভঙ্গ এবং দেশভাগের গোলযোগে দেশত্যাগী উদ্বাস্তুরা কীভাবে স্থানীয় নেতাদের শিকারে পরিণত হয়েছে তার যথাযথ প্রতিফলন ঘটেছে *মোহাজের* উপন্যাসে। সীমান্ত পাড়ি দিয়ে রিফিউজি হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে এসে প্রথমেই আবু-আল-সাঈদরা শিকার হয় স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতা খোনকারের। হিন্দুদের পরিত্যক্ত বাড়িগুলোর দখল পাবে রিফিউজিরা তাই সীমান্তের এপারে রিফিউজিদের খুব খাতির। নেতাদের আদেশে তাদের চেলারা স্টেশনে প্রতীক্ষায় থাকে; ট্রেন আসলে মেহমানের মতো তাদের নিয়ে যাওয়া হয়। মুসলিম লীগের নেতা ইসলাম খোনকারের মেহমান হয়ে আবু সাঈদরা প্রথমে উঠে তার বাড়িতে। একদল লেঠেল নিয়ে যদুনাথ মজুমদারের বাড়ি দখল করে থাকতে দেওয়া হয় তাদের। খোনকারের বদৌলতে ঘর, বাড়ি, জমি সবই পেয়ে যায় তারা। কিন্তু কিছুদিন পরই খোনকার তার দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আবু সাঈদের বাড়ি। পিতা পুত্রকে পিটিয়ে আবু সাঈদের পরিবারটিকে গরুর গাড়িতে তুলে দেয়। তখন আবু সাঈদের স্বপ্ন থেকে পুণ্যভূমি পাকিস্তান অদৃশ্য হয়ে যায়। পার্বতীপুরের রেলবস্তি হয় তার ঠিকানা। আবু-আল-সাঈদের মতো দেশত্যাগী মানুষেরা কীভাবে রাজনীতির শিকার হয় তা তুলে ধরে লেখক বলেছেন, "আসলে এই ভিটেমাটিহারা বাড়িখেদানো মানুষগুলো হচ্ছে মাছ শিকারের আধার। ওদের সামনে ঠেলে দিয়ে যদি শিকার না-ই ধরা গেল তবে দেশটা ভাগাভাগি হলো কেন?"[২০] রেলবস্তির বাসিন্দা আবু সাঈদ পুত্র মোতালেবের দিকে তাকিয়ে আফসোসে ভেঙে পড়ে প্রতিশ্রুত খোদার রাজ্য সে তাকে দান করতে পারেনি বলে।

পাকিস্তানে অভিবাসী হয়ে আসার শুরু থেকেই বিহারিরা বাঙালিদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি। নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে পাকিস্তান সমর্থক নেতারা তাদের বাঙালিদের সাথে একত্র হতে দেয়নি বরং বিচ্ছিন্নতাকে উৎসাহিত করেছে।[২১] ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান উদ্বাস্তুদের জন্যে যেসব কলোনি নির্মাণ করেন তা এমন পরিকল্পনামাফিক করা হয়েছিল যাতে বিহারি উদ্বাস্তুরা বাঙালি সমাজের মূলস্রোত থেকে আলাদা থাকে।[২২] তারা ক্রমে নিজেদের অস্তিত্ব সংকটের কথা চিন্তা করে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ততা বাড়াতে থাকে এবং পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা লাভ করতে থাকে। পাকিস্তান সরকার বিহারিদের পুনর্বাসন, কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়ায় তাদের অনেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ পায়। জিন্নাহ যখন ঢাকায় এসে ঘোষণা করেন 'উর্দু এবং কেবল উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' তখন উর্দুভাষী বিহারিরা মনে করতে থাকে তারাই হবে পূর্ববঙ্গের আসল মালিক।[২৩] উপন্যাসে দেখা যায় পাকিস্তানে এসে জীবনের হিসাবটা কিছুতেই মেলাতে পারে না আবু-আল-সাঈদ আর পুত্র আবু-আল-মোতালেব। বাঙালিরা

কেবলই বিহারিদের অচেনা থেকে যায়, অনাত্মীয় হয়ে থাকে, এই ভেদ তারা কিছুতেই ছিন্ন করতে পারে না। পাকিস্তানে এসে তারা হয় রেলবস্তির বাসিন্দা। তাদের কোনো ধন-সম্পদ নেই, খোদার দেশ পাকিস্তানে কেবল তারা মজদুর হয়ে থাকবে এটা মেনে নিতে পারে না আবু-আল-সাঈদ। তবুও আশা ছেড়ে দেয় না। সে মনে করে পাকিস্তান নামের দেশটার আসল মালিক পশ্চিম পাকিস্তানি মোহাজের ও পাঞ্জাবিরা। পুত্র মোতালেবকে সে ভরসা দিয়ে বলে, "আব্বাজী, চিন্তা মাত করো, বিহারিদের জন্য ঢাকা শহরে বাড়ি হবে, ঘর হবে, ব্যবসা হবে, জুটমিল বানাবে আদমজী সাহাব"।[২৪] কিন্তু ঢাকা শহরের বাড়ি নয়, পার্বতীপুরের বস্তিতেই মৃত্যু হয় আবু-আল-সাঈদের।

বাঙালি ক্ষমতায় এলে পাকিস্তানি শাসকদের দেওয়া সুযোগ-সুবিধা হারানোর ভয়ে এবং ভাষাগত দিক থেকে সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার চিন্তা থেকে বিহারিরা সবসময় পাকিস্তানিদেরই সমর্থন করেছে এবং তাদের ক্রীড়নক হয়ে বাঙালিদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। বিহারিদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ, শাসকদের ক্রীড়নক হওয়া ইত্যাদি বিষয় নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে উপন্যাসে। পিতার মৃত্যুর পর আবু-আল-মোতালেব পার্বতীপুর ছেড়ে চলে আসে আদমজী জুট মিলে কাজ নিয়ে ভাগ্য পরিবর্তনের আশায়। পার্বতীপুর বস্তি ছেড়ে এসে আদমজী জুট মিলের বস্তি হয় তাদের ঠিকানা। মোতালেবের মনে প্রশ্ন জাগে এই কি তাদের জন্য খোদার প্রতিশ্রুত দেশ পাকিস্তান? স্ত্রী হামেদাকে ডেকে বলে– "দিলছে শোন বিবি, আদমজী জুট মিলের এই নোংরা বস্তিটাই আমাদের দেশ, আমাদের ঠিকানা। ঢাকা টাউনের মোহাম্মদপুরে মিরপুরে জায়গা হলো না।"[২৫] তবুও থেমে থাকে না মোতালেব। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়। নেতাদের পরামর্শে বাঙালির বিরুদ্ধে পাকিস্তানিদের সব অপকর্মের অংশিদার হয় সে। উপন্যাসে দেখা যায় আদমজী জুট মিলের শ্রমিক আবু আল মোতালেব রাষ্ট্রভাষা বাংলার বিরোধিতা করে। উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক অংশ– "সেই বায়ান্ন সালে ঢাকাইয়া কুট্টি আর বিহারি মিলে খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে রাষ্ট্রভাষা বাংলার বদলে উর্দুর পক্ষে যে ক'টি মিছিল হয়েছিল তার একটিতে অন্তত হাজির ছিল মোতালেব। স্লোগানের সঙ্গে গলা মিলিয়েছিল সে।"[২৬]

পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর ইন্ধনে ১৯৫০ সালের পর থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘটিত বিভিন্ন দাঙ্গায় বিহারিরা অংশগ্রহণ করেছে।[২৭] ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করলে এই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য পরিকল্পিতভাবে চন্দ্রঘোনা পেপার মিল, আদমজী জুট মিলে বিহারি-বাঙালি দাঙ্গা বাঁধানো হয়। সেই দাঙ্গায় শত শত মানুষ মারা যায়। শুধু আদমজীতেই মৃত্যু হয় ৫৮০ জনের। সেসময় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সকল সদস্য ঘটনাস্থলে আসেন এবং দাঙ্গা বন্ধে ভূমিকা রাখেন।[২৮] এই দাঙ্গার অজুহাতে তাৎক্ষণিকভাবে পূর্ব বাংলা সরকারের ক্ষমতা হ্রাস করে কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ জারি করে এবং পরে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করে পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন প্রবর্তন করা হয়।[২৯] এই প্রত্যেকটি ঘটনাই উঠে এসেছে উপন্যাসে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে ভোট দেয়নি মোতালেব। কেবল মোতালেব নয়, কোনো বিহারি শ্রমিকই দেয়নি। যুক্তফ্রন্ট সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে স্ত্রীকে আশ্বস্ত করে মোতালেব বলে, "বিবি ভয় পাচ্ছ কেন? ... গোপন খবর আছে, বাঙালি-

বিহারি রায়ট বাঁধাবে পাকিস্তান সরকার, বাতিল হবে পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্ট বেঈমান সরকার।"[৩০] আদমজী জুট মিলে বাঙালি-বিহারি দাঙ্গায় মুসলিম লীগের নেতারা মোতালেবের মতো বস্তির বিহারিদের ব্যবহার করে কমিউনিস্ট আর বাঙালি শ্রমিকদের দমন করতে। নেতার প্ররোচনায় পাশের নারায়ণগঞ্জ শহরে ঢুকে মোতালেব নিজ হাতে খুন করে হিন্দুদের। কিন্তু ঢাকেশ্বরী কটন মিলের মালিকানা কিংবা পঞ্চবটীর পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়ির কোনটিই জোটেনি তার ভাগ্যে। সবই নেতারা দখল করে নেয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিহারিরা মুসলিম লীগকে সমর্থন করে এবং নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হলে পাকিস্তানিদের মতো তারাও হতাশ হয়। বিহারিদের এমন বাঙালিবিরোধী মনোভাব এবং অযৌক্তিক পাকিস্তান সমর্থন বাঙালিদের ক্রমে তাদের প্রতি বিক্ষুব্ধ করে তোলে। নির্বাচনের পর পাকিস্তানি শাসকরা ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করলে বাঙালির ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং শাসকদের প্রতি বাঙালির ঘৃণার সিংহভাগ গিয়ে পড়ে উর্দুভাষী বিহারিদের উপর। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে বিহারিদের দোকান, প্রতিষ্ঠান বাঙালি বিক্ষোভকারীদের শিকার হয়। কোথাও কোথাও তা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নেয়।[৩১] উপন্যাসে পাকিস্তানের সামরিক শাসন জারি আর হক-ভাসানীর জেলে যাওয়ার সংবাদ মোতালেবের মনে কিছুটা স্বস্তি আনলেও, যখন থেকে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগানের পাল্টা 'জয় বাংলা' স্লোগান জোরালো হতে থাকে তখন থেকে মোতালেবের মনে ভয় জাগে। তার মনে হয় খোদার দেওয়া এই পাকিস্তান কি সত্যিই ভেঙে যাবে! তবে কি এই দেশটাও মোতালেবদের নয়, তবে কোন দেশ তাদের? চারদিকে গুজব শুনে মোতালেব, বিহারি শ্রমিকবস্তি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। স্লোগান হয়– "মাওরাদের খুন কর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর; একটা দুইটা বিহারি ধর, সকাল-সন্ধ্যা নাশতা কর!"[৩২] আতঙ্কে আর দুশ্চিন্তায় মাথা নত হয়ে আসে মোতালেবের। গণ-আন্দোলনের ফলে আইয়ুব খানের পতন আর আগরতলা মামলা বাতিলের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবের মুক্তি– এই ঘটনায় সারা বাংলা আনন্দে মেতে উঠলেও আদমজীতে মোতালেবদের বস্তিতে নেমে আসে আতঙ্ক।

নিজেদের অস্তিত্বের কথা চিন্তা করে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখতে ১৯৭১ সালে বিহারিরা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নেয় এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত থেকে তাদের সহযোগিতা করে। তাদের অনেকে মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার, আল বদর ইত্যাদি বাহিনীতে যোগ দিয়েছে এবং গণহত্যায় অংশগ্রহণ করেছে।[৩৩] বিহারিদের প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেছে। রাজাকার বাহিনীর শতকরা ৬০-৮০ ভাগ সদস্য ছিলো বিহারি।[৩৪] বিহারিদের ধর্মীয় উন্মাদনা এবং পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর ক্রীড়নক হয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতার বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে উপন্যাসের চরিত্র মোতালেবের পাকিস্তান সমর্থন ও তার পুত্র আবিদের রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেওয়ার ঘটনা চিত্রণের মধ্য দিয়ে। পিতা এবং পিতামহের মতো এই দেশটার কাছে কোনো প্রাপ্তি নেই মোতালেবের পুত্র হতাশাগ্রস্ত আবিদের। কিন্তু প্রশ্নটা অস্তিত্বের বলেই পাকিস্তান টিকে থাকুক এ প্রত্যাশা তারও। তাই সশস্ত্র গেরিলাদের প্রতিরোধ করার জন্য রাজাকার বাহিনী গঠন করা হলে তাতে যোগ দেয় আবিদ। মোতালেবের কাছে এ হচ্ছে পাকিস্তান রক্ষার জিহাদ। এ জিহাদে পুত্র আবিদ যোগ দিয়ে রাজাকারের ট্রেনিং

নিচ্ছে, এ যেন খোদার তরফ থেকে তার কাছে আসা আনন্দ সংবাদ।[৩৫] বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর স্বাভাবিকভাবেই বিহারিরা বাঙালিদের ক্রোধের শিকার হয়। তখন বাঙালিদের দ্বারা অনেক বিহারির মৃত্যু হয় এবং তাদেরকে ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়।[৩৬] উপন্যাসে যুদ্ধ শেষে বাঙালিরা হামলে পড়ে বিহারিদের বস্তিতে। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়ে আবিদ। ছেলের প্রাণ ভিক্ষা চায় মোতালেব। কিন্তু প্রতিশোধপরায়ণ মুক্তিযোদ্ধারা তাকে ক্ষমা করে না। গুলিতে ঝাঁজরা করে দেয় আবিদের দেহ।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পরাজয়ের পর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করলে বিহারিদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে। তাদের সম্পত্তি পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করা হয়, ব্যবসা দখল করা হয়, চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হয়, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্থানীয় মানুষের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাদের জন্য শিক্ষা, দক্ষতা ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।[৩৭] এভাবে তারা দ্বিতীয়বার দেশহীন হয়। প্রায় ১০ লক্ষ বাস্তুচ্যুত বিহারি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত আন্তর্জাতিক রেডক্রস সংস্থার ক্যাম্পগুলোতে আশ্রয় নেয়।[৩৮] ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রপতি আদেশ ১৪৯ জারি করে বিহারিদের নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য। ছয় লাখ বিহারি এ প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ৫৩৯৬৬৯ জন পাকিস্তানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা আইসিআরসি (ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ফর দ্য রেডক্রস) মাধ্যমে পাকিস্তান যেতে আবেদন জানায়।[৩৯] আইসিআরসি তাদের বাংলাদেশে অবস্থিত ৬৬টি অস্থায়ী ক্যাম্পে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে। এভাবে শুরু হয় তাদের ক্যাম্প-জীবন। তারা পরিচয় পায় নাগরিকত্বহীন 'আটকে পড়া পাকিস্তানি' হিসেবে এবং পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। উপন্যাসে বিহারিদের দ্বিতীয়বার দেশহীন হওয়া এবং যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশে তাদের দুর্ভোগের চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের কাহিনিতে এক পর্যায়ে পুত্র জাহিদ, কন্যা শাহজাদী ও স্ত্রীসহ মোতালেবের ঠাঁই হয় বিহারিদের আবাসস্থল জেনেভা ক্যাম্পে। যে দেশের জন্য তার সন্তান আবিদ পাকিস্তানিদের সাথে মিলে বাঙালিদের হত্যা করেছে, পরাজিত হয়ে বাঙালিদের ক্রোধের মুখে জীবন দিয়েছে সেই পাকিস্তানে ফিরে যেতে চায় মোতালেব। মোতালেব আশা করে ৮০ হাজার বন্দি পাকিস্তানি সৈন্যের সাথে সেও চলে যাবে পাকিস্তানে। কিন্তু যাবার সময় কেউ বলেও যায় না তাকে। যে নেতার দেওয়া অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে পুত্র আবিদ রাজাকারের খাতায় নাম লিখেছিলো পালাবার সময় সেও সঙ্গে নেয়নি মোতালেবকে। অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে থাকে মোতালেবরা। পলাতক পাকিস্তানি সেপাইদের খোঁজার নামে মুক্তিযুদ্ধের সময় নিহত বাঙালিদের স্বজনেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে অবরুদ্ধ বিহারিদের উপর। দলে দলে পুরুষদের খুন করে, নারীদের ধর্ষণ করে, যুবকদের ধরে নিয়ে যায় জেলখানায়। পুত্র জাহিদ আত্মগোপন করতে পারলেও মোতালেব আটক হয়। বৃদ্ধ মোতালেবকে লাঠিপেটা শেষে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর্তনাদ করে মোতালেব বলতে চায় মৃত পিতার উদ্দেশ্যে– "এই আজাবের জন্যই কি তুমি বিহার ছেড়ে, হিন্দুস্থান পিছনে ফেলে পাকিস্তানের বাঙালস্থানে নিয়ে এসেছিলে তোমার কওমকে?"[৪০]

যদিও বিহারিরা শরণার্থী শিবিরে বসবাস করছে, ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজি (ইউএনএইচসিআর) তাদের শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। কেননা,

ইউএনএইচসিআরের সংজ্ঞা অনুযায়ী তারা রিফিউজি বা শরণার্থী নয়। ফলে ইউএনএইচসিআর কর্তৃক শরণার্থীদের দেওয়া সুযোগ সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। তারা যে ক্যাম্পগুলোতে বাস করে তা বসবাসের উপযুক্ত নয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্যাম্প হলো ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত জেনেভা ক্যাম্প। বিহারিদের ক্যাম্পজীবনের দুর্ভোগ আর হতাশার চিত্রে উপন্যাসে বিশদ চিত্রিত হয়েছে। জেনেভা ক্যাম্পের ছোট্ট একটা খুপড়ির মতো ঘরে পরিবার নিয়ে থাকে মোতালেব। ভাঙা খাটিয়াটিতে ঘুমায় সে। নিচে চট পেতে থাকে তার স্ত্রী আর কন্যা। বারান্দায় ঘুমায় পুত্র জাহিদ। জাহিদের ঘর আর রান্না ঘর একের ভেতর দুই। ঘরটা ঘেঁষে চলে গেছে ময়লাপূর্ণ ড্রেন। দুঃখ, হতাশা আর আক্ষেপে বুক ভেঙে যায় মোতালেবের। তার মনে হয় – "সারা দুনিয়ার নাগরিকত্বহীন, দেশহীন দুই কোটি মোহাজেরের একজন সে। তার কোনো দেশ নেই।"[৪১] পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ করে তার সন্তান উপহার পেয়েছে পরাজয়ের লজ্জা আর মৃত্যু, পিতা হিসেবে সে পেয়েছে উদ্বাস্তু শিবির। আর যারা বিহারিদের ব্যবহার করলো বাঙালিদের বিরুদ্ধে, তারা মন্ত্রী হয়ে বাংলাদেশের পতাকাবাহী গাড়ি নিয়ে মহা আনন্দে ঘুরে বেড়ায়। মোতালেব এক নেতার কাছে পুত্র জাহিদের জন্য একটা চাকরি চাইলে সে জানায় মোতালেব পাকিস্তানি, এদেশের নাগরিক নয়। মোতালেবদের দায়িত্ব জাতিসংঘের, রেডক্রসের। নেতা মোতালেবকে সব ভুলে বাঙালি হতে পরামর্শ দিলে সে বলে, "একবার হব হিন্দুস্থানি, একবার হব পাকিস্তানি, আবার হব বাঙালি, আর কি হতে বাকি আছে আমাদের?"[৪২] মোতালেবের এই উচ্চারণের মধ্য দিয়ে দেশভাগের রাজনীতির শিকার বিহারিদের আত্মপরিচয় সংকটের সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। শরণার্থী শিবিরের বন্দিজীবন, পাকিস্তানে যাবার অনিশ্চয়তা, বড় ভাই রাজাকার আবিদের মৃত্যু, ছোটবোনের বাঙালি ছেলের হাত ধরে পলায়ন সবকিছু যে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে আসে মোতালেবের দ্বিতীয় পুত্র জাহিদের জীবনে তা থেকে মুক্তির জন্য সে জিহাদ ভিন্ন আর কোনো উপায় দেখে না। বাঙালি এক নেতার পরামর্শ ও সহযোগিতায় সে আফগানিস্তানে চলে যায় জিহাদের উদ্দেশ্যে। কমিউনিস্ট রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে সেখানে মারা যায় জাহিদ।

দেশভাগের পর কেটে গেছে পঁচাত্তর বছর। ভারত থেকে অভিবাসী হয়ে আসা বিহারিদের অনেকেই গত হয়েছে। বর্তমানে যারা আছে তাদের অধিকাংশেরই জন্ম বাংলাদেশে। বর্তমান প্রজন্ম আর পাকিস্তানে যেতে চায় না। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে বিহারিদের একাংশের ভূমিকার জন্য সমগ্র বিহারি সম্প্রদায়কে আজও বাঙালি ঘৃণার চোখে দেখে। সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশে অনেকগুলো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমান নাগরিক অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে বসবাস করছে। কিন্তু উর্দুভাষী বিহারিরা মূলস্রোতে মিশে যেতে পারেনি। তাদের গায়ে লেগে থাকা 'পাকিস্তানি' বা 'বিহারি' তকমা আজও তাদেরকে পৃথক করে রেখেছে বাঙালিদের থেকে। ঐতিহাসিক এক ভুলের খেসারত দিচ্ছে তারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম। উপন্যাসের চরিত্র মেতালেবের কন্যা শাহজাদী বিহার দেখেনি, পাকিস্তান দেখেনি; সে দেখেছে বাংলাদেশের মাটি। শাহজাদীর স্বপ্নে পাকিস্তান ডানা মেলে না। তার মনে হয় পাকিস্তানে ফেরার জন্য অপেক্ষা বিহারিদের ভুল সিদ্ধান্ত। "ওরা বেয়াকুফের মতো ডালে বসে ডালটাকেই কেটে চলেছে – জিস্ ডাল পর বয়ঠা উসী কো কাট্ রাহা হ্যায়।"[৪৩] শুধু শাহজাদী নয় ক্যাম্পের অপর বিহারি শিশুরাও তাদের নিজেদের সংস্কৃতির পরিবর্তে বাঙালি সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছে। অবরুদ্ধ

বিহারি গোষ্ঠীর মধ্যে এই গোপন বিবর্তন বিস্মিত করে মোতালেবকে। বাঙালি এক রিকসাওয়ালা ছেলের হাত ধরে ক্যাম্প থেকে পালিয়ে যায় শাহজাদী। বিহারি-বৌ দেখতে আসা কৌতূহলী মানুষের ভিড় আতঙ্কিত করে শাহজাদীকে। সে বুঝতে পারে "একটি বাঙাল দরিদ্র যুবকের হাত ধরে স্বপ্নের এই যাত্রা যত সহজ, তার চেয়ে হাজার গুণ কঠিন জীবনের এই বাস্তবতা।"[৪৪]

১৯৭৩ সালের দিল্লি চুক্তি এবং ১৯৭৪ সালের ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭৪-২০০২ সাল পর্যন্ত ১৯৩৫৯০ জন বিহারিকে প্রত্যাবাসন করা হয়।[৪৫] পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক জটিলতায় এই প্রত্যাবসন প্রক্রিয়া থেমে যায়। যেসব বিহারি পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য অপশন দিয়েছিলো এবং যারা নিজেদেরকে পাকিস্তানি হিসেবে গণ্য করতো একসময় সেসব অপেক্ষারত বিহারিদের ফিরিয়ে নিতে অস্বীকৃতি জানায় পাকিস্তান। বিহারিদের জীবন সংকটের এই বাস্তব দিকটির উল্লেখ আছে উপন্যাসে। যে জুলফিকার আলী ভুট্টো আটকে পড়া পাকিস্তানিদের ফিরিয়ে নিতে ওয়াদাবদ্ধ ছিলেন, তার মৃত্যুর পর অজানা সংকট এসে ভিড় করে বিহারিদের মনে। ভুট্টো গিয়ে জেনারেল জিয়াউল হক আসেন পাকিস্তানের শাসক হয়ে কিন্তু কেউ ফিরেও তাকায় না আটকে পড়া পাকিস্তানিদের দিকে। নেতারা দরবার করে পাকিস্তানের সঙ্গে, জাতিসংঘের সঙ্গে, আরব দেশগুলোর সঙ্গে, সবাই তাদের শুধু অপেক্ষা করতে বলে। একসময় যখন শুনে পাকিস্তান বিহারিদের ফিরিয়ে নিতে অনিচ্ছুক তখন হতাশায় ভেঙে পড়ে মোতালেব।

পঁয়ত্রিশ বছর অপেক্ষার পর মোতালেব জানতে পারে পাকিস্তানের নেতারা আটকে পড়া বিহারিদের ফেরত নিতে অস্বীকার করেছে। অবশেষে মোতালেব সিদ্ধান্ত নেয় সে পালিয়ে চলে যাবে তার জন্মস্থান, বিহারের ইমামপুরা গ্রামে। পুত্রবধূ শাকেরা আর তার শিশু কন্যাকে নিয়ে সীমান্তের উদ্দেশ্যে দিনাজপুরগামী নৈশকোচে চেপে বসে মোতালেব। পেছনে পড়ে থাকে ঢাকা শহরের জেনেভা ক্যাম্প। সীমান্তে নারী পাচারকারীদের হাতে পড়ে পাচার হয়ে যায় শাকেরা। সীমান্তরক্ষীদের হাতে ধরা পড়ে মোতালেবের গন্তব্য হয় জেলখানায়। পঞ্চান্ন বছর পর মোতালেবের দ্বিতীয়বার দেশত্যাগ ও সীমান্তরক্ষীদের হাতে ধরা পড়ার মধ্য দিয়ে লেখক বিহারিদের যে আত্মপরিচয় সংকট আবিষ্কার করেন তা হলো– পাকিস্তানি নয়, বাংলাদেশি নয়, ভারতীয় নয়, হিন্দু নয়, মুসলমান নয়; বরং সে রাষ্ট্রহীন একজন মানুষ। বিষয় হিসেবে অভিনবত্বের চমক সৃষ্টির জন্য নয়, বরং শিল্পীর দায় থেকেই হরিপদ দত্ত দেশভাগের নির্মম শিকার এই বিহারি জনগোষ্ঠীর সংকটকে নিয়ে এসেছেন সাহিত্যে। তাই তিনি যথার্থই বলেছেন, "রাজনৈতিক বিপর্যয়ের এই মানবিক-ট্রাজেডি নির্মাণের মধ্য দিয়ে লেখক হিসেবে আমি আমার শিল্প-দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি বলে মনে করি।"[৪৬]

৪. দেশভাগভিত্তিক ছোটগল্পে বিহারিদের আত্মপরিচয় সংকট

বিহারিদের জীবনসংকট নিয়ে রচিত ছোটগল্পের সংখ্যাও অপ্রতুল। শওকত ওসমানের 'গেঁহু', প্রফুল্ল রায়ের 'অনুপ্রবেশ', তানজিনা হোসেনের 'লাল বেনারসি' প্রভৃতি গল্পে উর্দুভাষী বিহারিদের উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণার উল্লেখ আছে। এর মধ্যে প্রফুল্ল রায়ের 'অনুপ্রবেশ' গল্পটিতে বিহারিদের আত্মপরিচয় সংকটের মর্মস্পর্শী বর্ণনা পাওয়া যায়। এই গল্পে মাত্র চল্লিশ বছরের ব্যবধানে

ভারতের বিহারি মুসলমানদের দুইবার দেশত্যাগ, বাংলাদেশে বিহারিদের আত্মপরিচয় সংকট, অস্তিত্বের সন্ধানে নতুন উপনিবেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা এবং ভোটের মূল্যে নিজেদের আত্মপরিচয় লাভের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

কলকাতা ও নোয়াখালীর দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৬ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বিহারে সংঘটিত হয় 'গ্রেট বিহারি কিলিং', যেখানে প্রায় ৩০ হাজার মুসলমানের প্রাণহানি ঘটে।[৪৭] কলকাতায় কাজ করতে আসা বিহারের মানুষ দেশে ফিরে গিয়ে কলকাতার দাঙ্গার খবর শোনায় এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে নোয়াখালীর দাঙ্গার খবরও ছড়িয়ে পড়লে বিহারের বিভিন্ন এলাকায় দাঙ্গা শুরু হয়। প্রায় একতরফাভাবে হিন্দুরা আক্রমণ চালায় মুসলমানদের উপর।[৪৮] বহু ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই দাঙ্গার পর বিহারের প্রায় ৫০ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়।[৪৯] ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ যখন প্রায় নিশ্চিত তখন কলকাতার নগর মুসলিম লীগের নেতা রাগীব আহসান বিহারিদের সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে মোহাম্মদ আলী জিন্নার কাছে জানতে চান– "লক্ষ লক্ষ বিহারিকে কী পুনরায় হিন্দুস্থানের নেকড়েদের মুখে ঠেলে দেয়া হবে? জানতে চান, বিহারিরা এখন কোথায় যাবে? তারা কী গোলামীকে মেনে নিতে বাধ্য হবে। জনাকীর্ণ পূর্ববঙ্গে তাদের থাকার জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে?"[৫০] দেশভাগ হয়ে গেলে রাগীব আহসানসহ লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু বিহারি চলে আসে পূর্ব পাকিস্তানে। 'অনুপ্রবেশ' গল্পে লেখক বিহারের দাঙ্গা এবং দেশভাগের পর প্রাণের ভয়ে হাজার হাজার বিহারির পূর্ব পাকিস্তানে আগমন এবং তাদের উদ্বাস্তু জীবনের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন গল্পের চরিত্র মুদাস্‌সর আলীর পরিবারসহ দেশত্যাগ এবং উদ্বাস্তু জীবনের নানা অভিজ্ঞতা বর্ণনার মধ্য দিয়ে। গল্পে দেখা যায় ১৯৪৬ সালে বিহারে যে দাঙ্গা হয় তাতে বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায় মুদাস্‌সর আলীর। তার পরিবারের কেউ মারা না গেলেও আশেপাশের চেনাজানা অনেকেই খুন হয়। দেশভাগের পর চারদিকে যখন শুধু হত্যা, আগুন, রক্তস্রোত, লাশের পাহাড়, ঘৃণা আর উন্মত্ততা তখন মোদাস্‌সর আলী পুরুষানুক্রমে কয়েকশ বছরের স্বদেশ ফেলে পালিয়ে আসে পূর্ব পাকিস্তানে। পেছনে পড়ে থাকে জমিজমা আর পোড়া বাড়ির ধ্বংসস্তূপ। পাকিস্তানে আসার এক বছর পরই মৃত্যু হয় মুদাস্‌সর আলীর। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র রহমত ঢাকায় রেডিমেড পোশাকের দোকান দিয়ে কোনোরকমে উদ্বাস্তু জীবনটাকে গুছিয়ে নেয়। একসময় তার স্ত্রীরও মৃত্যু হয়। শোকার্ত রহমত পুত্র ফরিদকে নিয়ে অতি সাধারণভাবেই জীবনযাপন করে আসছিলো। এরই মধ্যে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। রহমত দেখে বাঙালি আর অবাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তখন চরম অবিশ্বাস, ঘৃণা আর বিদ্বেষ, যেমনটি ছিলো দেশভাগের আগে হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে। নগর পুড়লে যেমন দেবালয় এড়ায় না তেমনি মুক্তিযুদ্ধে বিহারিদের একাংশের অপকর্মের জন্য সব বিহারিকেই খেশারত দিতে হয়েছে। গল্পের রহমত আলী খুব সাধারণ মানুষ হলেও তখনকার সেই উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে সেও রেহাই পায় না। তার দোকানটি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। মার খেয়েও কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে যায় সে। একদিন যুদ্ধ থেমে যায়। বাতাস থেকে বারুদের গন্ধ আর মাটি থেকে রক্তের দাগ মুছে গেলেও বিহারিদের সম্পর্কে সন্দেহ আর ঘৃণা থেকে যায়। যে বিহারিরা নিরাপত্তার কারণে ভারত থেকে পালিয়ে এসেছিলো, গভীর আবেগে পাকিস্তানকেই স্বদেশ ভেবেছিলো, সেই পাকিস্তান যখন ভাগ হয়ে

নতুন স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হলো তখন তারা এবার কোথায় যাবে? বিরাট এক দুশ্চিন্তার বোঝা নেমে আসে তাদের কাঁধে।

পাকিস্তান উর্দুভাষী বিহারি মুসলমানদের ঢাকা থেকে নিয়ে যাবে এমন সংবাদে আশান্বিত হয় রহমত আলী। শুনেছে কিছু বিহারিকে নিয়েও গেছে। অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকে রহমতও। বছরের পর বছর কেটে যায় কিন্তু পাকিস্তান থেকে তাদের নেওয়ার জন্য কোনো প্লেন বা জাহাজ আসে না। একবার দশদিন জ্বরে ভুগে রহমতের মৃত্যু হলে অসহায় হয়ে পড়ে পুত্র ফরিদ। কোনো রকমে সে বিএ ডিগ্রিটা অর্জন করে। কিন্তু বাংলাদেশে সে চাকরি পাবে না, কারণ সে তো বাংলাদেশের নাগরিক নয়। তাই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা তাকে হতাশার দিকে ঠেলে দেয়। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে বিহারিরা কোনো নাগরিক অধিকার পায়নি। উপন্যাসে দেখা যায় লাহোর, করাচি বা ইসলামাবাদ থেকে প্লেন এসে বিহারিদের নিয়ে যাবে, এই বিশ্বাসে যখন চিড় ধরে তখন তাদের কেউ কেউ সিদ্ধান্ত নেয় তারা ফিরে যাবে ভারতে পূর্ব-পুরুষের ভিটায়। বর্ডারের এপারে-ওপারে দুইশত করে টাকা দিয়ে তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ট্রেনে, বাসে, সাইকেল, রিকশায়, পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তিন দিন পর গিয়ে পৌঁছায় বিহারে। আত্মপরিচয়ের সন্ধানে তাদের সাথে যাত্রা করে ফরিদও। ভারতের মাটিতে পা রেখে ফরিদ যে আত্মপরিচয় সংকট উপলব্ধি করে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গল্পকার বলেছেন:

> কয়েক জেনারেশন ধরে তখন তারা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার প্রজা–ভারতীয় মুসলমান। দেশভাগের পর ঢাকায় গিয়ে তারা হয়ে যায় পাকিস্তানী। তারপর নিশ্চিতভাবে না হলেও বাংলাদেশে থাকার কারণে হয়তবা বাংলাদেশী। আর এই মুহূর্তে ভোরের ঝাপসা আকাশের তলায় ইন্ডিয়ার মাটির ওপর যখন পা ফেলে এগিয়ে চলেছে তখন তাদের কী আইডেনটিটি, সে জানে না।[৫১]

বিহারের এক জনশূন্য এলাকায় দালালদের সহযোগিতায় কোনো রকমে বাঁচার মতো আশ্রয় তৈরি করে নেয় তারা। চল্লিশ বছর আগে যেটি ছিলো তাদের স্বদেশ, সেখানে তাদের নতুন পরিচয় তখন 'ঘুসপৈঠিয়া' বা 'অনুপ্রবেশকারী'। তারা সেদেশের কেউ না। গল্পের এক অনন্য চরিত্র ষাট বছরের জীবনের অধিকারী শওকত। ভারত, পাকিস্তান আর বাংলাদেশের অজস্র দাঙ্গা, গণহত্যা, দেশভাগ, অস্থিরতা আর উন্মাদনার সাক্ষী। জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতা তাকে শিখিয়েছে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে। সে জানে ইন্ডিয়ায় থাকতে হলে পলিটিক্যাল প্রটেকশনটা একান্ত জরুরি। ফরিদকে নিয়ে সে যায় আসন্ন নির্বাচনের প্রার্থী রামবনবাস চৌবের কাছে। নির্বাচনে প্রতিপক্ষ আজীবলালকে হারাতে রামবনবাসের ছয়শ ভোট প্রয়োজন। বাংলাদেশ থেকে যাওয়া সাতশর মত আশ্রয়প্রার্থীকে দিয়ে ভোটের ঘাটতি অংশ সহজেই পূরণ করা যাবে, তাই ভোটে জেতার প্রয়োজনে রামবনবাস তাদের নাম তুলে দেয় ভোটার লিস্টে। শওকতকে বলে, "আগলা চুনাওতে আমাকে তোমরা ভোট দেবে। আমার চিহ্ন পেঁড়।"[৫২] রামবনবাসের সুপারিশে তারা রেশন কার্ডও পেয়ে যায়। আবার তারা হয়ে যায় রাজনৈতিক নেতাদের ক্রীড়নক। রামবনবাসের প্রতিপক্ষ আজীবলালের গুণ্ডারা তাদের ওপর হামলা করে আর রামবনবাস ভোটের স্বার্থে তাদের আশ্রয় দেয়। তবুও ভোটের মূল্যে শওকতের মত দুইবার দেশ হারানো মানুষদের আত্মপরিচয় লাভের সুযোগ ঘটে– এই সত্যটি গল্পকার তুলে ধরেছেন গল্পের শেষে। গল্পকারের বর্ণনায়– "ব্রিটিশ আমলে তারা ছিল ভারতীয়, তারপর পাকিস্তানী, তারপর বাংলাদেশী। চুনাও এর কারণে তারা চল্লিশ বছর পর নতুন

আইডেনটিটি পেয়ে যায়। এখন তারা আবার ভারতীয়।"[৫৩] আত্মপরিচয়হীন, নেতৃত্বহীন, অসহায় বিহারিদেরকে নেতারা কীভাবে রাজনীতির জটিল হিসাব মেলাতে বিহারিদের ব্যবহার করেছে তার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে এই গল্পে।

দেশভাগের শিকার বিহারিদেরকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পক্ষ ব্যবহার করেছে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে। পাকিস্তানি শাসকরা তাদেরকে নিজেদের স্বার্থে বাঙালিদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তাদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেছে। বিহারিদের স্বঘোষিত নেতারা তাদের নানাভাবে বিভ্রান্ত করেছে, প্রতারিত করেছে। উর্দুভাষী নেতারা তাদের দিয়ে নানারকম স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করেছে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে তাদের নামে আসা উটের মাংস, খেজুর, কম্বল ইত্যাদি ত্রাণসামগ্রী নিয়ে নানা রকম ব্যবসা করা হয়েছে। তাদের দেখিয়ে দাতা সংস্থা থেকে আনা অর্থ নামমাত্র খরচ করে বাকিটা লোপাট করা হয়েছে। এসব করে তাদের অনেক নেতা অর্থনৈতিকভাবে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। তাদের বর্তমান নেতৃত্বও বহুধা বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থে ব্যস্ত। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত বিহারিদের ভোটাধিকার দিলেও জনগোষ্ঠীর মূলস্রোতে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ কেউ নেয়নি। তাদের পুনর্বাসনে কার্যকর কোনো উদ্যোগ লক্ষ করা যায় না। ভোটাভুটির জটিল অঙ্ক মেলানের জন্য তাদেরকে ভোটার করা হয়েছে এমনটাই বিশ্বাস করে বিহারিরা। দেশভাগের পর পাকিস্তানে এসে বিহারিরা কীভাবে পাকিস্তানি শাসকদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে, বিভ্রান্ত হয়েছে তার চিত্র যেমন প্রতিফলিত হয়েছে হরিপদ দত্তের *মোহাজের* উপন্যাসে, অন্যদিকে আত্মপরিচয়হীন বিহারিরা কীভাবে নেতাদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে, ভোটের রাজনীতির শিকার হয়েছে তার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে 'অনুপ্রবেশ' গল্পে।

৫. উপসংহার

দেশভাগের ইতিহাস মূলত মানবিক সংকটের ইতিহাস। দেশভাগের নানা অস্বাভাবাবিক পরিণতির মধ্যে বিহারিদের জীবনের সংকটটি অন্যতম। তাদের জীবনের একটি প্রধান সমস্যা আত্মপরিচয় সংকট। ভারত, পাকিস্তান নাকি বাংলাদেশ কোনটি তাদের দেশ? ভারতীয়, পাকিস্তানি নাকি বাংলাদেশি কোনটি তাদের জাতীয়তা? – এই দ্বন্দ্ব তাদের স্বাভাবিক জীবনকে ব্যহত করেছে। উল্লেখ্য, বিহারিরা ছাড়াও দেশভাগের পরিণামে যারা উদ্বাস্তু জীবন গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলো তারা কয়েক প্রজন্ম ধরে আত্মপরিচয় সংকটে ভুগছে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন – দেশভাগের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে পূর্ববঙ্গ থেকে যে বিপুল সংখ্যক মানুষ পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদের কাছে 'দেশ' কোথায় জানতে চাইলে তাদের নাতিরাও বাংলাদেশের বানারীপাড়া, বিক্রমপুরের নাম বলে।'[৫৪] যেকোনো সামাজিক অভিঘাতই সাহিত্যে প্রতিফলিত হওয়া স্বাভাবিক। বাংলা সাহিত্যেও তাই দেশভাগজনিত মানবিক বিপর্যয়ের চিত্র উঠে এসেছে স্বাভাবিকভাবেই। ইংরেজি 'পার্টিশন লিটারেচার' কথাটির মতো 'দেশভাগের সাহিত্য' কথাটিও বর্তমানে বাংলা সাহিত্য জগতে বেশ প্রচলিত। ইতিহাসের বাইরে দেশভাগ ও দেশান্তর বিষয়ে লেখাগুলিকে দেশভাগের সাহিত্য বিবেচনা করলে এর পরিসরটিও একেবারে ছোটো নয়।[৫৫] তারপরও দেশভাগ বিষয়ে সাহিত্যিক নীরবতার অভিযোগটি বেশ জোরালো। কারণ দেশভাগের

ফলে যে বহু মাত্রার সংকট সৃষ্টি হয়েছে তার সবগুলো লেখকগণ আনতে পারেননি সাহিত্যে। মিহির সেনগুপ্ত এ প্রসঙ্গে বলেছেন:

> এ এক অভিশাপ মুখর সময় সম্ভবত, যখন, লোকশিল্পীরা পর্যন্ত এর চিত্র, সুর, কথকতা বা কোনও কিছুই ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না, অথবা তার ফুরসতও পান না। বোধহয় তখন একদিকে লোভের লুণ্ঠন, আরেকদিকে আতঙ্কের পলায়নই শুধু ছবি। কিন্তু হায়! এরকম ছবিতে কি কোনও শিল্পী মাতৃবর্ণ দ্যাখে?[৫৬]

দেশভাগ বিষয়ে এপর্যন্ত যেসব সাহিত্য রচিত হয়েছে তার অধিকাংশই উদ্বাস্তুর দিনলিপি ধরনের রচনা। এসব রচনায় দেশান্তর হওয়া মানুষের নতুন দেশে বসতি স্থাপনের অভিজ্ঞতাই প্রাধান্য পেয়েছে। দেশভাগের মধ্য দিয়ে মানুষ কীভাবে রাজনীতির শিকার হয়েছে, দেশত্যাগী মানুষেরা কীভাবে রজনীতিকদের ক্রীড়নক হয়েছে, ভোটের মূল্যে কীভাবে মানুষের ভাগ্য বিক্রি হয়েছে, দেশভাগের এমন সব সংকট সাহিত্যে কম চিত্রিত হয়েছে। দেশভাগের শিকার বিহারিদের জীবনে এসব সংকট চরম সত্য। কথাসহিত্যিক প্রফুল্ল রায় এবং হরিপদ দত্ত বিহারিদের জীবনের এসব সংকটকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন তাঁদের গল্পে, উপন্যাসে। বিহারিদের সংকট নিয়ে রচিত প্রফুল্ল রায়ের 'অনুপ্রবেশ' গল্প ও হরিপদ দত্তের *মোহাজের* উপন্যাস তাই দেশভাগভিত্তিক কথাসাহিত্যে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। এসব রচনায় লেখকদ্বয় বংশপরম্পরায় শেকড়ছিন্ন, আত্মপরিচয়হীন বিহারিদের ঠিকানার সন্ধান দিয়েছেন তাদের জন্মভূমিতে– যার মধ্য দিয়ে তাঁরা লেখকের শিল্প দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছেন।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১ সেমন্তী ঘোষ, 'দেশভাগের ইতিহাস আর স্মৃতি-বিস্মৃতি', *দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা* (কলকাতা: গাঙচিল, ২০০৮), পৃ. ১

২ অশ্রুকুমার শিকদার, 'ভাঙা বাংলার সাহিত্য', *দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা*, সেমন্তী ঘোষ সম্পা. (কলকাতা: গাঙচিল, ২০০৮), পৃ. ১৯২

৩ যতীন সরকার, *পাকিস্তানের জন্ম-মৃত্যুদর্শন* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৫), পৃ. ১৮

৪ হারুন-অর-রশিদ, 'অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ', সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ১ম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩, পৃ. ৩৯৮

৫ Census of Pakistan 1951, Vol.3, (Dacca: East Bengal Government), p. 39

৬ Census of Pakistan Population 1961, Vol. 11, (Karachi: Home Affairs Division and Ministry of Home and Kashmir Affairs), p. 21

৭ আবু মো. দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), 'পূর্ববঙ্গে বিহারিদের অভিবাসন এবং রাজনীতিতে এর প্রভাব', *ইতিহাস অনুসন্ধান* ১৬, গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পা. (কলকাতা: ফার্মা কেএলএম, ২০০২), পৃ. ৭৭৪

৮ আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের অবাঙালি মোহাজেরদের (বিহারি) ভূমিকা', *বাংলাদেশ চর্চা/৩*, মুনতাসীর মামুন সম্পা. (ঢাকা: ২০০৫), পৃ. ৭৭

৯ Zaglul Haider, 'Repatriation of the Biharis Stranded in Bangladesh: Diplomacy and Development', *Asian Profile*, Accessed: August 8, 2022, Vol. 31, No. 6, December 2003, p. 525

১০ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি: ১৯০৫-৪৭* (ঢাকা: সংহতি প্রকাশন, ২০১৫), পৃ. ২৬০

১১ কবীর চৌধুরী, *সাহিত্যকোষ* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০১), পৃ. ১০২

১২ হরিপদ দত্ত, ভূমিকা, *মোহাজের* (ঢাকা: ২০১২), পৃ. ৭

১৩ তদেব, পৃ.৭

১৪ হারু হারুন-অর-রশিদ, 'অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ', সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৬

১৫ জয়া চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হল: হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশভাগ (১৯৩২-১৯৪৭)*, আবু জাফর অনু. (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৩), পৃ. ২৬৯

১৬ হরিপদ দত্ত, *মোহাজের* (ঢাকা: ২০১২), পৃ. ১০

১৭ তদেব, পৃ. ১৯।

১৮ Arifur Rahaman, A K M Jamal Uddin and Md. Shakhawat Hossain "Origin and Socio-cultural Formation of Bihari Identity: A Study on Bihari Community in Bangladesh", *International Journal of Social Political and Economic Research*. Accessed: August 18, 2022, p. 883

১৯ ইফাত আরা, *সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক: ঢাকা জেলাভিত্তিক পর্যালোচনা, ১৯৪৭-৭১ সাল* (পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫), পৃ. ৫০

২০ হরিপদ দত্ত, *মোহাজের*, পৃ. ২৬।

২১ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি: ১৯০৫-৪৭*, পৃ. ২৬০

২২ আহমেদ ইলিয়াস, বিস্মৃতির গভীরে বাংলাদেশের বিহারি সম্প্রদায়, *সাতচল্লিশের দেশভাগ*, বুদ্ধদেব ঘোষ, দেবব্রত বিশ্বাস সম্পা. (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৬), পৃ.২৮৯

২৩ তদেব, পৃ. ২৬১

২৪ তদেব, পৃ. ৩০

২৫ তদেব, পৃ. ৩৭

২৬ তদেব, পৃ. ৩৬

২৭ Zaglul Haider, "Repatriation of the Biharis Stranded in Bangladesh: Diplomacy and Development", p. 523

২৮ আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* (ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০৬), পৃ. ২৬২

২৯ তদেব, পৃ. ২৬২

৩০ হরিপদ দত্ত, *মোহাজের*, পৃ. ৩৮

৩১ Zaglul Haider, 'Repatriation of the Biharis Stranded in Bangladesh: Diplomacy and Development', p. 531

৩২ হরিপদ দত্ত, *মোহাজের*, পৃ. ৪৪

৩৩ Eric Paulsen, 'The Citizenship Status of the Urdu-Speakers/Biharis in Bangladesh', *United Nations High Commissioner for Refugees, Bangladesh* Refugee Survey Quarterly. Accessed: August 21, 2022

৩৪ আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের অবাঙালি মোহাজেরদের (বিহারি) ভূমিকা', পৃ. ৮৩

৩৫ হরিপদ দত্ত, *মোহাজের*, পৃ, ৪৫-৪৯

৩৬ Kazi Fahmida Farzana, 'An Artificial Minority: The Stateless Biharis in Bangladesh', *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol. 29, No. 2, June 2009. Accessed: August 21, 2022

৩৭ আহমেদ ইলিয়াস, বিস্মৃতির গভীরে বাংলাদেশের বিহারি সম্প্রদায়, *সাতচল্লিশের দেশভাগ*, পৃ. ২৯০

৩৮ তদেব, পৃ. ৮৯

৩৯ Sumit Sen, 'Stateless Refugees and the Right to Return: The Bihari Refugees of South Asia – Part 1', *International Journal of Refugee Law*, Vol. 11, No. 4, 1999, pp. 625-645 at p. 640.

৪০ হরিপদ দত্ত, *মোহাজের*, পৃ. ৫৫

৪১ তদেব, পৃ. ৪৯

৪২ তদেব, পৃ. ৭৬

৪৩ তদেব, *পৃ.* ৭৭

৪৪ তদেব, *পৃ.* ৭৭

৪৫ Zaglul Haider, 'Repatriation of the Biharis Stranded in Bangladesh: Diplomacy and Development', *Asian Profile*, Vol. 31, No. 6, December 2003, p. 526

৪৬ হরিপদ দত্ত, ভূমিকা, *মোহাজের*, পৃ. ৭

৪৭ Taj Ul-Islam Hashmi, The 'Bihari' Minorities in Bangladesh: Victims of Nationalisms, *Stateless in Bangladesh and Pakistan Inc*., USA, p. 4 (Accessed: November 29, 2022, http://www.stateless peopleinbangladesh.net)

৪৮ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ইতিহাসের দিকে ফিরে ছেচল্লিশের দাঙ্গা* (কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ, ২০১০), পৃ. ৬৮

৪৯ তদেব, পৃ. ৭০

৫০ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি: ১৯০৫-৪৭*, পৃ. ২৬০

৫১ প্রফুল্ল রায়, 'অনুপ্রবেশ', *সেরা ৫০টি গল্প* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯), পৃ. ২৯

৫২ তদেব পৃ. ৪০

৫৩ তদেব, পৃ. ৪১

৫৪ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, *এই জীবনের যত মধুর ভুলগুলি* (ঢাকা: কাগজ প্রকাশন, ২০১৯). পৃ. ১৩।

৫৫ এ প্রসঙ্গে মিহির সেনগুপ্তের 'বিষাদবৃক্ষ', 'একটি ঢোঁরা সাপের কর্মজীবন'; শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'এই জীবনের যত মধুর ভুলগুলি'; দক্ষিণারঞ্জন বসুর 'ছেড়ে আসা গ্রাম'; হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উদ্বাস্তু'; অশোক মিত্রের 'আপিলা-চাপিলা'; জ্যোতির্ময় বসুর 'সাতচল্লিশের দেশভাগ'; হাসান আজিজুল হকের 'উঁকি দিয়ে দিগন্ত', সেমন্তী ঘোষের 'দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা' ইত্যাদি রচনার নাম উল্লেখযোগ্য। এসব রচনায় দেশভাগের বেদনা, উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণা ও আত্মপরিচয় সংকটের যে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, তা থেকে দেশভাগের পরিণামে পাকিস্তান ও ভারতের সংখ্যালঘু হিন্দু-মুসলমানে জীবনে নেমে আসা মানবিক বিপর্যয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

৫৬ মিহির সেনগুপ্ত, *বিষাদবৃক্ষ* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৪), পৃ. ২৫৫

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একচল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০/জুন ২০২৩

উর্দু সাংবাদিকতার ইতিহাস

জাফর আহমদ ভূঁইয়া*

সারসংক্ষেপ

ভারত উপমহাদেশে ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশের প্রায় বিয়াল্লিশ বছর পর উর্দু সংবাদপত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সেসময়ে ইংরেজ শাসকদের অত্যাচার নিপীড়নে উপমহাদেশের মানুষ ছিল জর্জরিত। যুগের এমন ক্রান্তিলগ্নে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণের কণ্ঠস্বর হয়ে উর্দু সংবাদপত্র যাত্রা শুরু করে। লালা সদা সুখের সম্পাদনায় বাঙালি হিন্দু ব্রাহ্মণ হরিহর দত্ত ২৭শে মার্চ ১৮২২ সালে কলকাতা থেকে 'জামে জাহান নুমা' নামে উর্দু ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। দিল্লি থেকে প্রকাশিত উর্দু ভাষার পত্রিকা '*দিল্লি উর্দু আখবার*' ভারতবর্ষ স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সিপাহী বিদ্রোহের পক্ষে '*দিল্লি উর্দু আখবার*'এর সক্রিয় লেখনীর দরুন এর সম্পাদক মৌলভী বাকেরকে তৎকালীন ইংরেজ সরকার জনসম্মুখে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়। সম্প্রতি ২৭ শে মার্চ ২০২২ সালে উর্দু সংবাদিকতার ২০০ বছর উদযাপিত হয়। এই গবেষণা প্রবন্ধে উর্দু সাংবাদিকতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বিপ্লব ও বিকাশ তুলে ধরার প্রয়াস করা হবে এবং সেই সাথে সংবাদপত্রের বিষয়বস্তুসমূহ যেমন রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, শিক্ষা, সাহিত্যিক তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে।

চাবি শব্দ: সাংবাদিকতা, উর্দু, ইতিহাস।

উর্দু সাংবাদিকতার সূচনা এমন এক সময় হয়েছিল যখন এ উপমহাদেশের সিংহাসন ছিল ইংরেজদের দখলে এবং ইংরেজদের শোষণে জর্জরিত জনগণের মনে ইতোমধ্যে স্বাধীনতার বাতাস বইতে শুরু করেছিল। যুগের এমন ক্রান্তিলগ্নে উর্দু সংবাদপত্র শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের কণ্ঠ হয়ে শুভযাত্রা শুরু করে। মোঘল যুগে এ উপমহাদেশের সরকারি ভাষা ফারসি ছিল। সেসময়ে উপমহাদেশের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে যদিও উর্দু ভাষার প্রচলন ছিল কিন্তু শিক্ষা এবং সাহিত্যচর্চার মাধ্যম হিসেবে শাসকগোষ্ঠীর ভাষা ফারসি বেশ গুরুত্ব বহন করেছে। ইংরেজরা ক্ষমতাগ্রহণের পর অফিস-আদালতে পরাজিত জাতির ভাষা (ফারসি) পরিবর্তনে সোচ্চার হয়ে উঠল। এ সম্পর্কিত এ. বি. এম রেজাউল করিমের একটি প্রবন্ধের কিছু অংশ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

> দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন এক শতাব্দীকাল অতিক্রান্ত হলে, তারা এখানে তাদের ক্ষমতা চিরস্থায়ী করতে নানা ধরনের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের উদ্যেগ গ্রহণ করে। এই সংস্কার উদ্যোগের অন্যতম হলো এ দেশ শাসন ও শোষণে উপযোগী একটি ভাষা-রাজনৈতিক উদ্যোগ। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ব্রিটিশ রাজ ১৮৩৫ সালে এক রাজকীয় ফরমান জারি করে। ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সাম্রাজ্যে ভাষার প্রায়োগিকতা নিয়ে জারি করা এই ফরমান, দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম ভাষা নীতি হিসেবে খ্যাত হয়। ঘোষিত এই ভাষানীতির আওতায় মুসলমান রাজশক্তির প্রতীক ফার্সীভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ করে এবং দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে ইংরেজী ভাষা ব্যবহারে বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। আর স্থানীয় পর্যায়ে দাপ্তরিক কার্য

* অধ্যাপক, উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

> পরিচালনার জন্য স্থানীয় বুলি (vernacular) ব্যবহারকে উৎসাহিত করে। ফলে একদিকে মুসলমান রাজশক্তির প্রতীক ফার্সী ভাষা যেমন তার বিশ্রুতি হারাতে বসে, তেমনিভাবে স্থানীয় জনগণ নিজেদের স্থানীয় ভাষা ব্যবহারের অধিকার লাভ করে উল্লসিত হয়।[১]

সে-সময় স্থানীয় ভাষা হিসেবে উর্দু ভাষার জনপ্রিয়তা লক্ষণীয় ছিল। সে সময়ে ঘোষিত ভাষানীতি স্থানীয় ভাষাগুলোর ব্যাপক উন্নয়ন সাধন ঘটতে থাকে। যার মধ্যে উর্দু ভাষাও অন্যতম। এ সম্পর্কে তিনি আরো বলেন:

> ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন এই উপমহাদেশ অধিকার করে, তখন উপমহাদেশ জুড়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাষা পরিস্থিতি বিরাজ ছিলো...এ ভাষাগুলো হলো এ দেশে জ্ঞান চর্চার বাহক ধ্রুপদী ভাষা।...আর অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ফার্সি ছাড়া উর্দু ভাষার ব্যাপক প্রচলন ছিল। উর্দু ভাষা মোঘল শাসনামলে অষ্টাদশ শতাব্দিতে জনসাধারণের ভাষা ও রাজদরবারের ভাষা হিসেবে বিস্তৃত হয়েছিল। তখন উর্দু ও তার সমরূপ বুলিসমূহ একত্রে হিন্দুস্থানি ভাষা নামে অভিহিত হতো।[২]

এর ধারাবাহিকতায় উর্দু সাহিত্যেও আধুনিকায়ন ঘটতে থাকে। ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হতে থাকে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রভাবে উর্দু সাহিত্যে অনেক নতুন উপাদান সংযুক্ত হতে থাকে। উর্দু ভাষা হয়ে ওঠে আরো প্রাঞ্জল, সহজতর, এবং দূষণমূক্ত। মূলত নবনিযুক্ত ইউরোপীয় আমলাদের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি সাধন এবং স্থানীয় ভাষার সাথে সংযোগ ঘটানো ছিল এ কেন্দ্রের উদ্দেশ্য। কিন্তু পরোক্ষভাবে শাসকগোষ্ঠীর এ কর্মযজ্ঞে স্থানীয় ভাষাসমূহ বিকাশ লাভ করতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে উর্দু ভাষায় সংবাদপত্রের আগমন ঘটে।

প্রথম উর্দু পত্রিকা

ভারতবর্ষে ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশিত হওয়ার প্রায় বিয়াল্লিশ বছর পর উর্দু সাংবাদিকতার সূচনা ঘটে। ১৭৮০ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'হেকিজ গেজেট' ছিল ভারতবর্ষ থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র। চার পৃষ্ঠা সম্বলিত সাপ্তাহিক এই সংবাদপত্রটির মালিক, প্রকাশক এবং সম্পাদক ছিলেন জেমস আগস্ট হেকি। ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষার পরে স্থানীয় ভাষাগুলোর মধ্যে প্রথম বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ১৮১২ সালে। বাংলা সংবাদপত্রটির নাম ছিল 'বেঙ্গল গেজেট'।[৩] বাংলা ভাষার পরে দ্বিতীয় স্থানীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রটি ছিল উর্দু ভাষায়। উর্দুর প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্র নিয়ে কিছু গবেষকের ভিন্ন মত আছে।

একদলের মতে টিপু সুলতানকে উর্দু সংবাদপত্রের জনক বলা হয়েছে। যিনি ১৭৯৪ সালে একটি সরকারি আরবি অক্ষরের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করার আদেশ জারি করেন। তার আদেশ অনুযায়ী সেই প্রেস থেকে 'ফৌজি আখবার' নামে একটি সামরিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। সংবাদপত্রটি রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং সরকারি তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়েছিল এবং ধারণা করা হয় এটি ছিল উর্দু ভাষার প্রথম পত্রিকা। এই পত্রিকাটি জনসাধারণের কাছে পৌঁছাতো না। খ্যাতিমান সাংবাদিক এবং গবেষক শামীম তারিকের মতে, সকল তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক ভাবে

নিশ্চিত হওয়া যায় যে শ্রীরঙ্গপত্তনম থেকে প্রকাশিত *ফৌজি আখবার* উর্দু ভাষায় প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা।[৪] এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে গ্রিবচন চন্দ লিখেছেন:

"اردو کے اولین اخبار کے بارے میں ہمارے یہاں ایک دعویٰ اور بھی ہے، اس کے مطابق اردو کا سب سے پہلا اخبار اٹھارہویں صدی کے اواخر میں 1794 کے آس پاس میسور کے حکمران ٹیپوسلطان نے جاری کیا اور اس کا نام 'فوجی اخبار' تھا"۔

(অনুবাদ: উর্দুর প্রথম পত্রিকা সম্পর্কে আমাদের আরো একটি দাবি আছে, তা অনুযায়ী উর্দুতে সর্বপ্রথম সংবাদপত্র আঠারো শতাব্দীর শেষভাগে ১৭৯৪ সালের কাছাকাছি সময়ে মহীশূরের শাসক টিপু সুলতান প্রকাশ করেছিলেন এবং তার নাম 'ফৌজি আখবার' ছিল।)[৫]

টিপু সুলতানের 'ফৌজি আখবার'কে যে সকল গবেষক উর্দু ভাষার প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন তাদের মধ্যে শেখ মোহাম্মদ ইসমাইল পানিপথি (ম্যাগাজিন 'বসায়ের' জানুয়রি, এপ্রিল ও জুলাই ১৯৬৪), মোহাম্মদ সাদিক তার *History of Urdu Literature* বইয়ে এ বিষয়টির প্রমাণ মিলে। টিপু সুলতানকে উর্দু সংবাদপত্রের জনক হিসেবে সর্বপ্রথম মুহাম্মদ সৈয়দ আব্দুল খালেক উপস্থাপন করেন। তার মতে:

"فوجی اخبار' ایک ہفتہوار اخبار تھاجو میسور کے سرکاری پریس میں چھپتا تھا۔ اس کی تقسیم سلطان کی فوج تک محدود ہوتی تھی۔ اس اخبار میں فوجی خبروں اور احکام وغیرہ کے علاوہ انگریزوں کی شکایت اور فرانسیسیوں کی تعریف ہوتی تھی۔ یہ مطبع ٹیپوسلطان کی شہادت کے بعد ضبط کر لیا گیا اور جہاں کہیں اس اخبار کے نسخے دستیاب ہوئے انہیں تلف کر دیا گیا۔"

(অনুবাদ: ফৌজি আখবার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল যা মহীশূরের সরকারি প্রেস থেকে প্রকাশিত হতো। এর প্রচার সুলতানের সৈনিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সংবাদপত্রে সৈনিকদের খবর এবং আদেশ ইত্যাদি ছাড়াও ইংরেজদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং ফ্রান্সের প্রশংসা থাকতো। এই প্রকাশনা টিপু সুলতানের শাহাদাতের পর জব্দ করে নেওয়া হয় এবং যেখানেই এর কোন সংখ্যা পাওয়া গিয়েছে তা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।)[৬]

মুহাম্মদ সৈয়দ আবদুল খালেক তার গবেষণা গ্রন্থ 'মাহীশূর মেয় উর্দু' গ্রন্থটিতে উল্লেখ করেছেন যে, 'ফৌজি আখবার' প্রায় পাঁচ বছর ধরে প্রকাশিত হয়েছিল অর্থাৎ টিপু সুলতানের শাহাদাতের আগ পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটি শুধুমাত্র রাজকীয় সেনাবাহিনীর অফিসার এবং গুপ্তচরদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। সেনাবাহিনীর গতিবিধি, কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও বদলির খবর এবং সেনাবাহিনী সংক্রান্ত আদেশও প্রকাশিত হয়। তার এই গবেষণা গ্রন্থটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে পত্রিকাটি শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশ হয়েছিল এবং প্রায় ২৫০ কপি প্রকাশিত হওয়ার দাবি করা হয়েছে; তার একটি সংখ্যাও পাওয়া যায়নি। এমনকি লেখক এই পত্রিকাটির কোন সংখ্যা কিংবা তার কাঠামো সম্পর্কে কোন প্রকার প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন নি। এ কথা সত্যি যে সেসময়ে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করাতে পারে এমন অনেক দলিল-দস্তাবেজ বিনষ্ট করে ফেলা হয়েছিল। যদিও সেই সময়ে সরকারি ভাষা ফারসি ছিল কিন্তু এরপরও উর্দু ভাষায় সামরিক পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অনেক গবেষক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এই *ফৌজি আখবার* পত্রিকার অস্তিত্ব সম্পর্কে তেমন কোন উপযুক্ত প্রমাণ না

পাওয়ার কারণে তাকে উর্দু ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে সন্দেহ থেকেই যায়।

উর্দু সাংবাদিকতার উদ্ভব সম্পর্কে আরো একটি মত পাওয়া যায়। গবেষক নাদিম সীতাপুরি তার একটি প্রবন্ধে উপস্থাপন করেছেন যে, উর্দু সাংবাদিকতার উদ্ভব ১৮১০ সালেই হয়েছিল। তার মতে কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের একজন খ্যাতিমান লেখক মৌলভী আকরাম আলী 'উর্দু আখবার' নামে প্রথম উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি লিখেছেন:

فارسی 'جام جہاں نما' کا اردو ضمیمہ ، مولوی محمد باقر دہلوی کا
'اردو اخبار' اور مسٹر رام چندر دہلی کے رسائل یہ سب اردو اخبار
کلکتہ کے بعد پیداوار ہیں-(ماہنامہ 'العلم' کراچی، اکتوبر تا دسمبر 1971)

(অনুবাদ: ফারসি *জামে জাহান নুমার* উর্দু সংখ্যা, মৌলভী বাকির দেহলুভীর 'উর্দু আখাবর' এবং মাস্টার রাম চন্দর দিল্লি'র ম্যাগাজিন এই সব 'উর্দু আখবার' কোলকাতার পরে প্রকাশিত হয়েছে।)[৭]

জামে জাহান নুমা (جام جہاں نما)

উর্দু ভাষার অধিকাংশ গবেষক ইতিহাসবিদ তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে *জামে জাহান নুমা*-কে উর্দু ভাষার প্রথম সংবাদপত্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন যা ২৭ শে মার্চ, ১৮২২ সালে কোলকাতা থেকে উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়। জাফর ইকবাল তার একটি প্রবন্ধে লিখেছেন:

> Urdu Journalism started in the Indian sub-continent from Calcutta with the launch of *Jam-e-Jahan Numa* on March 27, 2022. Hari Hardat, a Bengali Brahmin Hindu, published the *Jam-e-Jahan Numa* from Calcutta on March 27, 1822. It was published under the editorship of Lala Sada Sukh lal; a Punjabi. The printer was William Hopkins, a British national and an employee of the East India Company. [৮]

এ সম্পর্কে ইতিহাসবিদ ও গবেষক তাহির মাসুদ তার গবেষণা গ্রন্থে নানা প্রমাণাদি উল্লেখ করে *জামে জাহান নুমা*-কে উর্দু ভাষার প্রথম সংবাদপত্র হিসেবে উপস্থাপন করে বর্ণনা করেছেন:

"اردو صحافت کے محققوں میں ایک مدت کی تحقیق و تفتیش اور بحث و نزاع کے بعد اب
اس رائے پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ 'جام جہاں نما' اردو کا پہلا اخبار ہے۔اس انکشاف
میں تاخیر کا سبب یہ ہوا کہ 'جام جہاں نما' جو 27 مارچ 1822ء کو پہلی بار منظور عام آیا
تھا ، چھے شمارے کی عشاعت کے بعد خریداروں کی بے التفاقی کی وجہ سے اپنی زبان
تبدیلی کرنے پر مجبور ہو گیا اور جون 1822 ء سے فارسی میں نکالنے لگا۔"

(অনুবাদ: উর্দু সংবাদপত্রের গবেষকদের মধ্যে গবেষণা ও আলোচনার পর এ বিষয়ে একমত্য পোষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, '*জামে জাহান নুমা*' উর্দু ভাষার প্রথম সংবাদপত্র। এই ঐকমত্য বিলম্ব হওয়ার পেছনে উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল, *জামে জাহান নুমা* ২৭ শে মার্চ, ১৮২২ সালে প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হয়েছিল যা ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশ হওয়ার পর ক্রেতাদের মাঝে মতবিরোধের কারণে ভাষা পরিবর্তনে বাধ্য হয়। জুন, ১৮২২ সাল থেকে ফারসি ভাষায় প্রকাশিত হয়।)[৯]

উপরোক্ত মতবাদ থেকে প্রতিয়মান হয় উর্দু ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র *জামে জাহান নুমা*। সংবাদপত্রটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল, যার পৃষ্ঠপোষক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল যা কখনো উর্দুতে কখনো ফারসিতে প্রকাশিত হয়েছিল। এর প্রকাশক হরিহর দত্ত এবং সম্পাদক মুন্সি সদা সুখ লাল উভয়েই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী ছিলেন। ছাপার দায়িত্ব ছিল উইলিয়াম পিটার্স কপ এন্ড কোম্পানির। এর ছাপাখানা সম্পর্কে ড. জাফর ইকবাল লেখেন:

> Jam-e-Jahan Numa- the pioneer Urdu language newspaper was printed at Mission press, 11, Circular Road, Calcutta and published from no.2, Collotola – a commercial place of central Calcutta.[১০]

'*জামে জাহান নুমা*' নামে প্রকাশিত উর্দু ভাষার প্রথম সংবাদপত্রটি প্রাথমিকভাবে উর্দু ভাষায় কেবল ছয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর এই সংবাদপত্রটি সম্পূর্ণ ফারসি ভাষায় প্রকাশ করা হয়। একবছর পর ফারসি সংখ্যার পাশাপাশি চার পৃষ্ঠার উর্দু সংখ্যা যুক্ত করা হয়। সে সময় উর্দু সংখ্যার ব্যাপক চাহিদা লক্ষ্য করা যায়।

জামে জাহান নুমা'র অবয়ব এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিম্মোক্ত তথ্য পাওয়া যায়:

جام جہان نما

آگرہ و زبان میں نمبر ۱۴۲ تاریخ ۱۷ ماہ مئی سنہ ۱۸۲۶ عیسوی

عہد کے کا ترجمہ

اوے کے بادشاہ و انگلنڈ انگریز بہادر کی سرکار سے جو نظر اور جو لاد آس عہد کے برابر بیل مہینہ کی گیارہ وہیں تاریخ کو نسل کے اراس میں تو اب بطے الفاسے گورنر جنرل بہادر کے دستخط ہوے اپریل مہینہ کی آٹھویں تاریخ یہاں آسکے فارسی جارنٹ سے اس کاغذ میں گھ گیا ہی انتوں انگلستان و بارے ایک واقعہ ہمارے اقتدار کے پیشہ اس کاغذ کو بانٹ کرتے ہیں اور اسکی نظر نہیں گستر کے برتو سے اس کاغذ کے اصلاح و استعارہ میں درج پایا ہیں پر اسکی کہ اگرچہ فارسی کاغذ سے احوال آمن عہد کے کا وضع و حرارت پر آسکے رہا گیا لیکن اس ملک کے عام لوگ کی اطلاع کے واسطے اگر ہندی زبان بھی ترجمہ کیا جاوے بہت مناسب ہی اسواسطے عہد کے کی شرطیں تھیں لکھی ہیں جو عہد کے اوتے بادشاہ اور انگلنڈ انگریز بہادر کی سرکار سے

عہد کے کا ترجمہ

جس جس طرح کا دعوی اشام اور آسکے توابع ملک پر اوے کا بادشاہ رکھتا تھا اوے سب دعوی اسی عہد کے کے سبب سے اوے کے بادشاہ نے چھوڑ دئے اور آئندہ کبھی اوے کے بادشاہ کو اس ملک سے کسو طرح کا تعلق نہ رہیگا اور کچھ زاور جیتنی بوری کی بابت بھی جس کو وہ ملک اشام سے طلب ہی اس عہد کے بیچ اوے پر قرار • اور بر قرار • اور منی پور کے متعلق میں اب قرار پایا کہ جو گنبیر سنگھ کو منی پور کے راج کا انتظام منظور رہا اوسکے بادشاہی طرف سے ہرگز نہ مداخلت ہوگی بلکہ اقتدار آسکے اس راج کے بیچ بدستور رہیگا • تیسری دفعہ • اسواسطے کہ صرف بیچ ہونے کے فساد سے دونو ریاست میں تعدیہ بکھیڑا پر یا تو خاص ان لوگوں کے ملک سے کمپنی انگریز بہادر کے اختیار میں آیا اور اوسکے بادشاہ کا دعوی ان لوگوں نے یا تو

- *জামে জাহান নুমা* প্রথম ছয়টি সংখ্যা তিন পাতার অর্থাৎ ছয় পৃষ্ঠার সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল যা প্রতি বুধবারে প্রকাশিত হতো।
- *জামে জাহান নুমা*-র প্রতিটি পৃষ্ঠা দুটি কলামে বিভিক্ত ছিল এবং প্রতিটি কলামে সাধারণত বাইশ (২২) লাইন সন্নিবেশিত থাকতো।
- কাগজটির আকার ছিল ২০×৩০/৮ সেন্টিমিটার। মূল্য ছিল মাসিক দুই (২) রুপি।
- *জামে জাহান নুমা*র প্রথম পৃষ্ঠার উপরের দুইপাশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মোহর ছাপা থাকতো। যা থেকে প্রতিয়মান হয় যে পত্রিকাটির পৃষ্ঠপোষক কোম্পানি ছিল।
- ২য় পর্যায়ে ফারসি সংখ্যার সাথে প্রকাশিত *জামে জাহান নুমা*র উর্দু এই চার পৃষ্ঠার পরিশিষ্টটি নিয়মিতভাবে ২৩শে মে, ১৮২৩ সাল থেকে ২৩শে জানুয়ারি, ১৮২৮ সাল পর্যন্ত চার বছর আট মাস ধরে মুদ্রিত হয়েছিল।
- এই সময়ের মধ্যে ২৪১টি সংখ্যা মুদ্রিত হয়েছিল, যার মধ্যে প্রথম ১৪১টি সংখ্যা সাধারণ এবং পরবর্তী ১০০টি সংখ্যা ঐতিহাসিক সিরিজ ছিল।
- ১লা মার্চ, ১৮২৬ সাল (১৪২ নং সংখ্যা) থেকে ঐতিহাসিক সিরিজ প্রকাশ করা শুরু করে।
- প্রথম ৮০টি সংখ্যা ছাড়া বাকি ১৬১টি সংখ্যা ন্যাশনাল আর্কাইভ অফ ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি, ভারতে সংরক্ষিত আছে যেখানে প্রায় ৫০০টি খবর প্রকাশিত হয়েছে।
- *জামে জাহান নুমা*তে অনেকটা জুড়ে সরকারি সংবাদ প্রাধান্যের সাথে প্রকাশ করা হতো।এই সংবাদপত্রটি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাদের সার্বক্ষণিক সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল।

- প্রকাশিত অধিকাংশ সংবাদ ছিল ইংরেজি সংবাদের এবং প্রবন্ধের উর্দু অনুবাদ। নতুন নতুন আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক খবরও বেশ গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করা হতো।
- এছাড়া পাঠকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য সামাজিক, ধর্মীয়, উন্নয়নমূলক ও সাংস্কৃতিক সংবাদ প্রকাশেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাঠকদের ভালভাবে বুঝার জন্য ছবি অর্ন্তভুক্ত করা হতো।
- *জামে জাহান নুমা*-র ভাষা ছিল সহজ ও প্রাঞ্জল যা সাধারণ মানুষের জন্য বোধগম্য ছিল।[১১]

জামে জাহান নুমা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পেছনের কারণ হিসেবে ক্রেতা ও পাঠকের সংকট দেখানো হয়। ২৩ শে জানুয়ারি, ১৮২৮ সালে এক ঘোষণার মাধ্যমে এ পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ করে দেয়া হয়।

জামে জাহান নুমা দিয়ে সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু হয় ১৮২২ সালে কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পরে। ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত ২৬টি সংবাদপত্রের মধ্যে ১৯টি সংবাদপত্র উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। বস্তুত উর্দু ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের পূর্বেই এই ভাষা সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচলিত ভাষা ছিল। ধীরে ধীরে ইংরেজদের নির্যাতনে জনগণের ভেতর বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে শুরু করে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে উর্দু সংবাদপত্রের ছিলো সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং শক্তিশালী পটভূমি হিসেবে কাজ করেছিল। কেবল দিল্লি থেকেই ১২০টি কলমে লিখিত সংবাদপত্র ডাকযোগে কোলকাতায় পাঠানো হতো। সে-সকল প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিলো ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা এবং দেশাত্মবোধের পাঠ। শহর ও জনপদে সুপরিচিত স্থানে সমবেত লোকদের কাছে সেগুলো পাঠ করা হতো। এই পাণ্ডুলিপি আকৃতির সংবাদপত্রগুলো জনগণের উপরে এতটাই গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল যে এমনকি লর্ড অকল্যান্ড এবং লর্ড কিং তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করে এই পাণ্ডুলিপিগুলো জনগণের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে সাহায্য করছে। ১৮৫৭ সালের পর উর্দু সংবাদপত্রে যুক্ত হয় নতুন একটি অধ্যায়, শুরু হয় উর্দু দৈনিক পত্রিকা।

উর্দু ভাষায় দৈনিক পত্রিকা

১৮২২ সালে *জামে জাহান নুমা* প্রকাশের মাধ্যমে উর্দু ভাষায় সাংবাদিকতার পথ চলা শুরু হয়। জামে জাহান নুমা একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। উর্দু ভাষায় দৈনিক পত্রিকা পদার্পণে সময় নিয়েছিলো আরো ছত্রিশ বছর। কোলকাতা শহর যেখানে উর্দু সাংবাদিকতার গোড়াপত্তন ঘটে; সেখান থেকে ১৮৫৮ সালে উর্দু ভাষায় প্রথম দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। *উর্দু গাইড* নামে উর্দু ভাষার প্রথম দৈনিক পত্রিকাটি মৌলভী কবির উদ্দিন আহমেদ বাহাদুর প্রকাশ করেছিলেন।[১২] এটি দুই পৃষ্ঠার একটি পত্রিকা ছিলো এবং টাইপে প্রকাশিত হতো। *আজিজ আল-বারী উর্দু গাইড*-এর সম্পাদক ছিলেন এবং মাজহার-উল-আজাইব প্রেস থেকে এটি ছাপা হতো।

মুন্সি নওল কিশোরের *আওয়াদ আখবার* পত্রিকাটি যা প্রথমে এটি সপ্তাহিক পত্রিকা ছিল পরবর্তী সময়ে ১৮৭১ সালে মুন্সি নওল কিশোর প্রথমে ত্রিদৈনিক এবং স্যার সৈয়দের পরামর্শ অনুযায়ী

১৮৭৪ সালে তা দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তর করে প্রকাশ করা শুরু করেন। এই *আওয়াদ আখবার* উদু ভাষায় প্রকাশিত দ্বিতীয় সংবাদপত্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

এর প্রায় একবছর পর ১লা জানুয়ারি, ১৮৭৫ সালে তৃতীয় উর্দু দৈনিক পত্রিকা *রোজ নামচা পাঞ্জাব* লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়। এটি লাহোর থেকে প্রকাশিত প্রথম উর্দু দৈনিক পত্রিকা ছিলো।

১৮৮৪ সালে সাইফুল হক আদিব দেহলুবীর সম্পাদনায় *শাম ও সাল* নামে একটি উর্দু দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দুটি ছোট পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত এই দৈনিক পত্রিকাটি প্রতি সন্ধ্যায় প্রকাশ করা হতো। *শাম ও সাল* পত্রিকাটি উর্দু ভাষার প্রথম সান্ধ্যকালীণ পত্রিকা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

কলকাতা থেকে *উর্দু গাইডের* পর মৌলভী গোলাম মাদানী ১৫ ডিসেম্বর, ১৮৮৩ সালে *আয়না নুমায়েশ* নামে এক পাতা বিশিষ্ট উর্দু দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন যার বিনিময় মূল্য মাসিক এক রূপি দুই আনা ছিলো। ২৬শে এপ্রিল ১৮৮৫ সালে সৈয়দ আব্দুর রহিমের সম্পাদনায় *পেক সবা* নামে আরো একটি উর্দু দৈনিক পত্রিকা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় যার মূল্য ছিলো মাসিক ছয় রূপি।

লাক্ষ্ণৌ থেকে *আওয়াদ আখবারের* পর ১৮৮২ সালে সৈয়দ আবদুল বাছিরের সম্পাদনায় *রোজ নামচা লাক্ষ্ণৌ*, মুন্সি মোহাম্মদ আলী খানের সম্পাদনায় ১৮৮৫ সালে *রোজানা* প্রকাশিত হয়।

এলাহবাদের প্রথম উর্দু দৈনিক পত্রিকা *কায়সার-উল-আখবার* ১৮৭৭ সালে সিরাজ উদ্দিন আহমেদ খান প্রকাশ করেন যা রবিবার ছাড়া প্রতিদিন প্রকাশিত হতো।

দক্ষিণ ভারতের উর্দু সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো হায়দারাবাদ ও মাদ্রাজ। মাদ্রাজের প্রথম উর্দু দৈনিক *ইত্তেহাদ* ১৮৮৫ সালে সম্রাট ও শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম প্রকশিত হয়।

হায়দারাবাদ দাক্ষিণাত্যের প্রথম উর্দু দৈনিক ছিলো *পয়েক আসিফি* যা মৌলভী সাইদ আহমেদ বুলগ্রামী ১৮৮৪ সালে প্রকাশ করেন। সৈয়দ আমজাদ আলীর সম্পাদনায় ১৮৮৮ সালে দৈনিক *সাফির দকন* প্রকাশিত হয়।[১৩]

উর্দু সাংবাদিকতার ক্রমবিকাশ

ক্রমান্বয়ে সর্ব ভারতে উর্দু সংবাদপত্রের বিকাশ ঘটতে থাকে যা পরবর্তী স্বাধীনতা আন্দোলনে, সাহিত্যে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ক্ষেত্রে উর্দু সংবাদপত্রের গভীর প্রভাব দেখা যায় এবং দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করে যায়। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে সময়ের উপর ভিত্তি করে উর্দু সাংবাদিতার পথ চলাকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে।

- প্রাথমিক যুগ (১৮২২-১৮৫৭)
- দ্বিতীয় যুগ (১৮৫৮-১৮৯৯)

- তৃতীয় যুগ (১৯০০-১৯৪৭)
- চতুর্থ যুগ (১৯৪৮-বর্তমান)

১. প্রাথমিক যুগ (১৮২২-১৮৫৭)

জামে জাহান নুমা দিয়ে সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু হয় ১৮২২ সালে কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পরে। উর্দু সাংবাদিকতার প্রথম যুগ ধরা হয় ১৮২২ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত। ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত ২৬টি সংবাদপত্রের মধ্যে ১৯টি সংবাদপত্র উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সেসময়ে উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলোর মধ্যে দিল্লি থেকে *দিল্লি উর্দু আখবার*, *সাদিকুল আখবার*, *সৈয়দ-উল-আখবার*, লাক্ষ্ণৌ থেকে *আহমেদি*, আগ্রা থেকে *সদর-আল-আখবার*, বানারস থেকে *গুলদস্তা*, ইন্দর থেকে *মালওয়া* প্রভৃতি। ১৮৫০ সালে বোম্বে থেকে *সালেহী* এবং পাঞ্জাব থেকে *কোহ-নূর* প্রকাশিত হয়। ১৮৫২ সালের পরে উর্দু সংবাদপত্রের প্রকাশ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। এগুলোর মধ্যে উল্ল্যেখযোগ্য *আখবার-উল-জাফর*, *আসাদুল আখবার*, *নূর মাশরিকি*, *আফতাব হিন্দ*, *ফতেহ-উল-আখবার* ইত্যাদি। বস্তুত উর্দু ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের পূর্বেই এই ভাষা সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচলিত ভাষা ছিল। ধীরে ধীরে ইংরেজদের নির্যাতনে জনগণের ভেতর বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে শুরু করে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে উর্দু সংবাদপত্রের ছিলো সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং শক্তিশালী পটভূমি হিসেবে কাজ করেছিল। মূলত বিদ্রোহের পূর্বে প্রকাশিত উর্দু সংবাদপত্রগুলো বার বার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই সংবাদপত্রগুলো বিদ্রোহী চেতনার যে বীজ বপন করে গিয়েছিল তা পরবর্তী সময়ে ও সক্রিয় ছিল।[১৪]

নিম্নে উর্দু সাংবাদিকতার বিকাশের ইতিহাসে এ যুগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রের বিস্তারিত বিবরণ পাঠকের সামনে তুলে ধরা হলো

দিল্লি উর্দু আখবার

دہلی اردو اخبار

قل فاعتبروا یا اولی الابصار

জামে জাহান নুমা প্রকাশের পর ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থান থেকে উর্দু ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ হতে থাকে। দিল্লি থেকে প্রকাশিত উর্দু ভাষার প্রথম পত্রিকা *দিল্লি উর্দু আখবার* এবং এই সংবাদপত্রটিকে উর্দু ভাষার প্রথম সম্পূর্ণ পত্রিকাও বলা হয়ে থাকে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে *দিল্লি উর্দু আখবার* গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮৩৬ সালে দিল্লি থেকে মৌলভী মুহাম্মদ বাকের *দিল্লি উর্দু আখবার* প্রকাশ করেন। মৌলভী বাকের ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ হুসাইন আজাদের পিতা। ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন

করেছে এই *দিল্লি উর্দু আখবার* পত্রিকাটি। পত্রিকাটি প্রকাশের সাল নিয়েও নানা মতামত রয়েছে। মর্গারেট বার্নস-এর মতে ১৮৩৮ সালে এই সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে। অপরপক্ষে আশফাক হোসেন কোরাইশির মতে এর প্রকাশের সাল ১৮৩৭। মৌলভী বাকেরের পুত্র মাওলানা মোহাম্মদ হোসাইন আজাদ লিখেছেন :

> 1835 سے دفاتر سرکاری بھی اردو ہونے شروع ہوئے - چند سال کے بعد کل دفتروں میں اردو زبان ہو گئی۔ اس شہر میں اخباروں کو آزادی حاصل ہوئی۔ 1836 ء میں اردو کا اخبار دہلی میں جاری ہوا اور یہ اس زبان کا پہلا اخبار تھا۔"
>
> (অনুবাদ: ১৮৩৫ সাল থেকে দফতরে উর্দু পৌছাঁতে শুরু করল। কিছুদিন পর উর্দু অফিস আদালতের ভাষা হয়ে গেল। এই শহরে সংবাদপত্র স্বাধীনতা পেলো। ১৮৩৬ সালে উর্দু *দিল্লি উর্দু আখবার* পত্রিকা দিল্লি থেকে প্রকাশ করা হয় এবং এটাই উর্দু ভাষায় প্রথম পত্রিকা ছিল।)[১৫]

দিল্লি উর্দু আখবার ছিল প্রথম পূর্ণ উর্দু সাপ্তাহিক সংবাদপত্র যার মাধ্যমে আমরা সেই সময়ের সমাজের প্রকৃত চিত্র দেখতে পাই। সংবাদপত্রটির বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্মরূপ:

- *দিল্লি উর্দু আখবার* পত্রিকাটির আকার ছিলো ২০"×৩০" সাইজ।
- পত্রিকাটির মাসিক বিনিময় মূল্য নির্ধারণ করা ছিলো ২ রুপি এবং বার্ষিক ২০ রুপি।
- পত্রিকাটির প্রথম নাম *আখবার দিল্লি* ছিলো পরবর্তী সময়ে ১০ই মে, ১৮৪০ (খণ্ড ৩, সংখ্যা ১৬৮) সালে তার নাম পরিবর্তন করে *দিল্লি উর্দু আখবার* রাখা হয়।
- নাম পরিবর্তনের সাথে সাথে পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলো ক্রমশ সাহসী হয়ে ওঠে।
- ১২ই জুলাই, ১৮৫৭ (খণ্ড ১৯, সংখ্যা ২৮) সালে বাদশাহ বাহদুর শাহ জাফরের নির্দেশে এর নাম পরিবর্তন করে *আখবার-উল-জাফর* করা হয়। পত্রিকার নম্বর ও ভলিয়ম *দিল্লি উর্দু আখবার*-এর ছিলো।
- ক্রমান্বয়ে পত্রিকাটি ব্রিটিশদের সরাসরি বিরোধিতা করতে শুরু করে এবং বাদশাহ বাহদুর শাহ জাফরকে সমর্থন করে লেখা প্রকাশ করতে থাকে।
- এই পত্রিকাটির রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়বস্তু ছাড়াও সাহিত্য অংশটি বেশ সমৃদ্ধ ছিল।
- এই পত্রিকাটিতে মির্যা গালিব, মোমিন, শিফতা, আযাদ, শেখ ইব্রাহিম জওক, বাহদুর শাহ জাফর, হাফিজ গোলাম রসূল, মির্যা মুহাম্মদ আলী বখত, মির্যা হায়দার শিকওয়ার মতো উর্দু সাহিত্যের খ্যাতিনামা কবি ও সাহিত্যিকগণ নিয়মিত লিখতেন এবং এর পাঠক ছিলেন। মির্যা গালিব এবং উস্তাদ জওকের খুনসুটির খবরও নিয়মিত প্রকাশিত হতো যা পাঠকদের আনন্দ দিতো।
- ১৮৫৭ সালে মৌলভী বাকেরের মৃত্যুর পর সংবাদপত্রটি বন্ধ হয়ে যায়।[১৬]

মূলত পত্রিকাটির রাজনৈতিক দিকটি ছিল খুব শক্তিশালী। মৌলভী বাকের ব্রিটিশদের দাসত্ব থেকে দেশকে স্বাধীন করার জন্য মরিয়া ছিলেন। বাহদুর শাহ জাফরের পতন তাকে খুব ক্ষুদ্ধ করে তুলেছিল। জুন ১৮৫৭ সালে তিনি লেখেন:

" آخر زمانے کے لوگوں کی ہمت کو بڑھاتے ہیں اور جرآت کو ترقی دیتے ہیں، اسی طرح یہ
معرکہ تمہارا بھی تواریخوں میں لکھا جائے گا اور صفحہ عالم پر کار رستمانہ تمھارا یاد رہے گا
کہ اس بہادری اور جوانمردی سے تم نے ایسے اولوالعزم اور متکبر سلطنت کے کر و غرور کو
توڑا اور ان کی نخوت و فرعونی اور عزم شدادی کویکسر خاک میں ملا دیا۔" ا

(অনুবাদ: যুগ মানুষের সাহস বাড়ায়, এমনভাবে আপনাদের নামও ইতিহাসে লেখা হবে এবং বিশ্ব দরবারে আপনাদের নাম প্রথম পৃষ্ঠায় যুক্ত থাকবে যে কি বীরত্বের এবং সাহসিকতার সাথে এমন বিশাল ও অহংকারী সাম্রাজ্যের অহংকার ভেঙে দিয়েছেন, ফেরাউনের সাম্রাজ্যের মতো এক নিমিষে ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছেন।)[১৭]

যখন দিল্লিতে ১১ই মে, ১৮৫৭ সালে সরাসরি বিদ্রোহ শুরু হয় সেসময়ে মৌলভী বাকের তার সাংবাদিকতা এবং কলমকে অস্ত্র বানিয়ে ঝাঁপিয়ে পরেন। বিদ্রোহের পরপর ১৭ই মে, ১৮৫৭ সালে *দিল্লি উর্দু আখবার* এর সম্পূর্ণ সংখ্যাটি তিনি বিদ্রোহের উপর উৎসর্গ করেছেন। যেখানে দিল্লি শহর, দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট, আনবালা মিরাট, সাহারানপুরের বিক্ষোভের খবর প্রকাশ করেন। এই সংখ্যায় বিদ্রোহের সূচনা এবং তার পরিণতির বর্ণনা করা হয়েছে। রিপোর্টিংয়ের শৈলী ছিল উদ্দেশ্যমূলক এবং প্রতিটি ঘটনার রেকর্ড রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। দিল্লি ও তার আশেপাশে চলা হত্যা তাণ্ডবের খবর তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন *দিল্ল উর্দু আখবার*রের মাধ্যমে। তিনি রিপোর্টারের নাম আড়ালে রেখে *রাকিম আখম* (راقم اخم) নামে একটি দীর্ঘ গল্প প্রকাশ করেন যা এই স্বধীনতা যুদ্ধের একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন। বিদ্রোহের সময় ব্যাক্তিগতভাবে অর্থ সংগ্রহের পাশাপাশি মৌলভী বাকের দেশ প্রেমিকদের সাহস যোগাতে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন আবেদন, নেতা ও বুজর্গদের স্বপ্ন, বাণী এবং শরিয়াহ বাণীও ক্রমাগত প্রকাশ করতে থাকেন। এবং মৌলভী বাকের বাদশাহ বাহদুর শাহ জাফরের সহযোগী হিসেবে সক্রিয় ছিল। অভ্যুত্থানের পরে *দিল্লি উর্দু আখবার* ২৪ শে মে, ১৮৫৭ সালের সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠায় তার পুত্র মুহাম্মদ হুসাইন তার বিখ্যাত কবিতা " تریخ انقلاب عبرت افزا" (বিপ্লবের শিক্ষণীয় ইতিহাস) ছাপা হয়। সেই বিখ্যাত কবিতা থেকে কয়েকটি চরণ:

"نیرنگ کے غور اس کے جو کیجئے تو عیاں ہے
ہر شعبدہ تازہ میں صد بازی عیار
ہاں دیدہ عبرت کو ذرا کھول تو غافل
ہیں بند یہاں اہلِ زبان کے لبِ گفتار
عبرت کے لئے خالق میں یہ سنحہ بس ہے
گرد یوے خدا عقلِ ستم و دل ہوشیار"

কবিতায় তিনি বলতে চেয়েছেন শাসক গোষ্ঠী কী করতে যাচ্ছে, কীভাবে নির্যাতন করছে, কী কৌশলে ভাষা ও জাতি সত্তার উপর লাগাম দিচ্ছে সেটা সবাইকে চোখ মেলে দেখতে বলেছেন এবং সাবধান হতে আহবান জানিয়েছেন।

১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনে *দিল্লি উর্দু আখবার*-এর ভূমিকা সম্পর্কে গুরুত্ব প্রদান করে উল্লেখ করেছেন যে দিল্লিতে যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন *দিল্লি উর্দু আখবার* তার সাংবাদিকতাকে স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করেছিল এবং এর প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী বাকের কেবল কলম দিয়ে যুদ্ধ করেননি বরং তিনি তরবারি দিয়েও ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। যেসময়ে বিদ্রোহ ব্যর্থ হয় এবং ইংরেজ সৈন্য দিল্লির সিংহাসন দখল করে সেসময়ে সংবাদপত্রটির সাথে সাথে মৌলভী বাকেরও ইংরেজদের গুলির লক্ষ্যবস্তু হলেন।

মৌলভী বাকেরের শাহাদত বরণ

মৌলভী বাকেরের নাতি আগা মুহাম্মদ বাকের পরিবারের বরাত দিয়ে নানার শাহাদাতের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। তার বর্ণনা অনুযায়ী মৌলভী বাকের ইংরেজ সৈন্যদের হাতে আটক হওয়ার পর তার পুত্র মুহাম্মদ হুসাইন আযাদ সরদার সেকান্দারের কাছে আসেন এবং সরদারের কাছে খুব অনুরোধ করেন যেন তাকে তার পিতাকে শেষবার দেখার সুযোগ করে দেয়। সরদার সেকান্দার মাওলানা আযাদকে অনেকভাবে বুঝানোর চেষ্টা করেন যে পরিস্থিতি অনেক খারাপ তার দিল্লিতে থাকা অনিরাপদ। কিন্তু মাওলানা আযাদ কিছুতেই মানলেন না। শেষ পর্যন্ত ছদ্মবেশে ঘোড়ায় চড়ে সরদারের পিছু চলতে থাকলেন। দিল্লি গেটের সামনে ভীড় দেখতে পেলেন। কড়া রোদে প্রহরীর পাহারায় একজন বয়োজ্যেষ্ঠকে তার শেষ সময় গুনতে এবং ইবাদতরত অবস্থায় দেখতে পান। আযাদ দিল্লি গেটের সামনে বাগানে ঘোড়া থেকে নেমে অপেক্ষা করতে থাকেন কখন পিতা পুত্রের চোখের মিলন হবে। মৌলভী সাহেব সালাম ফিরিয়ে সামনে তাকাতেই তার পুত্রকে দেখতে পান। তখন তার মুখে চিন্তার ছাপ এবং চোখ থেকে পানি পড়ছিল। একই অবস্থা পুত্রেরও ছিল। মৌলভী সাহেব মোনাজাতের জন্য হাত তুললেন এবং ইশারায় পুত্রকে চলে যেতে বললেন। এরপর সরদার সেকান্দার মাওলানা আযাদকে নিয়ে সেখান থেকে চলে আসেন। এটাই ছিল পিতা পুত্রের শেষ দেখা।

মৌলভী বাকেরকে গ্রেফতার করার পর কোন মামলা করা হয়নি কিংবা আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেয়া হয়নি। বরং স্বাধীনতা বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭ সালে ৭৭ বছর বয়সে নির্মমভাবে ইংরেজদের গুলিতে শহীদ হন এই বীর সাংবাদিক। দেশের স্বাধীনতার জন্য এত বড় আত্মত্যাগ করে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন উর্দু সাংবাদিক মৌলভী মুহাম্মদ বাকের।[১৮]

সৈয়দুল আখবার

১৮৩৭ সালে প্রকাশিত *সৈয়দুল আখবার* দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি ছিল *দিল্লি উর্দু আখাবার* এর পরে দিল্লি থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় সপ্তাহিক উর্দু পত্রিকা।

এই *সৈয়দুল আখবার* পত্রিকার সম্পাদকের নাম ছিল মৌলভী আবদুল গফুর। মূলত তিনি একজন আইনজীবী ছিলেন বিধায় এই পত্রিকাটি আইনজীবীদের কাছে জনপ্রিয়তা পায় এবং ব্যাপক সমাদৃত হয়। এই পত্রিকাটির প্রকৃত মালিকানা ছিল স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের ভাই সৈয়দ

মুহাম্মদ খানের। কিন্তু তিনি ছিলেন সরকারি চাকুরিজীবী। তাই সম্পাদকের দায়িত্বভার মৌলভী আব্দুল গফুরের উপর ন্যস্ত ছিল। সৈয়দ মুহাম্মদ এই পত্রিকায় নিয়মিত লেখতেন। ১৮৪৬ সালে সৈয়দ মুহাম্মদ খান মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর স্যার সৈয়দ আহমেদ খান এই পত্রিকাটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং এই পত্রিকাটির মাত্রা সু-উচ্চে পৌঁছে দেন। স্যার সৈয়দ আহমেদের মতামত ও প্রবন্ধ নিয়মিত এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হতো। এছাড়া সেসময়ের সাহিত্যচর্চা এবং উৎকর্ষে এই পত্রিকাটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মির্যা মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ খান গালিভের কাব্যগ্রন্থ দেওয়ানে গালিবের প্রথম সংস্করণ এই পত্রিকার প্রেস থেকেই প্রকাশ করা হয়েছিল। ১৮৫০ সালে নানা প্রতিকূলতার মুখে এই পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।[১৯]

কোহ-এ-নূর

প্রথম পর্যায়ে উর্দু ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর মধ্যে '*কোহ-এ-নূর*' অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক। মুন্সী প্রসেখ রায় ১৪ই মে, ১৮৫০ সাল থেকে এই পত্রিকাটি প্রকাশ করা শুরু করেন। এটি সেসময়ের বহুল প্রকাশিত পত্রিকা ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির খবরাখবর এখানে প্রকাশিত হতো বিধায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এর পৃষ্ঠপোষক ছিল। *কোহ্ নূর* প্রথমে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতো; পরবর্তী সময়ে ১৮৮৮ সালে তা দৈনিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটির সাথে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি জড়িত ছিলেন। উর্দু পত্রিকার ইতিহাসে *কোহ্ নূর* বেশ গুরুত্ব বহন করে। এই পত্রিকাটিতে স্থানীয় সংবাদের পাশাপাশি দেশবিদেশের খবর প্রচার করা হতো। রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, ধর্মীয়, সামাজিক এবং আইন সম্পর্কিত প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশ করা হতো। এছাড়া গজল, কৌতুক প্রভৃতির নমুনাও পাওয়া যায়। ১৯০৪ সালে এই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।[২০]

আজিমুল আখবার

মাদ্রাজ থেকে ১৮৪৮ সালে *আজিমুল আখবার* প্রকাশিত হয়। নবাব গোলাম গোছ খান বাহাদুরের উপাধি ছিল আজিম। এই উপাধি অনুসারে এই পত্রিকার নামকরণ করা হয় *আজিমুল আখবার*। পত্রিকার উপরের অংশে নবাব গোলাম গোছ খান বাহাদুরের দরবারের মোহরের চিহ্ন দেওয়া থাকত। ৮-১০ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই পত্রিকাটি ছিল মুসলমানদের শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের প্রতিচ্ছবি। মাসিক পত্রিকাটির মূল্য ছিল ১ (এক) রুপি এবং বার্ষিক পত্রিকার মূল্য নির্ধারণ ছিল ১০ রুপি।[২১]

সাদিকুল আখবার

দিল্লি উর্দু আখবারের পরে স্বাধীনতা আন্দোলনে যে সংবাদপত্রটি সক্রিয় ছিল তার নাম *সাদিকুল আখবার*। সৈয়দ জামিল উদ্দিন হাজর এর প্রকাশক ছিলেন। সৈযদ জামিল উদ্দিন হাজরের পিতা ছিলেন মীর ইসমাইল। তিনি কবি ছিলেন এবং হাজর তার কবিনাম ছিল। তার পূর্বপুরুষেরা শাহাবুদ্দিন ঘুরির শাসনামলে বাগদাদ থেকে এই উপমহাদেশে এসেছিলেন। জামিল উদ্দিন একজন সুদর্শন এবং সৎ চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তার ব্যাক্তিত্বের ঝলক তার কাজেও দেখা যায়। তিনি দিল্লিতে সরকারের আধিনস্থ্য কর্মকর্তা ছিলেন। পরবর্তী সময়ে চাকুরি থেকে ইস্তেফা দিয়ে এই সংবাদপত্রটি প্রকাশ করেন। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে বেশ প্রসিদ্ধ লাভ করে এ পত্রিকাটি। মূলত বেশি আলোচনায় আসে স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর ইংরেজ সরকার কর্তৃক বন্দি শাসক বাহদুর শাহ জাফরের উপর চলা মামলা-মুকাদ্দমার কারণে তা বেশ চর্চায় আসে। মামলার প্রসিকিউটররা *সাদিকুল আখবার*-এ প্রকাশিত খবরগুলোকে তাদের অবস্থানের প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করতেন।

সাদিকুল আখবার সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিলো। এই সংবাদপত্রের নিবন্ধগুলো সরকারের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ছিলো। এই পত্রিকাটি শহর এবং শহরের বাইরে সব মিলিয়ে প্রায় ২০০ কপি প্রকাশ করা হতো। লেথু প্রেস থেকে ছাপা হতো। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার কাছে এটি সমাদৃত ছিলো। এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো বেশ সমৃদ্ধ থাকতো এবং ইংরেজি সংবাদের লাইন যুক্ত করা হতো। মুসলমানদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ছিল এই *সাদিকুল আখবার*। এই পত্রিকায় অত্যান্ত গুরুত্বের সাথে আলেমদের সেই ফতোয়া প্রকাশ করেছিল যেখানে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের যুদ্ধকে জিহাদের বানী ঘোষণা করা হয়। ফতোয়ার সঙ্গে ৩৫ জন আলেমের নামও প্রকাশ করা হয়েছিল। [২২]

দিল্লি উর্দু আখবার এবং *সাদিকুর আখবার* পর্যালোচনা করে তাদের মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তা হলো, *দিল্লি উর্দু আখবার* সংবাদপত্রটি ব্রিটিশ সরকারের নৃশংসতা, ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ, আপত্তিকর আইন প্রণয়ন এবং খৃষ্টধর্ম প্রচারকে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান কারণ দেখিয়ে এসবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য প্রচারণা করেছে। অপরপক্ষে *সাদিকুল আখবার* এই রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণগুলো উপেক্ষা করে ব্রিটিশ সরকারের সরাসরি আক্রমণ করার পরিবর্তে মুজাহিদিনদের কাজগুলো তুলে ধরার দিকে মনোনিবেশ করেছিল।[২৩]

১৮৫৭ সালের আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর জামিল উদ্দিনকে গ্রেস্তার করা হয়। ইংরেজ সরকার তার বিরুদ্ধে মামলা করে এবং তাকে তিন বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কারাগার থেকে বের হয়ে তিনি পুনরায় সাংবাদিকতা পেশায় মনোনিবেশ করেন এবং মিরাট থেকে *লারন্স গেজেট* নামে আরো একটি সংবাদপত্র বের করেন।

পয়ামে আযাদি

স্বাধীনতা আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং হিন্দু-মুসলমানদের মাঝে ঐকমত্য সৃষ্টির লক্ষ্যে *পয়ামে আযাদি*-এর যাত্রা শুরু হয়। বাহাদুর শাহ জাফরের নাতি মির্যা বেদার বখতের তত্ত্বাবধানে তাঁর সেনাপ্রধান আজিম উল্লাহ খান পত্রিকাটি প্রকাশ করেন।

১৮৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এমনকি সেসময়ে বাহদুর শাহ জাফরের স্বাধীনতার ঘোষণাটি এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। সেসময়ে *লন্ডন টাইমজ* স্যার উইলিয়াম রাসেলকে উপমহাদেশের আন্দোলনের খবর সংগ্রহ করার জন্য নিযুক্ত করেছিল। *লন্ডন টাইমজ*-এর সম্পাদক জন ডালেনকে স্যার রাসেল লাক্ষ্ণৌ থেকে একটি চিঠি পাঠান যার সাথে বাহাদুর শাহ জাফরের স্বাধীনতার ঘোষণা সম্বলিত *পয়ামে আযাদি* সংবাদপত্রটির একটি কপি ছিল। ১৮৫৭ সালে *পয়ামে আযাদি*-এর মারাঠি সংস্করণ ঝাঁসি থেকে প্রকাশিত হয়। আজিমুল্লাহ খান এই পত্রিকাটি ইউরোপ থেকে প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এই সংবাদপত্রটির কপি সংরক্ষিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে এর কোন সংখ্যা অবশিষ্ট নেই।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টি করে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনকে বেগবান করার প্রচেষ্টায় *পয়ামে আযাদির* ভূমিকা ছিল অনেক। ব্রিটিশরা যখন দিল্লির নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করে; তখন খুজেঁ খুঁজে যে সকল ঘরে এই পত্রিকার কোনো সংখ্যা পেয়েছে তাদের ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। সবচেয়ে মর্মান্তিক পরিণতি ঘটে মির্যা বেদার বখতের। তাঁকে হত্যা করে শুকুরের চর্বি দিয়ে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছিল। [২৪]

পয়ামে আযাদির প্রথম সংখ্যায় আজিমুল্লাহ খানের যে কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল তা থেকেই এর উদ্দেশ্য স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। কবিতাটির অংশবিশেষ পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো:

"آیا فرنگی دور سے ایسا منتر مارا
لوٹا دونوں ہاتوں سے پیارا وطن ہمارا
آج شہیدوں نے تم کو اہل وطن للکارا
توڑوں غلامی کی زنجیریں، برساو انگار
ہندو مسلمان ، سکھ ہمارا بھائی، بھائی پیارا
یہ ہے آزادی کا جھنڈا اسے سلام ہمارا۔"

২. দ্বিতীয় যুগ (১৮৫৮-১৮৯৯)

সিপাহি বিদ্রোহের পর থেকে উর্দু সাংবাদিকতার দ্বিতীয় যুগ শুরু হয়। যার সময়কাল ১৮৫৮ থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত। বিদ্রোহের আগে প্রকাশিত প্রায় সব উর্দু পত্রিকা ১৮৫৭ সালের পর বন্ধ হয়ে যায়; কেবল লাহোর থেকে প্রকাশিত *কোহ-এ-নূর* পত্রিকা অনেক সময় পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। এসময়ে উর্দু ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঊনবিংশ

শতাব্দীর শেষ সময় পর্যন্ত যেসকল উর্দু পত্রিকা প্রকাশিত হয় সেগুলোর বিষয়বস্তুতে ভাষা ও সাহিত্য সংস্কার, শিক্ষার প্রচার ও প্রসার প্রাধান্য পায়। ১৮৫৭ সালের পর উর্দু সংবাদপত্রে যুক্ত হয় নতুন একটি অধ্যায়; শুরু হয় উর্দু দৈনিক পত্রিকা। কোলকাতা থেকে প্রকাশিত *উর্দু গাইড* প্রথম উর্দু দৈনিক পত্রিকা ছিল। স্যার সৈয়দের *তাহজিবুল আখলাক*, মুন্সি নওল কিশোরের *আওয়াদ আখবার*, মুন্সি সাজ্জাদ হোসেনের *আওয়াদ পাঞ্চ* এ সময়ের উল্লেখযোগ্য উর্দু পত্রিকা ছিলো যা উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে ব্যাপক অবদান রেখেছে। এছাড়াও *শামসুল আখবার*, *তাসলিম হায়রাত*, *মাদ্রাজ পাঞ্জ*, *হিন্দুস্তান*, *আখবারে আলম*, *কানপুর গেজেট*, *রিয়াজ-আল-আখবার*, *আলীগড় সাইন্টিফিক গেজেট*, *তোতীনামা*, *ইত্তিহাদ*, *মাখবির সাদিক*, *পেশওয়ার*, *শামসির কলম* ইত্যাদি উর্দু সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল।[২৫]

এই সময়ে প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকা সমাজ, রাজনীতি, উর্দু সাহিত্য ও ভাষার উৎকর্ষতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তার বিবরণ উপস্থাপন করা হলো।

আওয়াদ আখবার

১৮৫৮ সালে লাক্ষ্ণৌ থেকে *আওয়াদ আখবার* পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। মুন্সি নওল কিশোর এই পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন। প্রথমে এটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। ১৮৭১ সালে এটি ত্রিদৈনিক এবং পরবর্তী সময়ে স্যার সৈয়দের পরামর্শ অনুযায়ী ১৮৭৪ সাল থেকে দৈনিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে শুরু করে।

اودھ اخبار
1st January, 1875.

আওয়াদ আখবার প্রথমদিকে দশ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হতো, পরবর্তী সময়ে তা বিশ থেকে চল্লিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। পণ্ডিত রতন নাথ সরশারের বিখ্যাত রচনা *ফাসানায়ে আযাদ* ধারাবাহিকভাবে আওয়াদ আখবার পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। যার দরুন পত্রিকাটি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং সুধী মহলে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

আওয়াদ আখবার সব দিক থেকে একটি পরিপূর্ণ পত্রিকা ছিল। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবর, ছবি, প্রবন্ধ এ-পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। টেলিগ্রাফের মাধ্যমে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর, ইংরেজি পত্রিকার প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ খবর এতে অনুবাদ করে প্রকাশ করা হতো। সম্পাদকীয় অংশ ছাড়াও রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংবাদ এবং সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে রচিত প্রবন্ধ এ-পত্রিকায় প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেত। এই পত্রিকাটি কোনো রকম রাজনৈতিক দলাদলির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না বরং সব ধরনের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত। এই পত্রিকাটির সার্বিক উন্নয়নে সম্পাদক মুন্সি গোলাম খান তাপস সব সময় কাজ করেছেন এবং তার মৃত্যুর পর পণ্ডিত রতন নাথ সরশার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এই পত্রিকাটি উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের সামাজিক সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ও নথি হিসেবে কাজ করেছে।[২৬]

আওয়াদ পাঞ্চ

আওয়াদ পাঞ্চ উর্দু পত্রিকার জগতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। পত্রিকাটি ত্রিশ থেকে পয়ত্রিশ বছর ধরে তার স্বকীয়তা বজায় রেখে উর্দু সংবাদপত্রের জগতে রাজত্ব করেছে। উর্দু সংবাদপত্র শুরুর প্রায় চল্লিশ বছর পর উর্দু সাংবাদিকতায় নতুন রূপ নিয়ে আসে এই পত্রিকাটি। এই পত্রিকাটি লন্ডনের *লন্ডন পাঞ্চ*-এর আদলে উর্দু কমেডি (ব্যঙ্গাত্মক) ধরনের সাময়িকী ছিল। এটি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। মুন্সি সাজ্জাদ হোসেন ১৯শে জানুয়ারি, ১৮৮৮ সালে এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেন।

পত্রিকাটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো রাজনীতিকে হাস্যরসের ছলে উপস্থাপন করা হতো। মির্যা মুহাম্মদ মর্তুযা ওরফে মাছু বেগ আশিক যার ছদ্ম নাম সিতম যারিফ, তিনি দীর্ঘ ৩২ বছর ধারাবাহিকভাবে এই পত্রিকায় হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধ লিখেছেন। নবাব সৈয়দ মুহাম্মদ আযাদ, আকবর এলাহীবাদী, পণ্ডিত তরভূন নাথ, মুন্সি জোয়ালা প্রসাদ বরাক, মুন্সি আহমেদ আলী শোক, মুন্সি আহমেদ আলী কাসমন্ডীর মতো বিজ্ঞ, খ্যাতনামা লেখকগণ সম্পাদকীয় পাতায় লেখার সাথে যুক্ত ছিলেন।

পত্রিকাটি ছিল হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বাহক, কংগ্রেসের সমর্থক, পশ্চিমা সভ্যতার বিরোধী এবং প্রাচ্য মূল্যবোধের সমর্থক। ব্যঙ্গ, হাস্যরসাত্মক কার্টুন এবং কবিতা গুরুত্বের সঙ্গে এখানে প্রকাশিত হতো। *আওয়াদ পাঞ্চ* দীর্ঘ ৩৬ বছর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর মুন্সি সাজ্জাদ হোসেনের জীবনকালেই ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯১২ সালে বন্ধ হয়ে যায়। দুই বছর পর হাকিম মমতাজ হুসেন উসমানী পত্রিকাটি পুনরায় প্রকাশ করেন। পুনরায় প্রকাশের পর আওয়াদ পাঞ্চ আগের মতো জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে না পারলেও হাকিম সাহেবের প্রচেষ্টায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৩৩ সালে হাকিম সাহেবের মৃত্যুর পর তার ছেলে আওয়াদ পাঞ্চ পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্বভার নেন। কিন্তু স্বল্পকাল ব্যবধানে তার আকস্মিক মৃত্যু ঘটে।

পত্রিকাটিতে শুরুর দিকে কেবল হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে সূক্ষ্ম ও মার্জিত ভঙ্গিতে সমালোচনা করা হতো। পরবর্তী সময়ে তা বেশ আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। পত্রিকাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই ধাঁচে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠার উপরে একটি স্কেচ আঁকা থাকতো যেখানে পত্রিকার নাম, ভলিয়ুম, সংখ্যা, প্রকাশকের নাম, মূল্য ইত্যাদি দেয়া থাকতো। লেখকরা তাদের আসল নামের পাশে ছদ্ম নাম ব্যবহার করতেন, তাই অনেক লেখকের পরিচয় অজ্ঞাত রয়ে গেছে। *আওয়াদ পাঞ্চের* লেখকেরা শুরু থেকেই স্যার সৈয়দ এবং তার আন্দোলনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাদের

লেখা গদ্য, কবিতা, প্রবন্ধে কিংবা কার্টুনে এই বিরোধিতা স্পষ্ট প্রকাশ পেতো। পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে এই তথ্য স্পষ্টতর হয় যে, *আওয়াদ পাঞ্চ*-এর অন্যতম মিশন ছিল স্যার সৈয়দ ও তার আন্দোলনের বিরোধিতা করা। স্যার সৈয়দের সহযোগীরাও এই বিরোধিতার লক্ষ্যবস্তু হতেন এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম আক্রমণের শিকার হতেন। আকবর এলাহীবাদী ছিলেন এই দলের অগ্রভাগে।

- *আওয়াদ পাঞ্চের* প্রথম লক্ষ্য ছিলো *ফাসানায়ে আযাদের* বিরোধিতা। *ফাসানায়ে আযাদ* নিয়ে *আওয়াদ পাঞ্চ*-এর আপত্তি ছিলো সেখানে মহিলাদের জন্য যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা নিয়ে। *আওয়াদ* পাঞ্চ'-এর লেখকেরা মনে করতেন সেই ভাষা ছিল মুঘলদের ভাষা। এই আপত্তি নিয়ে *আওয়াদ পাঞ্চ*-এ দুটি সংখ্যায় ক্রমাগত ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণ চলতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই আপত্তির পেছনে কিছুটা সত্যতা থাকলেও মূল উদ্দেশ্য ছিল কৌতুকের ছলে আক্রমণ করার সুযোগ তৈরি করা।
- *আওয়াদ পাঞ্চের* দ্বিতীয় আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছিল মাওলানা হালীকে। বিপত্তি ঘটে তখন যখন হালীর *দেওয়ানে মুকাদ্দমা* গ্রন্থে কবিতার প্রকৃত সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করা হয়। হালীর দেওয়ানের বিরুদ্ধে আওয়াদ পাঞ্চের দুটি অভিযোগ ছিল। প্রথম আপত্তি ছিল কবি আলতাফ হোসাইন হালী কবিতার সংজ্ঞায় যে অর্থ বুঝিয়েছেন তা তাদের কাছে একেবারেই ভুল ছিল। তাদের মতে হালী কবিতা বলতে কেবল ছন্দকে বুঝিয়েছেন যেখানে কবির ও কবিতার সহজাত স্বভাবকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। দ্বিতীয় অভিযোগ ছিলো হালী তার গ্রন্থে প্রকৃতিবিরুদ্ধ যে কবিতাগুলো উদাহরণ হিসেবে দেখিয়েছেন তার অধিকাংশ লাক্ষ্ণৌ কবিদের কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এই গ্রন্থের প্রতিটি লাইনের জবাব দিয়ে এই বিতর্ক বেশ অনেকদিন চলতে থাকে। কিন্তু বিষয়বস্তু বিবেচনা করলে এটি অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে *আওয়াদ পাঞ্চের* লেখকের অভিযোগ ভিত্তিহীন ছিলো না।
- তৃতীয় আক্রমণ করা হয় কবি দাগ দেহলভিকে। *আওয়াদ পাঞ্চ* কখনোই দাগের কাব্যিক মাহাত্ম্যকে স্বীকার করেনি। সেসময়ে লাক্ষ্ণৌ এবং দিল্লি এ দুটি চিন্তাধারার কবিদের মধ্যে কবিতার বিষয়বস্ত এবং লেখার পদ্ধতি নিয়ে বেশ দ্বন্দ্ব বিরাজমান ছিল। কবি দাগ ছিলেন দিল্লির স্কুলের চিন্তাধারার বাহক। যেহেতু *আওয়াদ পাঞ্চের* লেখকরা ছিলেন লাক্ষ্ণৌর ভাবধারার অনুসারী সুতরাং কবি দাগ তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্ত হন। দ্বিতীয়ত দাগের ছাত্ররা তাদের রচিত সব ব্যঙ্গ কবিতাগুলোকে লাক্ষ্ণৌর জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিল। ছাত্রদের এমন কর্মের দরুন জন্য শিক্ষককে উপহাসের স্বীকার হতে হয়েছে। এই আক্রমণ দাগের কবিতা ছাড়িয়ে তার চরিত্র ও বংশ পর্যন্ত এসে পৌঁছে গিয়েছিল। এতে দাগের সুনামে কোনো পার্থক্য না আনলেও অনেকটা সময় এ কবিকে কৌতুক এবং হাসির খেরাক হয়েছিল।
- ভাষা ও কবিতার সংস্কার ছাড়াও রাজনীতি বিষয়ে *আওয়াদ পাঞ্চের* গভীর দূরদৃষ্টি ছিল। প্রথম থেকেই এটি কংগ্রেসের সমর্থক ছিল। আয়কর, অ্যালবার্ট বিল ইত্যাদির উপর পত্রিকায় অনেক

নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল। রাজ্যের গভর্নরের চাটুকারিতা থেকে সর্বদা এটি নিজেকে মুক্ত রাখতো। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বাহক ছিলো পত্রিকাটি।

মূলত *আওয়াদ পাঞ্চের* বিষয়বস্তু ছিল ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি উপহাস এবং প্রাচ্য সভ্যতার প্রতি অবিরাম সমর্থন।[২৭]

আখবার সাইন্টিফিক সোসাইটি

'সাইন্টিফিক সোসাইটি' একটি প্রতিষ্ঠান যা স্যার সৈয়দ আহমেদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যুগোপযোপী ও উন্নতমানের আধুনিক জ্ঞান বিকাশের উদ্দেশ্য নিয়ে ৯ই জানুয়ারি, ১৮৬৪ সালে প্রথমে গাজিপুরে তিনি এর প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে তা আলীগড়ে স্থানান্তর করেন। *সাইন্টিফিক সোসাইটি*র উদ্যেগে ৩রা মার্চ, ১৮৬৬ সালে আলীগড় থেকে *আখবার সাইন্টিফিক সোসাইটি* প্রকাশিত হয়; যা আলীগড় ইনিস্টিটিউড গেজেট নামেও পরিচিত ছিল।

- প্রথমে এটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল, পরবর্তীতে তা ত্রিদৈনিক পত্রিকায় পরিবর্তন করা হয়। স্যার সৈয়দের মৃত্যুর পরও এটি প্রকাশিত হয়েছে।
- সংবাদপত্রটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো-এতে পাশাপাশি দুটো কলামে উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় প্রবন্ধ প্রকাশ করা হতো।
- এটি একটি রাজনৈতিক, শিক্ষণীয় এবং সামাজিক পত্রিকা ছিল যার উদ্দেশ্য ছিলো ইংরেজ সরকার ও জনগণের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি করা।
- দ্বিভাষিক হওয়ার দরুন ইংরেজরাও আগ্রহের সাথে এটি অধ্যয়ন করতো। সেসময়ে সংবাদপত্র লিথো ফন্টে ছাপা হতো। স্যার সৈয়দ *আখবার সাইন্টিফিক সোসাইটির* জন্য মোটা এবং উজ্জ্বল টাইপ ফন্ট ব্যবহার করেছিলেন যা উর্দু সাংবাদিকতার জন্য একটি নতুন উদ্ভাবন ছিল।
- এর লে-আউটেও সরলতা ও পরিশীলতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।
- এখানে জাতীয়, আন্তর্জাতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সব ধরনের সংবাদ প্রকাশিত হতো কিন্তু স্যার সৈয়দের মূল আগ্রহের বিষয় ছিল শিক্ষা তাই শিক্ষামূলক সংবাদ পরিবেশনে গুরুত্ব দেয়া হতো।

এই সংবাদপত্রটি উর্দু সংবাদিকতায় গুণগত পরিবর্তন এনেছিল। সংবাদ লেখার কৌশল, প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় বিষয় নির্বাচন, সংবাদপত্রের ভাষা, বস্তুনিষ্ঠতা, দায়িত্ববোধ, সংবাদ পরিবেশনে মতের স্বাধীনতা এবং পরমত সহিষ্ণুতার এক উজ্জল নিদর্শন এই '*আখবার সাইন্টিফিক সোসাইটি*' পত্রিকাটি।[২৮]

তাহজিবুল আখলাক

উর্দু সাংবাদিকতায় স্যার সৈয়দের আরেকটি মাইলফলক ছিল *তাহজিবুল আখলাক*। স্যার সৈয়দ যে কতো বড় মাপের সাংবাদিক ছিলেন এই সংবাদপত্রটি তার অনন্য উদাহরণ। ২৪শে ডিসেম্বর ১৮৭০ সালে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির ইংরেজি নাম ছিলো *The Mohamadan in Social Reformer*। সংবাদপত্রটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো

- পত্রিকাটি উচ্চ মানের কাগজে নাসেখ টাইপে প্রকাশিত হতো।
- পৃষ্ঠার সংখ্যা আট থেকে বারো ছিল।
- প্রতিটি পৃষ্ঠায় দুটি কলামের সন্নিবেশ থাকতো।
- এর প্রতি সংখ্যার মূল্য চার আনা ছিল।
- এটি প্রতি মাসে তিনবার প্রকাশ করা হতো এবং ধারাবাহিকভাবে ছয় বছর সাত মাস প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রসঙ্গত এই সংবাদপত্র মুসলমানদের ধ্যান ধারণায় ব্যাপক পরিবর্তন আনে। মুসলমানদের সেকেলে ধারণা, কুসংস্কার, আচার অনুষ্ঠানের অন্ধ অনুকরণ বন্ধ করে জ্ঞান অর্জনে কঠোর পরিশ্রমের জন্য পত্রিকাটিতে পরামর্শ দিয়া হতো। এভাবে স্যার সৈয়দ সংবাদপত্রকে কেবল সংবাদের উৎস নয় বরং সমাজ সংস্কারের মাধ্যমও বানিয়েছিলেন।[২৯]

৩. তৃতীয় যুগ (১৯০০-১৯৪৭)

১৯০০ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল ছিল উর্দু সাংবাদিকতার তৃতীয় যুগ। এ সময়কে উর্দু সাংবাদিকতার স্বর্ণ যুগ বলা হয়ে থাকে। এসময়ে উপমহাদেশের রাজনীতিতে স্বাধীনতার বাতাস বইতে শুরু করে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কংগ্রেস ভারতবর্ষের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। কংগ্রেসের রাজনীতির বিরোধীতায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলা ভাগের পরিকল্পনা, এশিয়া এবং আফ্রিকায় পশ্চিমা শাসকদের রাজত্ব বিস্তার, কানপুর মসজিদের ট্র্যাজেডি, তুর্কি সাম্রাজ্যের পতনের পূর্বাভাস, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি ঘটনাগুলো জমা হয়ে ধীরে ধীরে অসহযোগ আন্দোলনের দিকে মোড় নেয়। এই সময়ে উর্দু সংবাদপত্রের প্রকাশ কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

১৯০৩ সালে আলীগড় থেকে *ইনকিলাব জিন্দাবাদ* স্লোগানের প্রবক্তা মাওলানা হাসরত মুহানী *উর্দুয়ে-মুয়াল্লা* প্রকাশ করেন। সে সময়ে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ *লিসানুল সাদিক* প্রকাশ করে সাংবাদিকতার জগতে পা রাখেন। সে সময়ে সংবাদপত্রে বিপ্লবের প্রাধান্য ছিলো। মাওলানা আযাদের সাপ্তাহিক *আল হেলাল* ও *আল-বালাগ* ভারত স্বাধীনতা আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে সোচ্চার ছিল। লাহোর থেকে প্রকাশিত মাওলানা জাফর আলী খানের দৈনিক *জমিদার* পত্রিকাটি সে সময়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। মাওলানা মোহম্মদ আলী জওহার *হামদরদ* পত্রিকা প্রকাশ করেন, যা সে সময়ে জনপ্রিয়তার দিক থেকে যার অবস্থান ছিল *জমিদারের* পরে। সে সময়ে *জমিদার* পত্রিকাটি স্বাধীনতা আন্দোলন এবং কংগ্রেসের সমর্থনে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছে। এই পত্রিকাগুলো ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশাত্মবোধ ও বিপ্লবের চেতনা জাগ্রত করতে ভূমিকা পালন করেছে।

এছাড়াও লাহোর থেকে প্রকাশিত প্রতাপ, মিলাপ, ইনকিলাব এবং পেয়সা উর্দু সাংবাদপত্রের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ দলিল ছিলো।

মাওলানা মোহাম্মদ আলীর বড় ভাই মাওলানা শওকত আলী বম্বে থেকে *খেলাফত* প্রকাশ করেন। কালের বিবতর্নে এমন কিছু মানুষ এসে দাঁড়ায় যারা কোন কিছুতেই মাথা নত করে না। এমন একজন উর্দু সাংবাদিক ছিলেন সৈয়দ হাবিব যিনি সৈনিকের চাকরি ছেড়ে সাংবাদিতায় প্রবেশ করেন। প্রকাশ করেন *সিয়াসাত* সংবাদপত্র। শুরুতেই তিনি ইংরেজ শাসকের রোষানলে পরেন। এমন আরেকজন উর্দু সাংবাদিক মাওলানা আবদুর রজ্জাক মালিহাবাদী যিনি মাওলানা আযাদের সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিলেন। মাওলানা আযাদ যখন সাংবাদিকতার ময়দান ছেড়ে সরাসরি রাজনীতিতে ব্যস্ত হয়ে পরেন সে সময়ে মাওলানা আবদুর রজ্জাক মালিহাবাদী *হিন্দ* নামে দৈনিক পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি সাপ্তাহিক *উজালা* প্রকাশ করেন এবং দৈনিক *আযাদ হিন্দ* আবার চালু করেন। যা অদ্যাবদি প্রকাশ হয়ে আসছে।

বোম্বে থেকে মইন উদ্দিন হাসারাত জামি উর্দু সংবাদপত্র *আজমল* প্রকাশ করেছিলেন যা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর বন্ধ হয়ে যায় এবং পত্রিকাটি শেষ সংখ্যা পর্যন্ত দেশ প্রেমিকের প্রমাণ রেখেছে। হাফিজ আলী বাহাদুর খান বোম্বে থেকে *হেলাল* প্রকাশ করেন যা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে প্রকাশিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উর্দু সংবাদপত্র *কওমি আযাদ* যা বহুকাল লাক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশের পর দিল্লি এবং পাটনা থেকে বর্তমানে প্রকাশিত হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে অনেক উর্দু সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে। যার মধ্যে দিল্লি থেকে প্রকাশিত *জাং* অন্যতম। এই পত্রিকাটি এখনো প্রকাশিত ধারাবাহিকভাবে হচ্ছে। সে সময়ে বোম্বে থেকে *ইনকিলাব*, *হিন্দুস্থান*,*আফতাব*, *জামহুরিয়াত* এবং ইকবাল প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে *ইনকিলাব* বর্তমান সময়ে প্রকাশ করা হচ্ছে এবং বেশ উন্নতি লাভ করেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের দিনগুলোতে বেশ কয়েকটি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। যার মধ্যে দিয়া নারায়ণের *যামানা*, সাগর নিজামির *এশিয়া*, আনিসুর রহমানের *নয়ে দুনিয়া*, জোশ মালিহ আবাদির *কলিম*, ইবনে হুসাইন এর *আয়না*, এবং দেওয়ান সিংয়ের *রিয়াসাত* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ছিলো। স্বাধীনতার পূর্বে উর্দু সংবাদপত্রের সংখ্যা প্রায় শতাধিক ছিলো।[৩০]

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখা কয়েকটি খ্যাতিনামা উর্দু পত্রিকার বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

উর্দুয়ে মুয়াল্লা

*উর্দুয়ে মুয়াল্লা*র মালিক ছিলেন বিখ্যাত কবি, রাজনীতিবিদ হাসরাত মুহানী। ১৯০৩ সালে তিনি আলীগড় থেকে এই পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। হাসরাত মুহানী স্যার সৈয়দ আহমেদের ইংরেজ প্রীতির বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা মানুষ। এই পত্রিকায় শিক্ষা ও সাহিত্যের পাশাপাশি রাজনৈতিক বিষয়াদি গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হতো। উর্দু-য়ে-মুয়াল্লা রাজনীতিতে বেশ সাড়া ফেলেছিল। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লেখার দরুণ তাকে কয়েকবার কারাবরণ করতে হয়েছে, যা তার স্বাধীনচেতা মনোভাবকে দৃঢ় করেছে। এই সংবাদপত্রের মাধ্যমে

অর্থ উপার্জন তার জন্য কখনো মুখ্য ছিল না বরং এটি দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের কণ্ঠ হওয়ার প্রচেষ্টা করেছিল।[৩১]

জমিনদার

মাওলানা জাফর আলী খানের পিতা মাওলানা সিরাজ উদ্দিন আহমেদ জমিদার এবং কৃষকদের কল্যাণে ১৯০৩ সালে সাপ্তাহিক পত্রিকা *জমিনদার* প্রকাশ করেন। কিছুদিন পর তিনি নিজ গ্রাম করামাবাদ, জেলা গুজরানওয়ালাতে চলে আসেন। এবং সংবাদপত্রটির অফিস সেখানে নিয়ে আসেন। সেই সময়ে পত্রিকাটির প্রচার-সংখ্যা ছিল মতো।

১৯০৯ সালে মাওলানা জাফর আলী পত্রিকাটির দায়িত্ব গ্রহণ করে এর উদ্দেশ্যই পরিবর্তন করে ফেলেন। ত্রিপলীর যুদ্ধ শুরু হলে মাওলানা জাফর আলী পত্রিকাটিকে দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তর করেন এবং যুদ্ধের খবরাখবর বেশ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করতেন। মাওলানা জাফর ছিলেন বাগ্মী, পণ্ডিত ও কবি। তার প্রবন্ধ ও কবিতা শাসক শ্রেণির মধ্যে সর্বত্র ত্রাসের সঞ্চারে করেছিল। গ্রাম-শহর সর্বত্রই এই পত্রিকার চাহিদা ছিল।

জমিনদার পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে ক্ষুব্ধ হয়ে সরকার ১৯১২ সালের মার্চ মাসে দুই হাজার টাকা জরিমানা করে। ১৯১২ সালে কানপুরে সংঘটিত একটি খবর দুঃসাহসিকভাবে প্রকাশ করার দরুন তাকে আবার দুই হাজার রুপি জরিমানা করে দশ হাজার রুপি আদায় করে সরকার। জরিমানার অর্থ অনুদান ও চাঁদা উঠিয়ে সংগ্রহ করে পরিশোধ করা হয়। একই সালে তিনি লন্ডন যান এবং সেখান থেকে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখে পাঠান যা জমিনদার পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। এবং সেই প্রবন্ধ প্রকাশের দায়ে আবার জরিমানা করা হয় এবং প্রেস জব্দ করে নেয়া হয়। সবশেষে যুদ্ধের খবর প্রচার করার দায়ে সংবাদপত্রটি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা হয়।[৩২]

হামদরদ

মাওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৩ সালে হামদরদ পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি এমন একটা সময়ে হামদর্দ প্রকাশ করেন যখন উপমহাদেশে জমিনদার পত্রিকার রাজত্ব ছিল। মাওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর *কমরেড* নামে আরো একটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করতেন যা এতোটা সমৃদ্ধ ছিল যে ইংরেজ ভাইসরয় এর পাঠক ছিলেন। মাওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর কামরেড পত্রিকার পদ্ধতি হামদরদ অবলম্বন করেন।

টাইপের অসহজলভ্যতার কারণে পত্রিকাটি প্রথমদিকে কখনো এক পৃষ্ঠা কখনো দুই পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা হতো। প্রথমদিকে পত্রিকাটির নাম *নাকিব হামদর্দ* রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে ১লা জুন ১৯১৩ সাল থেকে ১৬ পৃষ্ঠা সংকলিত পত্রিকাটির প্রকাশ শুরু হয়। তখন দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তর করা হয়। তিনি তরতাজা খবর সংগ্রহ করার জন্য রয়টার, এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়ার সাহায্য নিতেন।

মাওলানা মোহাম্মদ আলী জওহরের জীবন রাজনীতি ও সাংবাদিকতা কওে কেটেছে। তিনি পশ্চিমা জাতির আধিপত্য থেকে ইসলামকে মুক্ত করার জন্য ভারতে সংগ্রাম শুরু করেন। খেলাফাত আন্দোলনে তিনি মুসলমানদের সাথে হিন্দু ও শিখদেরকেও অংশীদার করেন। সরকারের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রচারের কারণে তাঁকে বেশ কয়েকবার জরিমানা দিতে হয়েছিল যার ফলে পত্রিকার অর্থনৈতিক লোকসানে চলছিল অবশেষে ১২শে এপ্রিল, ১৯২৯ সালে এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।[৩৩]

আল হেলাল ও আল-বালাগ

আল হেলাল কেবল একটি সংবাদপত্র নয় উর্দু সাংবাদিকতার জগতে একটি নতুন দর্পণ ছিল। উর্দু সাংবাদিকতার ইতিহাসে এটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ দস্তাবেজ। এই সংবাদপত্রটি সংবাদপত্রকে যেমন

নতুন মাত্রায় নিয়ে গিয়েছে তেমনি জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক অবদান রেখেছে। ১৩ই জুলাই ১৯১২ সালে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ আল-হেলাল কোলকাতা থেকে প্রকাশ করেছেন। উর্দু সাংবাদিকতাকে দিকনির্দেশনা, গতি ও গুণগত উন্নয়নে যারা কাজ করেছেন মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তাদের মধ্যে অন্যতম। *আল-হেলালের* পূর্বে তিনি বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তিনি সে পত্রিকাগুলো থেকে ভিন্নতর কিছু প্রকাশ করার স্বপ্ন দেখতেন; আল-হেলাল ছিল যার বাস্তবিক রূপ। মাওলানা আযাদের সংবাদপত্রগুলো পর্যালোচনা করলে তার সাংবাদিকতাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১. *আল-হেলালের* আগ পর্যন্ত তাঁর সাংবাদিকতা ছিল সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু নির্ভর;
২. দ্বিতীয়টি ছিলো আল হেলালের যুগ ছিল রাজনৈতিক বিষয়বস্তু সংবলিত; এবং
৩. তৃতীয়টি ছিল *আল-বালাগের* যুগ যা ধর্মীয় ও সংস্কারমূলক। তিনটি পর্যায়ে তিনি যা লিখেছেন তা ছিল তার ব্যক্তিত্ব, চিন্তাধারা, প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ।

আল-হেলাল একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। ১৩ই জুলাই ১৯১২ থেকে ১৮ই নভেম্বর ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এটি প্রকাশিত হয়। একবছর পর ১২ই নভেম্বর ১৯১৫ সালে '*আল-বালাগ*' নামে প্রকাশিত হয় যা ১৩ই মার্চ ১৯১৬ সাল পর্যন্ত জারি থাকে। এগারো বছর পর ১০ই জুন ১৯২৭ সালে *আল হেলাল* পুনরায় প্রকাশিত হয় এবং সেই বছরেই ৯ই ডিসেম্বর ১৯২৭ সালে তা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।

- তিনি তার নিজস্ব ধারণার পরিবর্তে সংবাদ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে রেফারেন্সের উপর জোর দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস করতেন; অর্থাৎ আল-হেলালের সংবাদ উপস্থাপনের কৌশল ছিল বস্তুনিষ্ঠ ও রেফারেন্স ভিত্তিক।
- সংবাদপত্রটির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল-মাওলানা আযাদ কেবল খবর ও নিবন্ধ বাছাই করার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং তা ঠিকভাবে প্রকাশের জন্য গুরুত্ব আরোপ করতেন।
- এখানে রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, সাহিত্যিক প্রভৃতি বিষয়ের উপর সংবাদ পরিবেশিত হতো।
- আল-বালাগ ছিল একটি ধর্মীয় প্রচারের অঙ্গ যা মুসলমানদের প্রয়োজনে প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে কুরআন ও হাদিসের অকাট্য প্রমাণাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে ইসলামের আসল উদ্দেশ্য সহজতরভাবে প্রচার করার প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।
- আল হেলাল সুন্দর, ঝকঝকে টাইপে, রঙিন ছবিসহ প্রকাশিত হতো যা পাঠকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল।
- ২০ পৃষ্ঠা সংবীলত এই পত্রিকাটিতে নতুন নতুন আলোচনা, উপমা, ছন্দ, নতুন বর্ণনা পদ্ধতি, নতুন বিষয়বস্তু-সবমিলিয়ে শিক্ষিত সমাজে উর্দু সংবাদপত্রের জগতে বিপ্লব এনে দিয়েছিল।
- সেই সময়ে এই পত্রিকার চাহিদা এতো বেশি ছিল যে প্রকাশের সংখ্যা প্রায় ২৭০০০ কপি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। পত্রিকাটি দাম ১২ রুপি ছিল যা সে সময়ে বেশ দামি বলে বিবেচিত ছিল।

আল-হেলাল ও *আল-বালাগ* ছাড়া মাওলানা আযাদের অন্যান্য উর্দু সংবাদপত্রগুলোও উর্দু সাংবাদিকতায় মূল্যবান অবদান রেখেছে। তার প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংক্ষিপ্ত তালিকা পাঠকদের জন্যে নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১.	নয়ে রঙে আলম	১৮৯৯
২.	আল-মিসবাহ	১৯০০
৩.	খোদাঙ্গে নজর	১৯০০-১৯০২
৪.	এডওয়ার্ড গেজেট শাহজাহনপুর	১৯০৩-১৯০৪
৫.	আহসানুল আখবার	১৯০২
৬.	তোহফায়ে আহমেদিয়া	১৮৯৯-১৯০০
৭.	লিসানুল সাদিক	২০০৩-২০০৫
৮.	আন-নাদুয়া	১৯০৫-১৯০৬
৯.	উকিল আমরিসার	১৯০৬-১৯০৮
১০.	দারাউল সালতানাত কোলকাতা	১৯০৭
১১.	আল-হেলাল	১৯১২-১৯১৪
১২.	আল-বালাগ	১৯১৫-১৯১৬
১৩.	আকদাম	১৯১৫
১৪.	পয়গাম	১৯২১
১৫.	আল-হেলাল	১৯২৭ (২য় বার)[৩৪]

স্বাধীনতার সংগ্রাম, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং শত নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও *আল-হেলাল* তার দায়িত্ব সম্পাদন করেছে। এটি অগণিত মুক্তিকামী মানুষের সংকল্পকে দৃঢ় করা, স্বাধীনতা আন্দোলনকে দিক নির্দেশনা ও গতি প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই পত্রিকাটি মুসলমানদের পবিত্র কোরআন-হাদিসকে মান্য করে সঠিক পথে চলার নির্দেশনা দিয়েছে। তাই *আল-হেলাল* কেবল উর্দু সাংবাদিকতাতেই নয় বরং এ উপ-মহাদেশের সাংবাদিকতার ও একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

৪. চতুর্থ যুগ (১৯৪৮ থেকে বর্তমান)

ভারত-বিভাগের পাঁচ বছর পর ১৯৫২ সালে প্রথম প্রেস কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। Register of News Press of India (RNI) নামে প্রেস কমিশনটি আত্মপ্রকাশ লাভ করে। সংবাদপত্র প্রকাশ ও সংখ্যার হিসেব প্রতি বছর সরকার ও জনগণের সামনে তুলে ধরাই এর প্রধান কাজ। (RNI) প্রথম রিপোর্ট ১৯৫৮ সালে প্রকাশ করা হয় যেখানে ১৯৫৭ সালের সংবাদপত্রের হিসেব তুলে ধরা হয়। প্রথম রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৫৭ সালে শুধু ভারত থেকে ৫১৩ টি উর্দু সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল।

উর্দু সংবাদপত্রের এমন দিন ছিল যখন অন্যান্য ভাষার মতো উর্দু প্রকাশনাও কাঠের মধ্যে অক্ষর খোদাই করে করা হতো। ১৭৯৬ সালে চেকোস্লোভাকিয়ায় লিথোগ্রাফি আবিষ্কৃত হয়েছিল। লিথোপ্রিন্টিং প্রেস আবিষ্কারের পরেই নাস্তালিখ লিপির মাধ্যমে উর্দু সংবাদপত্র ছাপানোর প্রচলন শুরু হয়। এসময় বিদ্যুতের অভাবে লিথুয়ানিয়ানরা হাত দিয়ে বড় বড় চাকা ঘোরাতেন। বিদ্যুৎ ব্যবহার করার পর এর নামকরণ করা হয় ইলেক্ট্রনিক প্রেস। কিন্তু নাস্তালিখ লিপিতে তখনো টাইপ করা যেতো না। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর ১৯৮১ সালে লন্ডনের মনু টাইপ করপোরেশনের সাথে যৌথভাবে দু জন পাকিস্তানি যুবক, আল হাসান সৈয়দ এবং আহমেদ মির্যা জামিল নুরি নাস্তালিখ নামে উর্দু ভাষায় কম্পিউটারে কম্পোজের নতুন সফটওয়্যার আবিষ্কার করেন। অক্টোবর, ১৯৮১ সালে পাকিস্তানের দৈনিক পত্রিকা *জং* (পাকিস্তানের, লাহোর) প্রথম এ সফটওয়ারের মাধ্যমে কম্পিউটারে কম্পোজ করে প্রকাশ করা হয়। প্রথম দিকে এই সফটওয়ারের মূল্য ছিলো এক লক্ষ পচিঁশ হাজার টাকা। ভারতের জালিন্দর থেকে প্রকাশিত দৈনিক *হিন্দ সমাচার* সর্বপ্রথম এই সফটওয়ার আমদানি করে ব্যবহার করা শুরু করে। যার ফলে উর্দু সংবাদপত্রে নতুন দিক উম্মোচিত হয় এবং কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগের ফলে ক্রমান্বয়ে প্রকাশের সংখ্যা বাড়তে থাকে। উর্দু সংবাদপত্র উচ্চমানের প্রিন্টিং মেশিনে মুদ্রণের কাজ করছে। চমৎকার ছবি, পত্রিকার বিন্যাস, ডিজাইনের সাহায্যে তাদের মুদ্রণে বিপ্লব ঘটিয়েছে।

১৯৯২ সালে আরেকটি বড় পরিবর্তন আসে যখন সংবাদ সংস্থা ইউ.এন.আই তার উর্দু পরিষেবা চালু করে। এটি বিশ্বের প্রথম উর্দু সংবাদ সংস্থা ছিল। এর পূর্বে উর্দু সংবাদপত্রগুলোকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ সংগ্রহের জন্য ইংরেজি সংবাদ সংস্থার উপর নির্ভর করতে হতো । (ইউ.এন.আই) এর উর্দু পরিষেবা চালু হওয়ার পর সংবাদ সংগ্রহ সহজতর হয়ে ওঠে। বর্তমানে UNI ছাড়াও PTI, Reuters, IFP, IUS, INS ইত্যাদি সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা সংবাদ আদান প্রদানের কাজকে আরো সহজ করে এনেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে উর্দু সংবাদপত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। প্রযুক্তি ব্যবহারে নতুন নতুন বিপ্লব সাধিত হতে থাকে। বর্তমানে প্রযুক্তি ব্যবহার করে উর্দু সাংবাদিকতা এই বিশ্বায়নের যুগে অন্যান্য ভাষার সংবাদপত্রের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছে। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার (রেডিও, টেলিভিশন) কল্যাণে সংবাদ প্রচার ও উপস্থাপনে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। ইন্টারনেট আবিষ্কার হয়েছে ১৯৬০ সালে, যা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে ১৯৯০ সালে। এই ইন্টারনেটের সহজলভ্যতার দরুন চাহিদা কমেছে কাগজে মুদ্রিত পত্রিকার। সবচেয়ে বড় বিপ্লব হয়েছে এন্ড্রয়েড ফোনের আবিষ্কার এবং এর ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে হাতের মুঠোয় চলে এসেছে সবকিছু। সংবাদপত্রের মাধ্যম হয়ে উঠেছে ওয়েবসাইট। যার ফলে প্রচার ও প্রকাশ সহজ হয়েছে এবং তা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে।[৩৫]

বর্তমান সময়ে এ উপমহাদেশ থেকে প্রকাশিত উর্দু সংবাদপত্রের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:

দৈনিক রেহনুমায়ে দকন - হায়দারাবাদ
দৈনিক সিয়াসাত- হায়দারাবাদ
দৈনিক মিলাপ- হায়দারাবাদ
দৈনিক মতসফ- হায়দারাবাদ
দৈনিক ইত্তিহাদ-পাটনা
দৈনিক সদায়ে আজম-পাটনা
দৈনিক ইনকিলাব-পাটনা
দৈনিক তানজিম-পাটনা
দৈনিক প্রতাপ-দিল্লি
দৈনিক আখবার মাশরিক-দিল্লি
সাপ্তাহিক নয়ি দুনিয়া-দিল্লি
কওমি আযাদ-দিল্লি
দৈনিক পাসবান- বেঙ্গালুর
দৈনিক সালার- বেঙ্গালুর
কওমি আযাদ- লাক্ষ্মৌ
আযায়েম - লাক্ষ্মৌ
দৈনিক নাদিম- ভুপাল
দৈনিক আছরে যাদিদ- কোলকাতা
দৈনিক আযাদ হিন্দ- কোলকাতা
দৈনিক আখবার মাশরিকি- কোলকাতা
দৈনিক ইনকিলাব- বোম্বে
দৈনিক দৈনিক হিন্দুস্থান - বোম্বে
দৈনিক উর্দু টাইমজ- বোম্বে
সাপ্তাহিক আখবারে আলিম-বোম্বে
আদব- বাংলাদেশ
দৈনিক খেদমাত-শ্রীনগর
দৈনিক রোশনি-শ্রীনগর
দৈনিক আফতাব-শ্রীনগর[৩৬]

উর্দু সাংবাদিকতায় নারী

উর্দু সাংবাদিকতায় নারী প্রতিনিধিত্ব শুরুতে অনেক সীমিত ছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা লড়াই করলেও সাংবাদিকতায় তাদের অংশগ্রহণ ছিল খুব কম। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশক পর্যন্ত উর্দু সংবাদপত্রে আধুনিক বিষয়, নারীর সামাজিক সমস্যা, তাদের অধিকার এবং শিক্ষার অধিকার নিয়ে নারীরা লিখেছেন। কখনো তারা নিজের নাম ব্যবহার করেছেন কখনো বা ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন।

উর্দুতে নারীদের জন্য প্রথম সংবাদপত্র মৌলভী সৈয়দ আহমেদ দেহলুবী ১৮৮৭ সালে দিল্লি থেকে *আখবারে নিসা* প্রকাশ করেন; যা মাসে তিনবার প্রকাশিত হতো। এরপর সৈয়দ মমতাজ আলী

সাপ্তাহিক *তাহজিবন নুসওয়া* লাহোর থেকে প্রকাশ করেন যা ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিলো নারীদের গৃহস্থালি বিষয়াদির বর্ণনার পাশাপাশি সাহিত্যে আগ্রহ সৃষ্টি করা। এতে মাওলানা আবদুল মাজিদ সালেক, ইমতিয়াজ আলী তাজ, আহমেদ নাদীম কাসেমীর সাথে মুহাম্মদী বেগম, হিজাব ইমতিয়াজ আলী, জাবেদা জারিন, সুলতানা আসিফ আলী ফয়েজী, সাগরী হুমায়নের মতো খ্যাতিনামা নারী লেখকগণ নিয়মিত লেখতেন।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে শেখ আব্দুল্লাহর *খাতুন*, বেগম খামোশের *পর্দা*, রাশেদুল খায়েরীর *ইসমাত* ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। কিন্তু নারী সম্পাদকের সম্পাদনায় প্রথম উর্দু পত্রিকা *আন-নিসা* ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয় যার সম্পাদক ছিলেন সাগরী বেগম। খাজা হাসান নিজামী, খাজা বানুর সম্পাদনায় ১৯২৪ সালে *তাবলিগে নুসওয়া* প্রকাশ করেন; যেখানে শিক্ষা, সমাজ সংস্কার, ইতিহাস ও ধর্মীয় বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করা হতো। এই সময়ে আরো কিছু সংবাদপত্রে নারী প্রতিনিধিত্ব লক্ষ্যণীয়। তাদের মধ্যে হায়দারাবাদের মরিয়ম বেগমের *খাদেমা*, সালেহা খাতুনের *আত্‌ফ*, আগ্রা থেকে রাজিয়া হাজেরা *সুরাইয়া* ইত্যাদি পত্রিকা উল্লেখযোগ্য।

১৮৯২ সালে হায়দারাবাদ থেকে নারীদের জন্য *নুসওয়া* নামে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেন মাহবুব হোসাইন মুয়াল্লিম। যা দীর্ঘ নয় বছর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয়। এছাড়া ইসমত আরার *খাওয়াতিন মাশরিক*, হামিদা নিসার *খাওয়াবিন দকন* অন্যতম। কিন্তু নুরজাহান সুওরাত একটি ভিন্ন মত তুলে ধরেন। তার মতে সে সময়ে উর্দু সংবাদপত্রের সম্পাদক কিংবা প্রকাশক হিসেবে যে সকল নারীর নাম রয়েছে তাদের বেশিরভাগেরই সংবাদপত্র কিংবা সাহিত্যের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না । তাদের ঘরের পুরুষ সদস্যরা যাবতীয় কাজ করতেন কেবল প্রচারের জন্য নারীদের নাম উল্লেখ করতেন। উর্দুতে প্রথম পূর্ণকালীন নারী সাংবাদিক ছিলেন ভুপালের খালেদা বিলগ্রমীর, যিনি ১৯৭৮ সালে দৈনিক *আফতাব জাদীদ*-এ যোগদান করেন, এবং টানা বাইশ বছর সাংবাদিকতা করেন। নূরজাহান সরওয়াত *কওমী আজাদ* এবং *ইনকিলাবে* কাজ করেছেন।নারী প্রতিনিধিত্বে আরেকটি উল্লেযোগ্য সংবাদপত্র ছিলো *রশনি* যা হাজেরা বেগম দিল্লি থেকে প্রকাশ করেছিলেন।

সাহিত্যিক পত্রিকার মধ্যে এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হয় *পেহচান;* যার সম্পাদক জেবুন্নেসা। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা *শের ও হিকমাত* এ ফাতেমা শেইরী প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া *আজকাল*, *বজম-ই-আদব*, *ফিকর আগাহী*, *কিরনে* ইত্যাদি সাহিত্যিক উর্দু পত্রিকা নারী সাংবাদিকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে।

বর্তমানে প্রিন্টিং মিডিয়ার পাশাপাশি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষণীয়; যারা রেডিও এবং টেলিভিশনে সংবাদ উপস্থাপনে কোটি মানুষের সামনে দক্ষতা প্রমাণ করেছে।[৩৭]

উর্দু সাংবাদিতার ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বল। জাতি, দেশ, ভাষা, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নে উর্দু সাংবাদিকগণ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। বর্তমানে এক্ষেত্রে সঠিক নেতৃত্বের এবং

উদ্দেশ্যের অভাব লক্ষ করা যায়। ইতোমধ্যে উর্দু সাংবাদিকতা তার পথচলার দুইশত বছর উদযাপন করেছে। উর্দু সংবাদপত্র অতীত ইতিহাসকে ধারণ করে মানবজাতির কল্যাণের লক্ষ্যে সাংবাদিকতার জগতে তার স্বকীয়তা বজায় রেখে আগামীতে আরো সমৃদ্ধ হবে এ আশা সঙ্গত কারণেই করা যায়।

তথ্যসূত্র

১. *ব্রিটিশ শাসনামলে বাঙ্গলায় বিরাজিত ভাষা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি*, এ. বি. এম. রেজাউল করিম ফকির, ঢাকা ট্রিবিউন বাংলা, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১

২. প্রাগুক্ত

৩. *History of Indian Journalism*, J. Natarajan, The manager of publication, Dehli, 1995, p. 56

৪. *জামে জাহা নুমা উর্দু সাহাফাত কি ইবতদা*, গ্রিবচন চন্দন, মাকতুবায়ে জামিয়া মিল্লাহ, নয়া দিল্লি, ১৯৯২, পৃ. ১৮

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫

৬. *মাহিশূর মেয় উর্দু মাতবুয়া*, মুহাম্মদ সৈয়দ আবদুল খালেক, হায়দারাবাদ, ১৯৪২, পৃ. ৭৪-৭৭

৭. *মাসুম মুরাদাবাদি, উর্দু সাহাফাত কা ইরতকা*, উর্দু একাডেমি দিল্লি, ২০১৩, পৃ. ৩৫

৮. *Jam-e-Jahannuma: Marking 200 years of Urdu journalism in* India, Jafar Iqbal, The Siasat Daily, India, March 27, 2022

৯. তাহির মাসুদ, *উর্দু সাহাফাত কি এক নাদির তারিখ*, মাগরিবী পাকিস্থান উর্দু একাডেমি, লাহের, ১৯৯২, পৃ. ১৪

১০. *Jam-e-Jahannuma: Marking 200 years of Urdu journalism in India,* প্রাগুক্ত

১১. *জামে-জাহা-নুমা উর্দু সাহাফাত কি ইবতদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৯১

১২. *উর্দু সাহাফাত, আনোয়ার আলী দেহলুবী*, উর্দু একাডেমি দিল্লী, ২০০০, পৃ. ৪৩- ৪৭

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৫০

১৪. *উর্দু সাহাফাত কা সফর*, গ্রিবচন চন্দন, মাকতুবায়ে জামিয়া মিল্লাহ, এডুকেশনাল পাবলিশিং হাউজ, দিল্লি, ২০০৭, পৃ. ৭৩-৭৭

১৫. *দিল্লি উর্দু আখবার*, প্রফেসর খাজা এহমাদ ফারুকী, শুবায়ে উর্দু দিল্লি ইউনিভার্সিটি, ১৯৭২, পৃ. ১০-১৪

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০-১৫০

১৭. *উর্দু সাহাফাত কা সফর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

১৯. *উর্দু সাহাফাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

২০. *উর্দু সাহাফাত কা ইরতকা*, পৃ. ৬২

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

২২. আতিক আহমেদ সিদ্দিকী, *হিন্দস্থানি আখবার নুবিসি*, পৃ. ১৬৩

২৩. তাহির মাসুদ, *উর্দু সাহাফাত উনিশসো সাদি মেয়*, করাচি, ২০০২, পৃ. ৩৮২

২৪. *উর্দু সাহাফাত কা সফর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

২৫. *উর্দু সাহাফাত কি এক নাদির তারিখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

২৬. সুলতানা ফাতেমা ওয়াহেদী, *আওয়াদ আখবার কি আদবী খেদমাত*, মুকতবায়ে জামেয়া মিল্লা দিল্লি, ২০১৫, পৃ. ৮৩- ১১৩

২৭. *উর্দু সাহাফাত কা সফর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

২৮. ইফতেখার আলম খান, *স্যার সৈয়দ আওর সাইন্টিফিক সোসাইটি*, মুকতবায়ে জমেয়া মিল্লা দিল্লি, ২০১৩, পৃ. ১১-২০
২৯. *উর্দু সাহাফাত কা ইরতকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
৩০. মুহাম্মদ আতিক সিদ্দিকী, *হিন্দস্থানী সাহাফাত*, পৃ. ২০
৩১. *উর্দু সাহাফাত কা ইরতকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
৩৩. মুহাম্মদ আতিক সিদ্দিকী, *হিন্দস্থানী সাহাফাত*, পৃ. ২২
৩৪. *উর্দু সাহাফাত কা ইরতকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
৩৫. ইমাম আজিম, *একিশবী সাদি মেয় উর্দু সাহাফাত*, এডুকেশনাল পাবলিশিং হাউজ, দিল্লি, ২০১৬, পৃ. ২৭-৩৮
৩৬. আফজাল মেসবাহী, *উর্দু সাহাফাত আজাদি কে বাদ*, আরসিয়া পাবলিকেশন দিল্লি, ২০১৩ পৃ. ৯৮-১১০
৩৭. মরজিয়া আরিফ, *উর্দু সাহাফাত কে ময়দান মেয় খাওয়াতিন কি নুমাইন্দিগী*, ৯ ডিসেম্বর ২০১৯

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একচল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০/জুন ২০২৩

সামাজিক দায়িত্ব পালনে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা: একটি নীতি-দার্শনিক পর্যালোচনা

মোহাম্মদ দাউদ খাঁন*

সারসংক্ষেপ

ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। তবে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জন ছাড়াও সামাজিক দায়িত্ব পালনে দায়বদ্ধতা রয়েছে। কারণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান যেমন শ্রমিক, কর্মচারি, কর্মকর্তা, সরবরাহকারী, ভূমি, মূলধন, পণ্য উৎপাদানের কাঁচা মাল, পণ্য বিতরণ, ভৌত-অবকাঠামো ইত্যাদি সমাজ থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং উল্লিখিত উপাদান ব্যতীত ব্যবসায় পরিচালনা করাও অসম্ভব। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সামাজ থেকে নানাভাবে উপকৃত হয়েছে। এ কারণে এটি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ। এরূপ দায়বদ্ধতার ধারণা থেকেই দায়িত্ব পালনের বিষয়টি চলে আসছে যা কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (Corporate Social Responsibility বা CSR) নামে পরিচিত। আলোচ্য প্রবন্ধে সিএসআর-এর প্রকৃতি, সামাজিক দায়বদ্ধতার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিসমূহ, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে সমাজের নানাবিধ সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রত্যয় আলোচনার মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমাজের চাহিদা আকাঙ্ক্ষা, ইত্যাদি বিষয়কে নৈতিকতার আলোকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যবসায় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হলে তা উদ্যোক্তা ও ভোক্তা উভয়ের জন্য লাভজনক হবে।

চাবি শব্দ: সামাজিক দায়বদ্ধতা, কোভিড-১৯, ভোক্তা ও উদ্যোক্তা, স্টকহোল্ডার, স্টেকহোল্ডার, নীতি-দর্শন।

১. ভূমিকা

সভ্যতার আধুনিকায়নের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত হয়ে জাতীয় পর্যায় থেকে যেমনিভাবে আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে, তেমনিভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকাণ্ডের সাথে প্রাসঙ্গিক ও সংশ্লিষ্ট বিষয় হিসেবে সামাজিক সম্পৃক্ততাও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ধরনের সম্পৃক্ততা সমাজকে নেতিবাচক কিংবা ইতিবাচক দুভাবেই প্রভাবিত করতে পারে। সমাজের উপর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের এরূপ কর্মকাণ্ডের প্রভাবের উপর ভিত্তি করে স্থানীয় ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্র করে নানাবিধ আলোচনা লক্ষ্য করা যায়- যার মধ্যে অন্যতম একটি প্রত্যয় হলো কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা বা সিএসআর। সিএসআর সংক্রান্ত আলোচনা মূলত কিছু প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। প্রথমত, সমাজের প্রতি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর কোন দায়বদ্ধতা আছে কি? যদি উত্তরটি ইতিবাচক হয় তাহলে দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো সমাজের প্রতি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের কোন ধরনের দায়বদ্ধতা রয়েছে? তৃতীয়ত, সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন? চতুর্থত, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের

* অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নির্বাহী কর্মকর্তাগণ স্টকহোল্ডারদের স্বার্থ দেখে অথবা শেয়ারহোল্ডারদেরকে লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত করে সামাজিক খাতে ব্যয় করাটা কতটুকু নৈতিক? পঞ্চমত, সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় কি বিনিয়োগকারীদের পকেট থেকে তহবিল চুরি হিসেবে গণ্য করা যায়– যা মিল্টন ফ্রিডম্যান দেখানোর চেষ্টা করেছেন? ষষ্ঠত, সিএসআর কি বিনিয়োগকারীদের স্বার্থের পরিপন্থী, না কি বিনিয়োগকারী ও ভোক্তা উভয়ের জন্য লাভজনক? এ প্রবন্ধে প্রতিটি প্রশ্নেরই যৌক্তিক উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হবে। অতএব সিএসআর-এর পক্ষে যেমন কেউ কেউ নৈতিক ও যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের যুক্তিসমূহ তুলে ধরার চেষ্টা করেন– ঠিক বিপরীতভাবে কেউ কেউ আবার সিএসআর-এর বিপক্ষে তাদের বক্তব্য যুক্তিসঙ্গতভাবে উপস্থাপন করে থাকেন। তাই উক্ত ধারণাটি বর্তমান বিশ্বের ব্যবসায় নীতিবিদ্যার জগতে একটি বিশেষ জায়গায় অবস্থান করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ এক সময় আর্থিক মুনাফা অর্জন ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য হলেও সময়ের পরিক্রমা ও বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় এ ধারণার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। অর্থাৎ ব্যবসায় অধিক মুনাফা অর্জন সর্বদা একমাত্র লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে ব্যবসায়ে সফলতা আসে এটি সত্য– কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে মুনাফা অর্জনকে প্রাধান্য দেয়ার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানের নৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রটি প্রসার লাভের মাধ্যমেও পরোক্ষভাবে দীর্ঘকালীন মুনাফা অর্জন হতে পারে যা আমি পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব। তাই ব্যবসায় নীতিবিদ্যার জগতে অনেক পণ্ডিত দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, মুনাফা অর্জন ছাড়াও ব্যবসায়ীদের অন্যান্য অনেক দায়-দায়িত্ব আছে। তারা পণ্য উৎপাদন করে এবং জনগণকে সেবা প্রদান করে। জনগণের জন্য ব্যবসায়ীরা চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি করে, বেকারত্ব হ্রাস ও দরিদ্রতা দূর করণের মাধ্যমে আর্থিক সচ্ছলতা বিধানের চেষ্টা করে। তাই অধিক মুনাফার নীতি পরিহার করে নৈতিকতা অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যবসায় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হলে এটির সাথে সম্পর্কিত সবাই যেমন লাভবান হবেন তেমনি জনগণ কিংবা সমাজ ও রাষ্ট্র তার ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে।

পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে যে, ব্যবসায়ের প্রধান লক্ষ্য হলো মুনাফা অর্জন। কিন্তু অধিক মুনাফা অর্জন সর্বদা ব্যবসায়ে সফলতার যথাযথ প্রক্রিয়া নয়। কারণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবসায় সফলতা আসে এটি সত্য কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে মুনাফা অর্জনের গণ্ডিকে অতিক্রম করে (বেরিয়ে এসে) নীতিবোধ ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান টেকসই হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়াও দীর্ঘকালীন মুনাফা অর্জন করতে পারে, যা আলোচ্য প্রবন্ধে মার্ক এন্ড কোম্পানির উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হবে। তাছাড়া বর্তমানে কোভিড-১৯এর কারণে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ মুনাফা অর্জনের বিষয়টিকে আপাতত বিবেচনায় না নিয়ে নৈতিক দিকটিকে গুরুত্ব দিয়ে সমাজ বিনির্মাণে অবদান রাখছে। অধিকন্তু, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সামাজিক খাতে ব্যয় করার কারণে আপাতদৃষ্টিতে বিনিয়োগকারীগণ অপেক্ষাকৃত কম মুনাফা অর্জন করলেও ব্যবসায়কে টেকসই করার মাধ্যমে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে লাভবান হওয়ার সুযোগ রয়েছে যা বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

ফলিত নীতিবিদ্যার বিভিন্ন শাখার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো ব্যবসায় নীতিবিদ্যা। বর্তমান বিশ্বে ব্যবসায় নীতিবিদ্যার যেসব ধারণা মানুষকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে তাদের মধ্যে সিএসআর অন্যতম। সিএসআর সম্পর্কে পণ্ডিত সমাজ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে আলোচনা করেন। প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার ইতিহাসে আমেরিকার প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ এবং গ্রিনেল কলেজের সভাপতি অধ্যাপক হাওয়ার্ড রোথম্যান বাওয়েন ১৯৫৩ সালে প্রথমবারের মতো 'সামাজিক দায়বদ্ধতা' ধারণাটি তাঁর 'Social Responsibilities of the Businessman' প্রবন্ধে আলোচনা করেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, ব্যবসায়ীরা সমাজের নৈর্ব্যক্তিক মূল্যের উপর ভিত্তি করে ব্যবসায়ের নীতিমালা, ব্যবসায়ের সিদ্ধান্ত ও ব্যবসায়ের কর্মধারা নির্ধারণ করেন এবং সে-অনুযায়ী সমাজের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা পালনে সচেষ্ট হন। 'সামাজিক দায়বদ্ধতা' ধারণাটিকে সব চিন্তাবিদই সমভাবে বিবেচনা করেন না। অর্থাৎ অনেকেই সিএসআর-এর সমালোচনা করেন। এসব চিন্তাবিদের মধ্যে অন্যতম হলেন নোবেল বিজয়ী আমেরিকার রক্ষণশীল অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যান। তিনি তাঁর 'The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits' প্রবন্ধে 'সামাজিক দায়বদ্ধতা' ধারণার সমালোচনা করে বলেন, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূল নীতিই হলো মুনাফা সর্বোচ্চকরণ। অর্থাৎ তিনি ব্যবসায়ের 'সামাজিক দায়বদ্ধতা' বলতে রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত আইন অনুসরণ করে সমাজের সম্পদ সদ্ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানের জন্য সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করার বিষয়টিকে ইঙ্গিত করেছেন। কারণ প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে তার সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনেদের স্বার্থ রক্ষার মাধ্যমে সিএসআর পালন করা যেতে পারে। আমেরিকার কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের বিশিষ্ট অধ্যাপক ও ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর এথিক্স ইন বিজনেস-এর সহকারী পরিচালক ডিজর্জ তাঁর *Business Ethics* গ্রন্থে সিএসআর বিস্তৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বলেন, 'সামাজিক দায়বদ্ধতা' ধারণাটি পরিভাষা হিসেবে বিভিন্ন কারণে এটির পক্ষ ও বিপক্ষ সমালোচক– উভয়ের নিকটই ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। আমেরিকার ডেপল বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্রিহাজ কলেজ অব বিজনেসের অধ্যাপক লুরা পিনকাস হার্টম্যান এবং আমেরিকার বিখ্যাত সেইন্ট বেনেডিক্ট কলেজ এবং সেইন্ট জন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক জো ডেসজার্ডিন্স তাঁদের *Business Ethics: Decision Making for Personal Integrity and Social Responsibility* গ্রন্থে বলেন, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যদি সমাজের চাহিদা পূরণ বা সেবা প্রদানে ব্যর্থ হয় তাহলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ টেকসই না হয়ে বরং অস্তিত্ব সংকটে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। তাই মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সমাজের চাহিদাকেও গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। আমেরিকার খ্যাতনামা লয়োলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় নীতিবিদ্যা ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের এমেরিটাস অধ্যাপক ও সোসাইটি ফর বিজনেস এথিক্সের সাবেক নির্বাহী পরিচালক জন রেমন্ড বোটরাইট এবং ভারতের জাবির ইনস্টিউট অব ম্যানেজম্যান্টের জেনারেল স্ট্রেটেজিক ম্যানেজম্যান্টের অধ্যাপক বিভু প্রসন পাত্র তাঁদের *Ethics and the Conduct of* Business গ্রন্থে বলেন সিএসআর ধারণাটি ব্যবসায়, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান ও একাডেমিক গবেষণার

বিষয়বস্তুতে বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং বর্তমানে এটিকে সামাজিক উন্নয়নের মানদণ্ড হিসেবেও মূল্যায়ন করা হচ্ছে। তাই সময়ভেদে সিএসআর-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। শ্যারন এস. সি. তাঁর 'Sustainability is Applied Ethics' প্রবন্ধে বলার চেষ্টা করেছেন যে, সমাজের প্রতি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যে দায়বদ্ধতা তাই হলো সিএসআর। স্যামুয়েল আইডো এবং রেনে স্মিদপিটার সিএসআর-কে উভয় পক্ষের (কর্পোরেট সত্তা এবং স্টেকহোল্ডার্সের) জন্য লাভজনক অবস্থা হিসেবে বর্ণনা করেন। অর্থাৎ উক্ত গবেষকদ্বয় তাঁদের 'Corporate Social Resposibility in Europe: An Introduction' প্রবন্ধে প্রতিষ্ঠান ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে বিশ্বাসযোগ্যতা ও আস্থার সঙ্গে সম্পর্ক বিনির্মাণের *টুল* (Tool) হিসেবে সিএসআর-কে উপস্থাপন করেন। তাঁরা আরও মনে করেন এ দু'টি (বিশ্বাসযোগ্যতা ও আস্থা) হলো ব্যবসায়ের জন্য অমূল্য *টুল*। তাই সিএসআর-এ বিশ্বাসী অনেক ভাষ্যকার, বর্ণনাকারী, গবেষক এবং সমর্থক বিশ্বাস করেন যে, কোন ব্যবসায় সংগঠন যখন সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করে ব্যবসায় পরিচালনা করে, তখন উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতি ক্রেতাদের আনুগত্য বৃদ্ধি পায়, সংকটকালীন সময়ে মিডিয়া সহানুভূতিশীল থাকে, কর্মক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারিরা অনুপ্রাণিত ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে, উচ্চতর দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি পেতে আকৃষ্ট হয় ইত্যাদি। এভাবে উভয়ের (কর্পোরেট সত্তা এবং স্টেকহোল্ডার্সের) জন্য একটি লাভজনক অবস্থা তৈরি হয়। এনডেল্কা স্টোজানোভিক এবং অন্যরা তাঁদের 'The Effects of CSR Activities on Business According to Employee Perception' প্রবন্ধে সিএসআর-কে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক উন্নয়নের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। পণ্ডিতদের লেখনি থেকে বলা যায় যে, সিএসআর সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও সমাজের উপর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে যা অস্বীকার করার উপায় নেই।

সিএসআর-এর প্রকৃতি: সমাজের প্রতি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেশনের যে দায়িত্ব রয়েছে তা নতুন নয়।[১] কারণ ১৯২০ সালের প্রথম ভাগেই সিএসআর ধারণাটি পরিচিতি লাভ করলেও[২] সময়ের বিবর্তন ও ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিশেষ করে ১৯৫০ সালের[৩] দিকে আমেরিকায় এটির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ এবং গ্রিনেল কলেজের সভাপতি ও অধ্যাপক হাওয়ার্ড রোথম্যান বাওয়েন তাঁর 'Social Responsibilities of the Businessman' প্রবন্ধে 'সামাজিক দায়বদ্ধতা' বলতে সমাজের প্রতি ব্যবসায়ীদের দায়বদ্ধতা বা কর্তব্যকে নির্দেশ করেছেন।[৪] ষাটের দশকে সিএসআর-কে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলেও মানবকল্যাণমূলক কাজ হিসেবে সিএসআর-এর অব্যাহত পথ চলা লক্ষ্য করা যায়। এই দশকে খ্যাতিমান নোবেলজয়ী আমেরিকার রক্ষণশীল অর্থনীতিবিদ ও পরিসংখ্যানবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যান ব্যবসায়ের 'সামাজিক দায়বদ্ধতা' বলতে রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত আইন অনুসরণ ও সমাজের সম্পদ সদ্ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানের জন্য সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করার বিষয়টিকে ইঙ্গিত করেছেন।[৫] সত্তরের দশকে,

বিশেষ করে ১৯৭৯ সালে আমেরিকার জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক আর্চি বি. ক্যারল সিএসআর বলতে চারটি (অর্থনৈতিক, আইনগত, নৈতিক ও বিবেচনামূলক) উপাদানের সমন্বয়ে ব্যবসায় পরিচালনাকে বুঝিয়েছেন।[৬] তিনি অবশ্য পরবর্তী সময়ে ১৯৯১ সালে তাঁর প্রদত্ত পূর্বের সংজ্ঞাটির চতুর্থ উপাদান 'বিবেচনামূলক' অংশটিকে 'মানব কল্যাণমূলক' উপাদান দ্বারা প্রতিস্থাপিত করেন যা চিত্র-১ এর মাধ্যমে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:[৭]

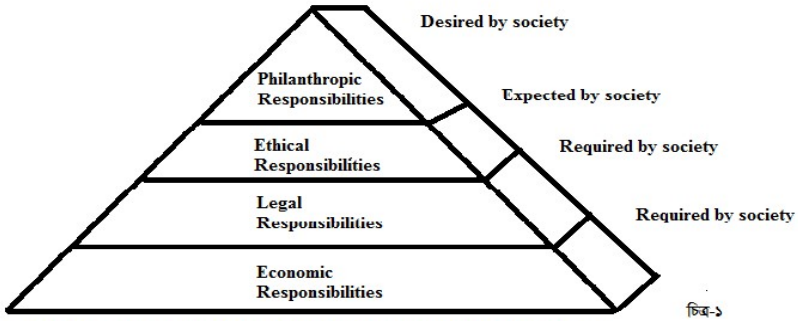

চিত্র-১

Source: Crane, A. and Matten, D. (2011), *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization*, 3rd ed., UK: Oxford University Press, p. 53.

চিত্রে-১ এ লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অর্থনৈতিক, আইনগত, নৈতিক ও জনহিতৈষী– উক্ত চার ধরনের উপাদানের সমন্বয়ে সিএসআর গঠিত যেখানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত।

আশির দশকে সিএসআর সম্পর্কে একাডেমিক গবেষণায় বহু নতুন তত্ত্বের সূচনা হলেও উক্ত দশক ছিল মূলত অংশীজন তত্ত্বের জন্য বিখ্যাত। উক্ত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন আমেরিকার ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দার্দেন স্কুলের ব্যবসায় প্রশাসনের অধ্যাপক ও দার্শনিক এডওয়ার্ড ফ্রিম্যান। তিনি মনে করেন, কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যখন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রভাবিত হয় অথবা যখন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সিদ্ধান্তের কারণে ব্যবসায় প্রভাবিত হয় তারাই প্রতিষ্ঠানের অংশীজন।[৮] পরবর্তী সময়ে নব্বইয়ের দশকে আমেরিকা, ইউরোপ, ভারতসহ বিশ্বজুড়ে স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানগুলো সিএসআর-এর অনুশীলনে মনোযোগী হয়। এ কারণে উক্ত দশককে সিএসআর-এর অনুশীলনের দশক বলা হয়। একবিংশ শতাব্দীতে সিএসআর সংক্রান্ত তাত্ত্বিক আলোচনার প্রকৃতি ও ধরন পরিবর্তিত হয়ে প্রায়োগিক গবেষণার দিকে অগ্রসর হয়। যেমন ২০১১ সালে মালয়েশিয়ার এমএম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক সাঈদ ঘোলামী পিরামিড ও অংশীজন তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সিএসআর সংক্রান্ত কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য একটি মডেল তৈরি করেন যার নাম 'Value Creation Model of CSR' (অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও সমাজের জন্য মূল্য সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া)। এছাড়াও একই সালে আরেক জন গবেষেক ক্লেইডনও পিরামিড তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে 'The Model of Consumer Driven Corporate Responsibility' (এ তত্ত্বে

অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি বাজারের রাজা হিসেবে বিবেচিত ক্রেতা/ভোক্তাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়) তৈরি করেন।[৯]

উপরের আলোচনার ধারাবাহিকতায় বলা যায় যে, ব্যবসায় নীতিবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হলো সিএসআর। অর্থাৎ ব্যবসায় সংগঠন তাদের নীতি ও কর্মপরিধিতে সমাজস্থ মানুষের চাহিদার দিকটি বিবেচনা করে অভিনবভাবে সিএসআর-কে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হওয়ায় সাম্প্রতিক বিশ্বের সর্বত্র এটি ক্রমবর্ধমান বিষয় হিসেবে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে।[১০] কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থা একটি নতুন অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। এরূপ অবস্থায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসএর কর্মসূচি গ্রহণের একটি শক্তিশালী নৈতিক অবস্থান তৈরি হয়েছে যার প্রতিফলন আমরা আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে লক্ষ্য করি। যেমন বাংলাদেশে সিএসআর নামক সংশ্লিষ্ট খাতে ব্যয় করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৮ সালে প্রথমবারের মতো সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব হিসেবে দিকনির্দেশনা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে।[১১] কিন্তু সম্প্রতি কোভিড-১৯এর কারণে তা পুনঃনির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ করোনা মহামারিতে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভঙ্গুর পরিস্থিতি উন্মোচিত হলে জনস্বাস্থ্য খাতের বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সিএসআর সংক্রান্ত খাতসমূহের যোজন-বিয়োজন করে ১৬ জুন, ২০২০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব হিসেবে তা পুনঃনির্ধারণ করে একটি নির্দেশনা জারি করে। উক্ত নির্দেশনায় করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে দেশের জনস্বাস্থ্যে উদ্ভূত সংকট মোকাবিলায় সিএসআর-এর ৬০ শতাংশ জনস্বাস্থ্যে, শিক্ষাখাতে ৩০ শতাংশ ও জলবায়ু ঝুঁকি তহবিলে ১০ শতাংশ ব্যয় করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।[১২]

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা হলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের এমন এক ধরনের নীতি বা কৌশল যা সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনকে ব্যবসায় পরিচালনার অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নিয়মের সঙ্গে একত্র করে ব্যবসায় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করাকে বোঝায়। এ কারণে আমেরিকার ওয়েস্ট জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্যারন এস. সি তাঁর 'Sustainability is Applied Ethics' প্রবন্ধে বলেন, 'Corporate social responsibility deals with the role of business in society.'[১৩] ব্যবসায় কর্মকাণ্ড পরিচালনার নিমিত্ত সৃষ্ট প্রভাব সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকেই শ্যারন কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা বলে অভিহিত করেন। অর্থাৎ ব্যবসায় সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড জনসাধারণ, সামাজিক সম্প্রদায় ও পরিবেশ প্রভৃতির উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে যা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতাকে অনিবার্য করে তোলে। তাই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণি যেমন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সদস্যবৃন্দ, সরবরাহকারী, ক্রেতা এবং সমাজ উন্নয়নের জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা রয়েছে।[১৪] অর্থাৎ সমাজ ও ব্যবসায় সংগঠনের অংশীজনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া, প্রতিশ্রুতিশীল হওয়া বা অঙ্গীকার করা (to pledge back) যা

'দায়বদ্ধতা'র মূল ধারণার উপর ভিত্তি করে গঠিত। আবার ব্যবসায়ীবৃন্দ তাদের ব্যবসায় সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সমাজের বিভিন্ন উপাদান যেমন মূলধন, সংগঠন, ভূমি, শ্রম, দক্ষ জনবল, বাজার ব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যবহার করেন বিধায় সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি আরও জোরালোভাবে দেখা দিয়েছে। তাছাড়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এমন কিছু তামাক সংশ্লিষ্ট পণ্য যেমন বিড়ি, সিগারেট, জর্দা উৎপাদন করে যা সমাজের সকল সদস্য কর্তৃক ব্যবহৃত না হলেও এর দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির দায় সকলকে বহন করতে হয়। তাই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সমাজের এসব আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন, চাহিদাকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নিয়ে এর ক্ষতির দায় স্বীকার করে তা যথাসম্ভব বিকল্প বিনিময় সুবিধার মাধ্যমে পূরণ করা বাঞ্ছনীয়। এরূপ ক্ষেত্রে হয়তো কিছু মুনাফা কমে যেতে পারে যার দ্বারা কতিপয় অংশীজন কিছু ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। কিন্তু তাই বলে বিষয়টি এমন নয় যে, প্রতিষ্ঠান তার নিজ স্বার্থ হাসিল করতে গিয়ে সামাজিক ক্ষতি সৃষ্টির কারণ হবে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যদি সমাজের আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রতিশ্রুতি, চাহিদা পূরণ বা সেবা প্রদানে ব্যর্থ হয় তাহলে এটির অস্তিত্ব সংকটে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।[১৫]

সিএসআর-এর প্রতিটি ধরনেই অর্থনৈতিক, আইনগত ও নৈতিক দায়বদ্ধতার কথা বলা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতার মধ্যে অন্যতম হলো মানসম্মত পণ্য উৎপাদন ও বিতরণ, বেকারত্ব হ্রাসের নিমিত্ত কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি, সমাজ ও বিশ্ব চাহিদানুযায়ী নিত্য নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ইত্যাদি। আইনগত দায়বদ্ধতার মধ্যে রয়েছে স্টকহোল্ডার, স্টেকহোল্ডার, কর্মী, ক্রেতা, উৎপাদকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থ ও আমানত রক্ষা করা। রাষ্ট্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করে জনগণ ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে যার ফলে প্রতিষ্ঠানের আইনি দায়বদ্ধতাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া নৈতিক দায়বদ্ধতার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পণ্যের গুণগতমান সমুন্নত রাখা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, কর্মচারিদের অধিকার ও পেশাগত সুযোগ-সুবিধা সুরক্ষা, ক্রেতা ও ভোক্তা সাধারণের নিকট ন্যায্য ও যৌক্তিক মূল্যে পণ্য সরবরাহ করা, ক্রেতা ও ভোক্তা সাধারণের সাথে প্রতারণা না করা প্রভৃতি। অতএব ভবিষ্যতে এ ধরনের শ্রেণি ও গোষ্ঠীর বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে পরিহার বা অবজ্ঞা করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য মুনাফা অর্জন এবং টেকসই ব্যবসায় পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব। ফলে দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবসায় পরিচালনা করার জন্য সমাজের ভোক্তা বা ক্রেতার সঙ্গে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।[১৬] যেমন স্টারবাক্স নামক একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান দরিদ্র দেশগুলোর উৎপাদনকারীদের নিকট থেকে বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি দামে কফি ক্রয় করে থাকে। বাংলাদেশেও বিভিন্ন ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠান সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমে অর্থ ব্যয় করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৪ সালে ব্যাংকসমূহের মধ্যে সামাজিক খাতে সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করে ডাচবাংলা ব্যাংক লি. যার পরিমাণ ১৮১.৩৬ কোটি টাকা।[১৭] তাদের এ ধরনের কার্যক্রম সমাজের সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের কোন কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানও অধিক মূল্যে পণ্য ক্রয় করে কম মূল্যে জনগণের কাছে তাদের সেবা কার্যক্রম পৌঁছে দেয়।

যেমন- টিসিবি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করে। সুতরাং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গেসংশ্লিষ্ট কর্মচারি, তাদের পরিবার, আঞ্চলিক সম্প্রদায় এবং সর্বোপরি সমাজের সদস্যদের জীবনের মান উন্নয়নে প্রতিশ্রুত হওয়াই হলো সিএসআর।[১৮]

উপরের আলোচনার ধারাবাহিকতায় বলা যায় যে, সমাজকে কেন্দ্র করে ব্যবসায় পরিচালিত হয় এবং ব্যবসায়ের কার্যক্রম দ্বারা একটি সমাজ নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় দিক থেকেই প্রভাবিত হতে পারে। তাই বিশ্বায়ন ও আধুনিকায়নের যুগে ব্যবসায় আর্থিক মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সমাজের জন্য জনকল্যাণমূলক ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ এবং নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসকল্পে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মধ্যেই সিএসআর-এর মূল উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটে, যা সবার জন্যই মঙ্গলজনক।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমাজেরই অংশ। সমাজের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য যদি শুধু আর্থিক মুনাফাকেন্দ্রিক হয় তাহলে তা স্বার্থপর বস্তুবাদী মতবাদে পরিণত হবে। ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি তাদের নৈতিক ও সামাজিক আচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে নৈতিক ও সামাজিক দিককে বিবেচনায় নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় সেবামূলক মনোভাব পোষণ করাই শ্রেয়।

সিএসআর-এর পক্ষে সবচেয়ে জোরালো, যৌক্তিক, সময়োপযোগী যুক্তিটি হলো নৈতিক যুক্তি যা প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য। আমেরিকার সান্তা ক্লারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও দর্শন বিভাগের ব্যবসায় নীতিবিদ্যার অধ্যাপক ম্যানুয়াল জি. ভেলাসকোয়েজ তাঁর *Business Ethics : Concepts and Cases* গ্রন্থে বলেন, কোন অন্যায়ের জন্য কাউকে নৈতিকভাবে তখনই দায়ী করা যায় যখন– অ) যদি কোন ব্যক্তি কোন অন্যায় বা অপরাধের অংশ বা সংঘটনে সহায়তা করে বা এটি প্রতিরোধ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা করতে ব্যর্থ হন; আ) এটির পরিণতি সম্পর্কে তিনি ভালোভাবেই অবগত আছেন এবং ই) তিনি স্বাধীন বা স্বেচ্ছায় এটি করেছিলেন।[১৯] আমেরিকার মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক নরম্যান ই. বাউই এবং আমেরিকার রোজমন্ট কলেজ, সেন্টার ফর এথিক্সের পরিচালক ও দর্শনের এমেরিটাস অধ্যাপক রোনাল্ড ফেলিস্ক ডুস্কা তাঁদের *Business Ethics* গ্রন্থে বলেন, নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি কাউকে কোন কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী করতে হয় তাহলে সেখানে কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। যেমন (ক) ন্যায়পরায়ণতা অনুসারে কাজ করা; (খ) অযৌক্তিক ক্ষতি যা পরিহার করা যায় না, এবং (গ) সুনিশ্চিতভাবে ক্ষতি প্রতিরোধ করা।[২০] প্রশ্ন হলো: ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে কি কোন কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী করা যায়? হ্যাঁ, উল্লিখিত শর্তাবলী যদি কোন প্রতিষ্ঠান এড়িয়ে যায় তাহলে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করা যায়। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করার ক্ষেত্রে যেসব যুক্তিসমূহ বিবেচিত হয় তা নিচে আলোচনা করা হলো:[২১]

- প্রতিষ্ঠান তার কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে যেসব সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে তার মধ্যে অন্যতম হলো পরিবেশ দূষণ যা বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমস্যা। অর্থাৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার উৎপাদন ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন ও ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট দূষণ পরিবেশ ও অন্যান্য সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। যেমন কোন একটি এলাকায় ইট ভাটায় ইট তৈরি করা হয়। ইট উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট উপাদানের প্রভাবে বাতাস দূষিত হচ্ছে। বাতাসে দূষণের মাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের শারীরিক, মানসিক, ভৌত অবকাঠামো ও পরিবেশ সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ কারণে সমাজের চাহিদা হলো, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড পরিচালনার কারণে যেহেতু পরিবেশের দূষণ সংঘটিত হয় সেহেতু উক্ত সমস্যা সমাধানের দায়বদ্ধতাও প্রতিষ্ঠানকেই বহন করতে হবে। আবার উক্ত সমস্যা যদি অদূর ভবিষ্যতে উদ্ভূত হয় তাহলেও প্রতিষ্ঠানকেই এটির সমাধানকল্পে এগিয়ে আসতে হবে।
- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সমাজকে ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে থাকে। যেমন উল্লিখিত ইটভাটার উদাহরণটি বিবেচনায় নেওয়া যাক। উক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজে যেমনি ইতিবাচক প্রভাব (যেমন– রাস্তা, দালান, কালভার্ট ইত্যাদি তৈরিতে ইটের ব্যবহার) রয়েছে তেমনি নেতিবাচক প্রভাব (যেমন কালো ধোঁয়ার কারণে সবাই সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত) রয়েছে। ফলে ব্যক্তি দ্বারা উক্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হলেও তা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থেই সংঘটিত হয়েছিল। তাই নৈতিকভাবে এর দায় এড়ানোর কোন সুযোগ প্রতিষ্ঠানের নেই।
- প্রতিষ্ঠানকে সকলের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানকে কেবল শেয়ারমালিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে বিবেচনা করলে চলবে না বরং প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের (যেমন– কর্মকর্তা-কর্মচারি, সরবরাহকারী, ভোক্তা, আঞ্চলিক সম্প্রদায়) স্বার্থ সম্পর্কিত দিকটিও বিবেচনা করতে হবে। কারণ অংশীজনেরাও প্রতিষ্ঠানের অংশ এবং ব্যবসায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদেরও অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। যেমন– কোভিড-১৯এর কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় অনেক মালিক পক্ষ তাঁদের কর্মচারিদের বেতন-ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পতিত হয়। এরূপ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অনেক মালিক পক্ষ সরকারের প্রণোদনা গ্রহণের মাধ্যমে শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সমুদয় বেতন ভাতা পরিশোধ করতে সক্ষম হয়েছে।

উপরের যুক্তিগুলো বিবেচনা করে বলা যায়, প্রাকৃতিক, স্থায়ী, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে সমাজের প্রতি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালনের দায়বদ্ধতা রয়েছে যা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও অস্বীকার করা যায় না। নিম্নে সিএসআর-এর পক্ষে অন্যান্য যুক্তিসমূহ আলোচনা করা হলো:

- বর্তমানে বিশ্বজুড়ে করোনা পরিস্থিতির কারণে সমসাময়িক বিশ্বে সিএসআর-এর প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত শক্তিশালী আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ ব্যবসায় সম্পর্কে মানুষের প্রত্যাশার দৃষ্টিভঙ্গিগত ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং সমাজের মৌলিক চাহিদা, প্রত্যাশা ও নৈতিক দিক বিবেচনায় নিয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘ সময়ব্যাপী টিকে থাকার জন্য তাদের কর্মকাণ্ডে সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দেয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন কোভিড-১৯এর কারণে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য খাতসহ অন্যান্য খাতের সংকটপূর্ণ অবস্থা আমরা লক্ষ্য করেছি। এরূপ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন আর্থিক খাত বিশেষ করে ব্যাংকসমূহ করোনার সংক্রমণরোধে স্বাস্থ্য খাতের পাশে দাঁড়িয়েছে। ২০১৯ সালের জুলাই-ডিসেম্বর সেশনে স্বাস্থ্য খাতে সিএসআর-এর ব্যয় ছিল ৫০ কোটি টাকা। ২০২০ সালের জানুয়ারি-জুনে উক্ত ব্যয় বেড়ে ৯৬ কোটি টাকা হয়েছিল যা পূর্ববর্তী সেশনের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।[২২] তাদের এই কর্মকাণ্ডে জনপ্রত্যাশার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে যা সমাজ গঠনের দিকটিকে ইঙ্গিত করছে।
- সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যখন কোনো প্রতিষ্ঠান অবদান রাখতে সচেষ্ট হয় তখন সমাজের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান যদি সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারিদের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে প্রতারণা করা, ফাঁকি দেওয়া ও অনুপস্থিত থাকার প্রবণতা হ্রাস পায়। ফলে সমাজের উন্নয়ন হয়, সেই সাথে সমাজে সংঘটিত অপরাধের সংখ্যাও হ্রাস পায় এবং ব্যবসায়ের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভবনা তৈরি হয়। অপরাধ কমে গেলে নিরাপত্তা ব্যয়ও কমে আসে ও পুলিশি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্ধারিত করও কমে আসে। তাই সার্থক, ফলপ্রসূ উত্তম সমাজ বিনির্মাণে সিএসআর যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে তা অনস্বীকার্য। ব্রাক ব্যাংক দীর্ঘদিন সুনামের সাথে ব্যবসায় পরিচালনার পাশাপাশি নানারকম সামাজিক দায়বদ্ধতাও পালন করছে। বাংলাদেশে ব্রাক ব্যাংক 'উচ্চশিক্ষার স্বপ্নপূরণ'-এ মূলনীতির উপর ভিত্তি করে মেধাবী ও অর্থনৈতিকভাবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করে আসছে। ব্রাক ব্যাংক শিক্ষার্থীদের জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা করতে তাঁরা আইনগতভাবে বাধ্য ছিল না। তবে প্রতিষ্ঠানটি নৈতিক ও জনহিতৈষী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাজটি সম্পন্ন করেছে বলে প্রতীয়মান হয়। ব্রাক ব্যাংক এরূপ কাজের মাধ্যমে যেমন সফলভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করছে তেমনি সমাজের কিছু অস্বচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থী উপকৃত হচ্ছেন। ব্রাক ব্যাংকের এরূপ কার্যক্রম সামাজিক দায়িত্ব পালনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলাদেশে আরও অনেক বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা শিক্ষাসহ বিভিন্ন খাতে অর্থ ব্যয় করে সিএসআর করে থাকেন। জানুয়ারি-জুন ২০২২ ভিত্তিক সিএসআর-এর কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে ছক-১ ও লেখচিত্র-১এর মাধ্যমে তুলনামূলক বিশ্লেষণে উপস্থাপন করা হলো:[২৩]

ছক-১: ব্যাংকসমূহের জানুয়ারি-জুন ২০২২ ভিত্তিক CSR কার্যক্রমের বিবরণী

ক্রম.	ব্যাংকসমূহের নাম	শিক্ষা	স্বাস্থ্য	পরিবেশ এবং জলবায়ু	আয় উৎসারী কার্যক্রম	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	অব-কাঠামো উন্নয়ন	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	অন্যান্য	মোট	শিক্ষা খাতে ব্যয়ের হার (%)	স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের হার (%)	পরিবেশ এবং জলবায়ু খাতে ব্যয়ের হার (%)
		পরিমাণ (কোটি টাকায়)											
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	০.২৮৩৩	০.২৩৯০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০১৫০	০.০৫৪০	০.৫৯১৩	৪৭.৯১	৪০.৪২	০.০০
২	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	০.২৫০০	০.০৪০০	০.০০০০	০.০০০০	৩.৭৮০০	০.০২০০	০.০০০০	০.০০০০	৪.০৯০০	৬.১১	০.৯৮	০.০০
৩	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	০.৬৪৩৪	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	১.৯৮০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০১৮০	২.৬৪১৪	২৪.৩৬	০.০০	০.০০
৪	রূপালী ব্যাংক লিমিটেড	০.২৪৪০	০.২০৫০	০.০০০০	০.০০০০	১.৯৩৭০	০.০০০০	০.০০০০	০.০৬০০	২.৪৪৬০	৯.৯৮	৮.৩৮	০.০০
৫	বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০৬০০	০.০৬০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮	বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	০.০১৯৫	০.০২৯০	০.০০০০	০.০০১৫	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০২০	০.০৫২০	৩৭.৫০	৫৫.৭৭	০.০০
৯	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	০.০১২৫	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০৬৫০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০১৯	০.০৭৯৪	১৫.৭৪	০.০০	০.০০
১০	এবি ব্যাংক লিমিটেড	০.১২০০	০.০৬০০	০.০০০০	০.০০০০	০.১০২৮	০.০০০০	০.৭০০০	০.০০০০	০.৯৮২৮	১২.২১	৬.১১	০.০০
১১	আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২.৩৩১৬	২.১৬৬১	১.৯১৯১	০.০০০০	১২.২০১০	০.০০০০	১.২০০০	০.০০০০	১৯.৮১৭৮	১১.৭৭	১০.৯৩	৯.৬৮
১২	ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	০.৬৭২০	২.৮২০০	০.০০০০	০.০০০০	২.৭৫০০	০.২০০০	০.২৮০০	১.৬৯০০	৮.৪১২০	৭.৯৯	৩৩.৫২	০.০০
১৩	বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪	বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫	ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড	১.৩৩১৮	০.১১২৬	০.০০০০	০.০০০০	১৩.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০২৫০	১৪.৪৬৯৪	৯.২০	০.৭৮	০.০০
১৬	সিটিজেনস্ ব্যাংক লিমিটেড	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৭	কমিউনিটি ব্যাংক লিমিটেড	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৮	ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	১.০৯৫০	০.৪৫২০	০.০০০০	০.০০০০	১২.৯৩২০	০.০০০০	০.৪৫০০	০.০৩২০	১৪.৯৬১০	৭.৩২	৩.০২	০.০০

ক্রম.	ব্যাংকসমূহের নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৯	ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড	২৫.৩৪০০	২.৫৪০০	০.০০০০	০.০০০০	১০.০০০০	১.০০০০	০.০০০০	০.১৯০০	৩৯.০৭০০	৬৪.৮৬	৬.৫০	০.০০
২০	ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড	০.৪৩০০	০.০০২৫	০.০০০০	০.০০০০	১০.০০০০	০.০০০০	০.৭২০০	০.০০০০	১১.১৫২৫	৩.৮৬	০.০২	০.০০
২১	এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড	৯.৬৯০০	১.৬২০০	০.০০০০	০.০০০০	১৪.৮৩০০	০.০০০০	০.৮৬০০	১.৩৯০০	২৮.৩৯০০	৩৪.১৩	৫.৭১	০.০০
২২	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২.৬০০০	২.৭০০০	১.৮০০০	০.০৫০০	০.৫০০০	০.০৫০০	০.৭০০০	০.০০০০	৮.৪০০০	৩০.৯৫	৩২.১৪	২১.৪৩
২৩	আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড	০.০০০০	০.০১০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০১০০	০.০০	১০০.০০	০.০০
২৪	আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড	১.৭০০০	০.১২০০	০.০০০০	০.০০০০	১০.০০০০	০.০০০০	০.৬০০০	০.০৪০০	১২.৪৬০০	১৩.৬৪	০.৯৬	০.০০
২৫	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	৪.৫৮৩৭	০.৮০২০	২.০০০০	০.০০০০	১৯৪.৬১৮২	০.০০০০	০.০০০০	০.১৯১০	২০২.১৯৪৯	২.২৭	০.৪০	০.৯৯
২৬	যমুনা ব্যাংক লিমিটেড	১.৯৪০০	৬.০১০০	২.৪৪০০	০.০২০০	১.০৯০০	০.০০০০	০.০৭০০	০.৩৪০০	১১.৯১০০	১৬.২৯	৫০.৪৬	২০.৪৯
২৭	মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড	০.০০০০	০.০১৬০	০.০০০০	০.০০০০	০.৩১৫০	০.০০০০	০.০০৪৬	০.০০০০	০.৩৩৫৬	০.০০	৪.৭৭	০.০০
২৮	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড	২.৬৫০০	৩.৮৯০০	০.১৫০০	০.০০০০	১৩.৪৫০০	০.০০০০	০.০৪৮০	১.৯৮০০	২২.১৬৮০	১১.৯৫	১৭.৫৫	০.৬৮
২৯	মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড	০.০৩০০	০.০২০০	০.০০০০	০.০০০০	২.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	২.০৫০০	১.৪৬	০.৯৮	০.০০
৩০	মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড	০.৮৭০০	০.২০১৫	০.০০০০	০.০০০০	২.৫৪০০	০.০০০০	১.৭২০০	০.১৮৭৫	৫.৫১৯০	১৫.৭৬	৩.৬৫	০.০০
৩১	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	০.৮০০০	০.৩৮০০	০.০৩০০	০.০৮০০	১১.৩৪০০	০.০০০০	০.৭০০০	০.৩৮০০	১৩.৭১০০	৫.৮৪	২.৭৭	০.২২
৩২	ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	৩.৪১৫৫	১.১৯৬৫	০.০০০০	০.০০০০	০.৬৬০৪	০.০০৫০	০.০০০০	০.০০০০	৫.২৭৭৪	৬৪.৭২	২২.৬৭	০.০০
৩৩	এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড	০.২৮৮৬	০.১০৬০	০.০০০০	০.০০০০	১২.৮০৯৫	০.০৪০০	০.০০০০	০.০০০০	১৩.২৪৪১	২.১৮	০.৮০	০.০০
৩৪	এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড	০.২৭৫৪	০.০৬৫০	০.০০০০	০.০০০০	৫.২০৪২	০.০০০০	০.৭০০০	০.০০০০	৬.২৪৪৬	৪.৪১	১.০৪	০.০০
৩৫	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	০.১১৪০	০.৮৯৪০	১.০০০০	১.৩৪১৭	৪.০০০০	০.০০০০	০.৭৪০০	০.০৬৫৮	৮.১৫৫৫	১.৪০	১০.৯৬	১২.২৬
৩৬	গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	০.৬৮৫৯	০.০১৬৫	০.০০০০	০.০০০০	২.০৪৩৮	০.০০০০	০.৭৫৯১	০.০০১৫	৩.৫০৬৮	১৯.৫৬	০.৪৭	০.০০
৩৭	ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড	০.৩৫০০	০.০১২০	০.০০০০	০.০০০০	০.০৩১০	০.০০০০	০.০০০০	০.০২১০	০.৪১৪০	৮৪.৫৪	২.৯০	০.০০
৩৮	পদ্মা ব্যাংক লিমিটেড	০.০০০০	০.১২০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.১২০০	০.০০	১০০.০০	০.০০
৩৯	প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	২.১১০০	২.৪৬০০	০.০০০০	০.০৬০০	১০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০৩৪	১৪.৬৩৩৪	১৪.৪২	১৬.৮১	০.০০
৪০	পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	০.৭০০০	১.০২২০	০.০১০০	০.০০০০	১০.৫০০০	০.০০০০	০.০৩৯১	০.০০০০	১২.২৭১১	৫.৭০	৮.৩৩	০.০৮
৪১	সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	০.০১০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	২.০০২৫	০.০০০০	০.০৫০০	০.০০০০	২.০৬২৫	০.৪৮	০.০০	০.০০
৪২	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৩.৪৮০০	৬.৪৯০০	০.৮২০০	০.০০০০	১০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.৮৬০০	২১.৬৫০০	১৬.০৭	২৯.৯৮	৩.৭৯
৪৩	সীমান্ত ব্যাংক লিমিটেড	০.০৭০০	০.৪০১০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.৪৭১০	১৪.৮৬	৮৫.১৪	০.০০
৪৪	সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	০.৫১০০	২.৫৭৪০	০.০০০০	০.০০০০	৫.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০৫৯০	৮.১৪৩০	৬.২৬	৩১.৬১	০.০০

ক্রম.	ব্যাংকসমূহের নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৪৫	সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড	১.৮৩০০	০.৩৯০০	০.০০০০	০.০৫০০	৬.০৩০০	০.০৪০০	১.৩১০০	০.১১০০	৯.৭৬০০	১৮.৭৫	৪.০০	০.০০
৪৬	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	০.৬০০০	০.১৮০০	০.০০০০	০.০০০০	১০.০০০০	০.০০০০	০.৭০০০	০.০০০০	১১.৪৮০০	৫.২৩	১.৫৭	০.০০
৪৭	দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড	১.১২০০	১.৩৪০০	০.০১০০	০.০৬০০	১০.৩৫০০	০.০০০০	০.৩০০০	০.০৬০০	১৩.২৪০০	৮.৪৬	১০.১২	০.০৮
৪৮	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	০.০৩০০	০.০১৫০	০.০০০০	০.০০০০	২৯.২০৫০	০.০০০০	০.০০৫০	০.৭০০০	২৯.৯৫৫০	০.১০	০.০৫	০.০০
৪৯	ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	০.০০০০	৫.০১০০	০.০০০০	০.০০০০	১.৮৯০০	০.০০০০	০.০০০০	১.৩৮০০	৮.২৮০০	০.০০	৬০.৫১	০.০০
৫০	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	০.৫৫০০	০.১২০০	০.০০০০	০.০০০০	১০.০০০০	০.০০০০	০.৯৬০০	০.০০০০	১১.৬৩০০	৪.৭৩	১.০৩	০.০০
৫১	ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড	০.৮৯৮৫	০.১৩৫৫	০.০০০০	০.০০০০	২.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০৭৯৫	৩.১১৩৫	২৮.৮৬	৪.৩৫	০.০০
৫২	উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	০.১৫৫০	০.০০৭৫	০.০০০০	০.০০০০	১০.০২৪০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০৩৫	১০.১৯০০	১.৫২	০.০৭	০.০০
৫৩	ব্যাংক আলফালাহ্ লিমিটেড	০.০২০০	০.১৪৮০	০.০০০০	০.০০০০	০.০৪৫০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.২১৩০	৯.৩৯	৬৯.৪৮	০.০০
৫৪	কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন	০.০৫০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০০	০.০০০০০	০.০৫০০	১০০.০০	০.০০	০.০০
৫৫	সিটিব্যাংক এনএ	০.০৬০০	০.০৬০০	০.০৪০০	০.০০০০	০.০৫০০	০.০০০০	০.০২৫০০	০.০০০০০	০.২৩৫০	২৫.৫৩	২৫.৫৩	১৭.০২
৫৬	হাবিব ব্যাংক লিমিটেড	০.০১০০	০.০০০০	০.০০০৮	০.০০০০	০.০২১৫	০.০০০০	০.০০০০	০.০০৯২	০.০৪১৫	২৪.১২	০.০০	১.৮১
৫৭	এইচএসবিসি	১.৮০০০	০.৩০০০	০.৭০০০	০.০৬০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০০	০.০৩০০০	২.৮৯০০	৬২.২৮	১০.৩৮	২৪.২২
৫৮	ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫৯	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	০.০৮৫০	০.০০৫৭	০.০০০০	০.০০০০	০.০১৫২	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.১০৫৯	৮০.২৬	৫.৩৮	০.০০
৬০	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	৩.১৫০৮	২.৫১৩৯	০.১৭৩৪	০.০০০০	০.১৯১০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	৬.০২৯১	৫২.২৬	৪১.৭০	২.৮৮
৬১	উরি ব্যাংক	০.০০৯০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০৯০	১০০.০০	০.০০	০.০০
	সর্বমোট	**৮০.০১৪৫**	**৫০.০১৮৩**	**১১.০৯৩২**	**১.৭২৩২**	**৪৬১.৫০৪২**	**১.৩৫৫০**	**১৩.৬৫৫৮**	**১০.০২৪৩**	**৬২৯.৩৮৮৪**			
	শতকরা হার (%)	**১২.৭১**	**৭.৯৫**	**১.৭৬**	**০.২৭**	**৭৩.৩৩**	**০.২২**	**২.১৭**	**১.৫৯**	**১০০.০০**			

জানুয়ারি-জুন ২০২২ ভিত্তিক সিএসআর-এর ছক-১ ও লেখচিত্র-১এর তথ্য-উপাত্ত তুলনা করলে যেসব বিষয় পরিলক্ষিত হয় তা হলো উক্ত সময়ে দেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন খাতে সিএসআর-এর জন্য মোট ৬২৯.৩৯ কোটি (ছয়শত ঊনত্রিশ কোটি ঊনচল্লিশ লক্ষ) টাকা ব্যয় করে। ব্যয়কৃত অর্থের মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা খাতে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করা হয় যার পরিমাণ ৪৬১.৫০ কোটি টাকা যা শতকরা হারে সিএসআর-এর মোট ব্যয়ের ৭৩.৩৩%। এ খাতে ব্যয় বেশি হওয়ার কারণ হলো ২০২২ সালে সিলেট ও সুনামগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় ভয়াবহ বন্যা সংঘটিত হয়।

লেখচিত্র-১: জানুয়ারি-জুন ২০২২ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের খাতওয়ারি CSR ব্যয়

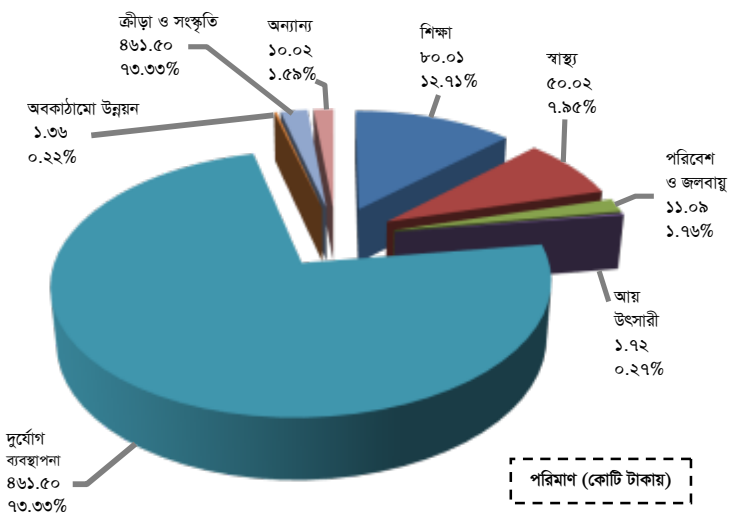

উৎস: তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের CSR কার্যক্রমের ষাণ্মাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-জুন ২০২২), সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা, পৃ. ৪

উক্ত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে খাদ্য, ত্রাণসামগ্রী বিতরণ এবং দেশের উত্তরাঞ্চলসহ অন্যান্য অঞ্চলে শীতার্ত ও দরিদ্র মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়, যার সিংহভাগ প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যয় করা হয়েছে শিক্ষাখাতে যার পরিমাণ ৮০.০১ কোটি টাকা যা সিএসআর-এর ব্যয়ের ১২.৭১%। শিক্ষাখাতে ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি, শিক্ষা উপকরণ এবং শিক্ষাখাতের অবকাঠামো উন্নয়নে সিএসআর-এর অর্থ ব্যয় করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ব্যাংক প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

তহবিলেও অনুদান প্রদান করেছে। তৃতীয় হলো স্বাস্থ্যখাত। এখানে মোট ৫০.০২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা শতকরা ৭.৯৫%। এছাড়া ব্যাংকসমূহ স্বাস্থ্যখাতে ব্যক্তি পর্যায়ে হতদরিদ্র/অসহায়/সুবিধাবঞ্চিত/প্রতিবন্ধী/বিভিন্ন দুরারোগ্য ও জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান। বিনামূল্যে মেডিক্যাল ক্যাম্প ও ক্লিনিক্যাল সেবা প্রদান। বিনামূল্যে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা সামগ্রী বিতরণ এবং চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ অনুদান দিয়েছে।[২৪] জানুয়ারি-জুন ২০২২ ভিত্তিক সিএসআর-এর কার্যক্রমের সঙ্গে জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১ ভিত্তিক সিএসআর-এর একটি তুলনামূলক বিবরণী লেখচিত্র-২ এর মাধ্যমে দেখানো হলো:[২৫]

লেখচিত্র-২: জানুয়ারি-জুন ২০২২ এবং জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১ ষান্মাসিক ভিত্তিক খাতওয়ারি CSR ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র

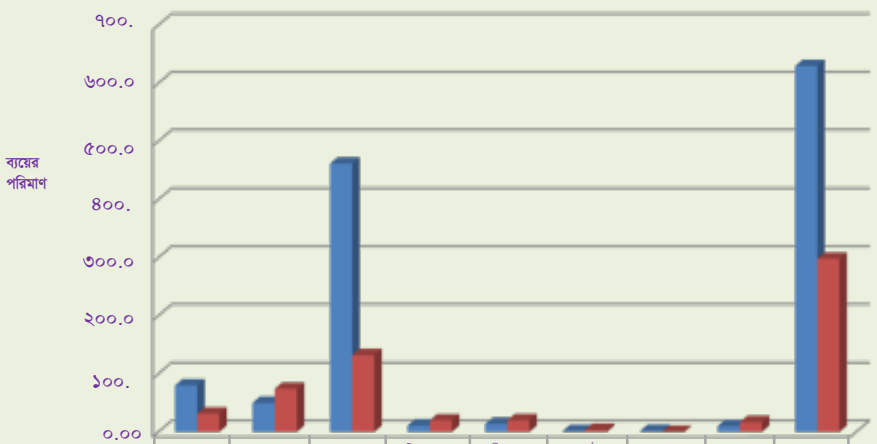

	শিক্ষা	স্বাস্থ্য	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	পরিবেশ ও জলবায়ু	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	অবকাঠামো উন্নয়ন	আয় উৎসারী	অন্যান্য	মোট
জানুয়ারি/জুন	৮০.০১	৫০.০২	৪৬১.৫০	১১.০৯	১৩.৬৬	১.৩৬	১.৭২	১০.০২	৬২৯.৩৯
জুলাই/ডিসেম্বর	৩১.৩২	৭৪.১২	১৩২.২৩	১৯.৭৭	১৯.৯০	৩.৩৪	০.২০	১৬.৯১	২৯৭.৭৯

উপরের লেখচিত্র-২এ জানুয়ারি-জুন ২০২২ এবং জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১ ভিত্তিক সিএসআর-এর তুলনা উপস্থাপন করা হয়েছে যেখানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা খাতে জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১ এ ব্যয় হয়েছে ১৩২.২৩ কোটি টাকা। এ খাতে ব্যাংকসমূহের সিএসআর ব্যয় পূর্বের তুলনায় ৩.৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে জানুয়ারি-জুন ২০২২ ষাণ্মাসিকে মোট ৪৬১.৫০ কোটি টাকা হয়েছে। পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে যে বিভিন্ন জেলায় বন্যার কারণে এ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া জানুয়ারি-জুন ২০২২ ষাণ্মাসিকে জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১ ষাণ্মাসিকের তুলনায় শিক্ষা খাতে সিএআর-এর ব্যয় ২.৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বাস্থ্যখাতে আলোচ্য ষাণ্মাসিকে সিএসআর-এর ব্যয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী ষাণ্মাসিকের তুলনায় উল্লেখ্যযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।[২৬]

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সামাজিক দায়িত্ব পালনে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য যা বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এবার সামাজিক দায়বদ্ধতার বিপক্ষে যুক্তিসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

প্রাচীন যুগে ব্যবসায়ীদের মধ্যে এক ধরনের নীতিবোধ প্রচলিত ছিল, 'The business of business is business.'[২৭] এ বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে অনেকেই ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টিকে অস্বীকার করেন। তাঁরা সিএসআর বিপক্ষে নিম্নবর্ণিত বিবিধ যুক্তি প্রদান করেন।

সিএসআর-এর বিপক্ষে মিল্টন ফ্রিডম্যানের মূল যুক্তিটি কর্পোরেট নির্বাহীদের সাথে সম্পৃক্ত। তাঁর প্রদত্ত যুক্তিটি করারোপ যুক্তি (Taxation argument) নামে পরিচিত। তিনি মনে করেনকর্পোরেট নির্বাহীগণ যখন বিনা অনুমতিতে অন্যের অর্থ ব্যবহার করে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করেন তখন স্টকহোল্ডার/স্টেকহোল্ডারদের মুনাফা হ্রাস পায়, ভোক্তা/ক্রেতা সাধারণের নিকট দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়/কর্মচারির বেতন হ্রাস যায়। অর্থাৎ নির্বাহীগণ স্টকহোল্ডার/স্টেকহোল্ডার/ভোক্তার/কর্মচারিদের অর্থ খরচ করছেন যা ব্যয় সংকোচনের নামে অন্যদের উপর এক প্রকারের করারোপ। আমরা জানি কর হলো সরকার ও রাষ্ট্র কর্তৃক জনগণের উপর আরোপিত একটি দায়িত্ব যা কেবলমাত্র নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণের রয়েছে।[২৮] তাই মিল্টন ফ্রিডম্যান মনে করেন যে, 'কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা' বিষয়টি নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। তাঁর যুক্তিগুলো মোটামুটি এরূপ:[২৯]

- মিল্টন ফ্রিডম্যান তাঁর "The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits" প্রবন্ধে বলেন, 'নৈতিকদায়বদ্ধতা' ধারণাটি কেবলমাত্র ব্যক্তি মানুষের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায়। কারণ প্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেশন যেহেতু স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হয় না এবং এটি ব্যক্তি মানুষের সিদ্ধান্তের আলোকে পরিচালিত হয় সেহেতু সিদ্ধান্তের ভুলের মাশুল প্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেশনকে নয় বরং ব্যক্তিকেই প্রদান করতে হবে।[৩০] সুতরাং নৈতিকভাবে এই কাজের দায় ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপরই বর্তায়।
- তিনি মনে করেন সমাজ বা রাষ্ট্রে যে প্রচলিত আইনি কাঠামো রয়েছে তা অনুসরণ করে নির্বাহীগণ ব্যবসায় পরিচালনা করে মুনাফা অর্জন করবে– এটিই তাঁদের দায়বদ্ধতা। উক্ত কাজ ব্যতিরেকে নির্বাহীগণ যদি অন্য কাজে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করেন, তাহলে তা হবে বিভিন্ন শ্রেণি বা গোষ্ঠী (স্টকহোল্ডার, শেয়ারহোল্ডার ও স্টেকহোল্ডার) কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব লঙ্ঘনের শামিল কিম্বা অনুমতি ব্যতিরেকে যদি অর্থ ব্যয় করেন তাহলে এটি হবে উক্ত শ্রেণি বা গোষ্ঠীর অর্থ চুরি করার শামিল যা কোনভাবেই কাম্য নয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত শ্রেণি বা গোষ্ঠীঅর্থ বিনিয়োগ করে থাকেন কাঙ্ক্ষিত লভ্যাংশ পাওয়ার জন্যই, সিএসআর পালনের নিমিত্তে নয়।

- মিল্টন ফ্রিডম্যান মনে করেন রাষ্ট্র বা সমাজের জন্য কোনটি সর্বাধিক স্বার্থ রক্ষা করে অথবা রাষ্ট্র বা সমাজের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তদানুযায়ী সমাধান করা একজন ব্যবস্থাপকের দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বরং তা রাষ্ট্র বা সরকারের বিবেচ্য বিষয়। তাছাড়া ব্যবস্থাপক উক্ত কাজ সম্পর্কে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত/গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত/দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষও নন। সুতরাং দায়বদ্ধতার নামে সামাজিক সমস্যা সমাধানকল্পে প্রতিষ্ঠানের অর্থ খরচ করা অনৈতিক ও অনধিকার চর্চারই নামান্তর।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, মিল্টন ফ্রিডম্যান মনে করেন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূল দায়িত্ব হলে আইনসম্মতভাবে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মুনাফা লাভ করা। তাছাড়া তিনি আরও মনে করেন ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনে যে অনুদান প্রধান করেন তা মূলত মানবকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে বিবেচিত না হয়ে মুনাফা লাভের ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় যা কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। অর্থাৎ ব্যবসায়ীগণ মানবকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের ছদ্মাবরণে মুনাফালাভের প্রসঙ্গটিকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। তাই তিনি মনে করেন নৈতিক দায়বদ্ধতা পালনের ক্ষেত্রে অন্য কোন উদ্দেশ্য বিবেচনায় আনা গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে সিএসআর যথার্থ নয়। মিল্টন ফ্রিডম্যান মানবকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের (সিএসআর-এর ছদ্মাবরণে মুনাফালাভ) যে উদাহরণ দিয়েছেন তা হয়ত কতিপয় বিশেষ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে কিন্তু তা সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ ফ্রিডম্যানের বক্তব্য বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করলে তা প্রত্যয়যোগ্য কিন্তু সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে তাঁর বক্তব্য চূড়ান্ত নয়। কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সিএসআর পালন করতে হয় নৈতিক ও মানবকল্যাণমূলক কাজের প্রতি দৃষ্টি রেখে যেখানে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়টি মুখ্য হিসেবে বিবেচ্য নয়। যেমন বিশ্বের খ্যাতনামা ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঔষধ সরবরাহ করে থাকে। ব্যবসায় অধিক মুনাফা অর্জন সর্বদা ব্যবসায় সফলতার যথাযথ প্রক্রিয়া নয়। অর্থাৎ মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবসায় সফলতা আসে– এটি সত্য; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মুনাফা অর্জন ব্যতিরেকে পরোক্ষভাবে টেকসই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দীর্ঘকালীন মুনাফা অর্জন সম্ভব হতে পারে। প্রসঙ্গত বিশ্বের খ্যাতনামা ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মার্ক এন্ড কোম্পানির উদাহরণ দেওয়া যায়। এই প্রতিষ্ঠানটি বিগত ১৫ বছর ৩২টি দেশের ৩০ মিলিয়ন লোককে বিনামূল্যে চিকিৎসা দিয়ে আসছিল।[৩১] উক্ত প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জনের বিষয়টিকে গৌণ মনে করে নৈতিকতা ও মানবিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে আসছিল। ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠান পরবর্তী সময়ে সুনামের সাথে দীর্ঘকালীন ব্যবসায় করার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়েছে যা আজও চলমান। আশির দশকের দিকে আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার কিছু অঞ্চলের নদীসমূহে কালো মাছির ন্যায় এক ধরনের ক্ষুদ্র পতঙ্গ ছিল। এই পতঙ্গ মানুষের শরীরের কামড় দেয়ার কারণে চামড়ার নিচে এক ধরনের জীবাণু তৈরি হতো যা চুলকানির প্রদাহ

সৃষ্টির মাধ্যমে ঐ স্থানে ক্ষতের সৃষ্টি করত। এক পর্যায়ে তা মানুষের চোখেও সংক্রমিত হত এবং চোখ অন্ধ করে দিত যা 'River Blindness' রোগ নামে পরিচিত। এসব অঞ্চলের প্রায় এক কোটি আশি লক্ষ লোক এ রোগে আক্রান্ত হয়। উক্ত রোগের এরূপ প্রাদুর্ভাবের কারণে ঐসব এলাকায় বসবাসরত জনগণের একটি বড় অংশ তাদের বাসস্থান ত্যাগ করে অভিবাসী হতে বাধ্য হয়েছিল। এমনকি অনেকে অসহনীয় যন্ত্রণার কারণে আত্মহত্যাও করেছিল। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৯ সালে আমেরিকার বিখ্যাত মার্ক এন্ড কোম্পানির একজন গবেষক ও বিজ্ঞানী উইলিয়াম ক্যাম্পবেল আবিষ্কার করলেন যে তাদের কোম্পানি দ্বারা প্রস্তুতকৃত প্রাণীর চিকিৎসায় ব্যবহৃত ইভারম্যাকটিন নামক ঔষধটির যদি কিছু গুণগত মান সামান্য পরিবর্তন করা সম্ভব হয় তাহলে এর মাধ্যমে 'River Blindness' নামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব। উইলিয়াম ক্যাম্পবেল এবং তাঁর গবেষকদল উক্ত প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ড. পি. রয় ভেইজলসকে বর্তমানে প্রাণীদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত টীকা বা ভেকসিনটিকে মানব সংস্করণ উপযোগী করে প্রস্তুত করার অনুমতি দেওয়ার অনুরোধ করেন। শত প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে দীর্ঘ সাত বছর গবেষণা করে ইভারম্যাকটিন নামক ঔষধটিকে ম্যাকটিজান নামক ঔষধে রূপান্তরিত করে তিনি মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে তোলেন। আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকায় বিস্তৃত 'River Blindnes' নামক রোগের সমস্যা দূরীকরণের জন্য উক্ত ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ঔষধ তৈরি করে এবং সেখানে তা বিনামূল্যে বিতরণ করে। জনগণকে এ সেবা প্রদান করতে গিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠান কয়েক মিলিয়ন ডলার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকিরও মোকাবেলা করতে হয়েছিল। উক্ত প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ড. পি. রয় ভেইজলসকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আপনি এত বড় ব্যবসায়িক ঝুঁকি কেন নিয়েছিলেন? তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের গবেষকগণ যখন আবিষ্কার করলেন যে বর্তমানে প্রাণীদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ভেকসিনটিকে মানব সংস্করণে রূপান্তর করে ঐ এলাকার মানুষকে 'River Blindness' নামক রোগ থেকে মুক্তি দেয়া সম্ভব তখন আমরা নৈতিকভাবে সেটা করতেই বাধ্য হয়েছিলাম এবং এক্ষেত্রে আর্থিক ঝুঁকিটা ছিল গৌণ। পরবর্তী সময়ে উক্ত প্রধান নির্বাহী তাঁর প্রতিষ্ঠানের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কাজে জাপানে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে দেখতে পান যে, মার্ক ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠানটি জাপানের বাজারে সর্বোচ্চ ঔষধ বিক্রয়কারী জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানে বিস্তার লাভ করা যক্ষ্মা রোগ থেকে সেখানকার মানুষকে মুক্তি দেয়ার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান বিনা মূল্যে স্ট্রেপটোমাইসিন ঔষধ সরবরাহ করে উক্ত রোগ নিরাময়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল এবং সেটা করা হয়েছিল নৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবেই।[৩২]

সিএসআর-এর বিপক্ষে মিল্টন ফ্রিডম্যানের করারোপ যুক্তি ছাড়াও ব্যবসায় নীতিবিদ্যার অনেক মনীষী এটির বিপক্ষে আরও যুক্তি উপস্থাপন করেন।

- অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, আর্থিক মুনাফা অর্জন হলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়বদ্ধতা যা পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি মুখ্য এই দায়বদ্ধতাকে কম গুরুত্ব দিয়ে সামাজিক লক্ষ্য পূরণে অধিক মনোযোগী হয় তাহলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর তাদের ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই প্রতিষ্ঠানগুলো যদি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক– দুই দিকেই তাদের দৃষ্টি মনোনিবেশ করে তাহলে তারা কোনো ধরনের লক্ষ্য পূরণেই সক্ষম হবে না এবং জনগণের নিকট ঐ প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে। এটির ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক প্রকল্পের 'বলির পাঠা'য় পরিগণিত হওয়ার সমূহ সম্ভবনা রয়েছে যা মোটেই কাম্য নয়।[৩৩]
- বিশ্ব সভ্যতার ক্রমোন্নতির কারণে যেসব প্রতিষ্ঠান সমাজে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা ভোগ করে সেসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম হলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র, রাজনীতি, নির্বাচন, হাসপাতাল, শিক্ষা, গৃহনির্মাণ, সমাজের সর্বত্র ব্যবসায়ের প্রভাব বিদ্যমান। তাই ব্যবসায় সংগঠনগুলোর উপর যদি সামাজিক কার্যাবলির দায়িত্বও অর্পণ করা হয় তাহলে তারা মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতাভোগী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পাশাপাশি সমাজের অন্যান্য স্বাধীন প্রতিষ্ঠান যেমন সরকার, সংবাদ মাধ্যম, প্রিন্ট মিডিয়া ইত্যাদির অস্তিত্বও সংকটাপণ্ন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সামাজিক দায়বদ্ধতার নামে তাদেরকে ক্ষমতায়ন করা হলে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য প্রত্যাশিত ফল নাও আসতে পারে।[৩৪]

ব্যসবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে সমাজের সম্পর্ক

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে (আইনগত, নৈতিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ) ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য সমাজের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন প্রতিটি ব্যক্তিই কেউ শ্রমিক, কেউ পণ্য প্রস্তুতকারক, কেউ ভোক্তা হিসেবে বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেকের ভূমিকাই প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[৩৫] তাই প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি বিভিন্ন শ্রেণি-গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রেখে পরিচালিত হতে ব্যর্থ হয় তাহলে তাদের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তাই বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে পাশ কাটিয়ে ভবিষ্যতে এ ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য মুনাফা অর্জন ও টেকসই ব্যবসায় পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব। ফলে দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবসায় পরিচালনা করার জন্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-গোষ্ঠী যেমন কর্মকর্তা/কর্মচারি, ভোক্তা বা ক্রেতা, পাইকারি বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা, সম্প্রদায় প্রভৃতির সঙ্গে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সেতুবন্ধন প্রয়োজন। যেমন প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্মচারির দায়বদ্ধতা হলো বিশ্বস্ততা, কর্তব্যপরায়ণতা, আনুগত্য, আন্তরিকতা, দক্ষতা, নিষ্ঠা ও সততার সাথে সর্বোচ্চ সামর্থ্যের মাধ্যমে অবদান রাখা এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য হলো কর্মচারিদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ প্রদান, ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান, পেশাগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, পেশাগত মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মানসম্মত কাঁচামাল, বিভিন্ন উপকরণ, সেবা প্রভৃতি প্রদানের মাধ্যমে দায়বদ্ধতা পালন করে থাকে

এবং প্রতিষ্ঠান পূর্বনির্ধারিত শর্তানুযায়ী ন্যায্যমূল্য পরিশোধ করে কর্তব্য পালন করে। এভাবে প্রত্যেকেই স্বীয় দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক অটুট রেখে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার চেষ্টা করে। পরিণতিতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয় যাকে আমরা 'উভয়ের জন্য লাভজনক অবস্থা' হিসেবে অভিহিত করব।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, নৈতিক ও মানবকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি রেখে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হয় যেখানে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়টি গৌণ হিসেবে বিবেচিত, যা আলোচ্য প্রবন্ধে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তাই ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ যেমন স্টকহোল্ডার, স্টেকহোল্ডার, কর্মকর্তা-কর্মচারি, সাধারণ ক্রেতা-ভোক্তা, বিক্রেতা, সরবরাহকারী ইত্যাদির অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নৈতিকভাবে, আইনসম্মতভাবে, ন্যায্যভাবে ও সর্বোপরি মানবকল্যাণের প্রসঙ্গটি বিবেচনায় নিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করার বিষয়টি অত্যন্ত জোরালো আবেদনের সৃষ্টি করেছে। আমরা উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বলতে পারি, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দ্বারা কতিপয় মানুষের বেকারত্ব নিরসনের চেয়ে অধিকাংশ মানুষের নৈতিক অধঃপতনের বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া বৃহত্তর পরিসরে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করাই শ্রেয়। তাই ব্যবসায় মুনাফা অর্জন ছাড়াও ব্যবসায়ীদের পরিবার, সমাজ, ও রাষ্ট্রের প্রতি অনেক দায়-দায়িত্ব রয়েছে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একদিকে যেমন পণ্য উৎপাদন করছে এবং অন্যদিকে সেই পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে জনগণকে সেবাও প্রদান করছে। আবার ব্যবসায়ীরা জনগণের জন্য চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি করছে, ন্যায্য ও যৌক্তিক মূল্যে পণ্য সরবরাহ করছে, আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের চেষ্টা করছে এবং রাষ্ট্রকে কর প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়ন কাজে সহায়তা করছে। তাই জনগণ কিংবা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কোনরূপ ক্ষতি সাধন না করে ব্যবসায় পরিচালনা করলে উক্ত ব্যবসায় যেমন নৈতিক হবে তেমনি জনগণও উপকৃত হবে যা উভয়ের জন্য লাভজনক ব্যবস্থায় পরিণত হবে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সামাজিক খাতে ব্যয় করার কারণে আপাতদৃষ্টিতে বিনিয়োগকারীগণ অপেক্ষাকৃত কম মুনাফা অর্জন করলেও ব্যবসায়কে টেকসই করার মাধ্যমে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে লাভবান হওয়ার সুযোগ রয়েছে। সুতরাং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যদি এ লক্ষ্যে কাজ করে তাহলে এটি 'জনস্বার্থের রক্ষক' হিসেবে যেমন পরিচিতি লাভ করবে, তেমনি সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব পালনে উক্ত প্রতিষ্ঠানের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সে-বিষয়টিও প্রতিষ্ঠিত হবে।

তথ্যনির্দেশ

১ M.A. Latapi Agudelo *et al.,* "A Literature Review of the History and Evolution of Corporate Social Responsibility" in *International Journal of Corporate Social Responsibility*, Vol. 4, No. 1, 2019.

২ S.N. Bhaduri and Selarka, "Corporate Governance and Corporate Social Responsibility of Indian Companies" in *Springer*, Vol. XV, 2016, p. 12

৩ J. R. Boatright and B. P. Patra, *Ethics and the Conduct of Business*, 6th ed., India: Dorling Kindersley Pvt. Ltd., 2011, p. 431

৪ S.N. Bhaduri and Selarka, *op. cit.*, p 14.

৫ V. Barry, *Moral Issues in Business,* 3rd ed., USA: Wadsworth Publishing Company, 1986, p. 112

৬ S. N. Bhaduri and Selarka, *op. cit.*, p. 16

৭ A. Crane and D. Matten, *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization*, 3rd ed., UK: Oxford University Press, 2011, p. 53

৮ O. F. Williams, "CSR: Will it Change the World? Hope for the Future: An Emerging Logic in Business Practice" in: *The Journal of Corporate Citizenship*, Issue 53, 2014, p.13

৯. S. N. Bhaduri and Selarka, o*p. cit.*, pp. 21-22

১০ A. Stojanovic *et al*., "The Effects of CSR Activities on Business According to Employee Perception" in *European Review,* Vol. 30, No. 5, 2021, p. 686

১১ "সিএসআর ব্যয়ের ৯৬ শতাংশই বেসরকারি ব্যাংকের", *দৈনিক বণিক বার্তা*, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ক. ৫, পৃ. ৬

১২ "স্বাস্থ্য খাতে সিএসআর ব্যয় বেড়ে দ্বিগুণ", *দৈনিক প্রথম আলো*, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ক. ১, পৃ. ১৩

১৩ S. S. Sharon, "Sustainability is Applied Ethics" in *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 18(2), November, 2015, p. 67

১৪ A. T. Lawrence and J. Weber, *Business and Society: Stakeholders, Ethics, Public Policy*, 14th ed., Irwin: McGraw –Hill, 2014, p. 49

১৫ L. P. Hartman and J. Desjardins, *Business Ethics: Decision Making for Personal Integrity and Social Responsibility*, 2nded., Irwin: McGraw–Hill, 2011, p. 206

১৬ M. Ataur.Rahman and M. Rabiul Islam, *Introduction to Business*, Bangladesh: University Publications, 2013, p. 115

১৭ Green Banking and CSR Department, Dhaka: Bangladesh Bank, 2015, p. 25

১৮ S. B. Banerjee, 2008

১৯ M. G. Velasquez, *Business Ethics: Concepts and Cases*, 6thed., New Delhi: PHI Learning Private Limited, 2010, p. 42

২০ N. E Bowie and R. F. Duska, *Business Ethics*, 2nd ed., New Jersey: Prentice-Hall, 1990, p. 34

২১ A. Crane and D. Matten, *op. cit.*, p. 52

২২ "স্বাস্থ্য খাতে সিএসআর ব্যয় বেড়ে দ্বিগুণ", প্রাগুক্ত, ২০২০, পৃ. ১৩

২৩ তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের CSR কার্যক্রমের ষাণ্মাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-জুন ২০২২), সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা, পৃ. ২-৪

২৪ *Ibid*., p. 4

২৫ *Ibid.*, p. 9

২৬ *Ibid.*

২৭ M. N. U. Bhuiyan, *Introduction to Business and Business Administration: Concepts and Text*, 3rd ed., Bangladesh: NaSyPeC Publications, 2015, p. 24

২৮ J. R. Boatright and B. P. Patra, *op. cit.*, pp. 443-444

২৯ A. Crane and D. Matten, *op. cit.*, p. 48

৩০ M. Friedman, "The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits," in *The New York Times Magazine,* 13September, 1970, p. 55

৩১ C. Mason, *The 2030 Spike: Countdown to Global Catastrophe*, London: Earthscan Publications Ltd., 2003, pp. 105-106

৩২ M. G. Velasquez, *op. cit.*, 2010, pp. 4-5

৩৩ K. Davis and L. R. Blomstrom, *Business and Society: Environment and Responsibility,* USA: McGraw-Hill, 1975, p. 33.

৩৪ *Ibid.*, pp. 34-35

৩৫ N. E. Bowie and R. F. Duska, *op. cit.*, p. 39